নাটক অভিনয়

মঞ্চাভিনয়ের রীতিনীতি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে
বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যবহারিক
জ্ঞানার্জনের বই

প্রকাশ নন্দী
অধ্যক্ষ
ইন্‌স্টিটিউট্ অব্ ইন্‌ডিয়ান থিয়েটার আর্টস্

নাট্য ভাবনা

পরিবেশক : নব গ্রন্থ কুটির ॥ ৫৪/৫এ, কলেজ স্ট্রীট,
কো ল কা তা ৭০০০৭৩

* নাটক অভিনয় *

NATAK AVINAYA

[Stage Acting]

প্রকাশক : "নাট্যভাবনার" পক্ষে জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৭/৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কোলকাতা ৭০০০০৯

মুদ্রাকর : শরৎচন্দ্র প্রধান

মহাপ্রভু প্রিন্টিং ওয়ার্কস ।। ১২ বিনোদ সাহা লেন, কোলকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : ডঃ এল. এন. পাচোরী

পরিকল্পনা : সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

শোক : উৎসর্গ

যীশুর জন্মদিনে যার জন্ম—যে মাত্র কয়েকদিন পৃথিবীর আলো
বাতাসকে দেখেছে—ফুটফুটে সেই ছেলেটা—যে
জাতশিল্পী হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে পৃথিবী থেকে
ছুটি নিয়েছে—আমার একমাত্র ছেলে
যীশুর স্মৃতিস্মরণ করে—

বাপী

'পূর্বাশা'
ফ্লাট নং ডি—১৫/২
১৬০ মানিকতলা মেন রোড
কোলকাতা ৭০০০৫৪

লেখকের অন্যান্য বই

নাটক পরিচালনা

মঞ্চাভিনয় তত্ত্ব ও নাট্যশিক্ষণ

নেপথ্য কথন

বর্তমান গ্রন্থের নাম হওয়া উচিত ছিল 'মঞ্চাভিনয়'। অথবা 'নাট্যাভিনয়' কিংবা 'অভিনয় শিক্ষা'। 'নাটক অভিনয়' নামকরণের ইচ্ছা আমার নয়—প্রকাশকের। পাছে গ্রন্থ প্রকাশিত না হয়—এই রকম ভয়ভাবনা করে প্রকাশকের মতকেই মেনে নিলুম। নাট্য-শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ এখনো সংঘটিত এদেশে হয়নি বলে এই জাতীয় ব্যবহারিক পুস্তক প্রকাশের সহজ সরল নামকরণের একটা বিশেষ তাৎপর্য থেকে যায়। তা ছাড়া নামে কি-ইবা এসে যায়! মোটামুটিভাবে মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনয় করলে অভিনয়-শিল্পীর স্বপক্ষে নিজে নিজে তৈরি হওয়া কিভাবে যায় তার একটা চেষ্টা করা হয়েছে—আর তত্ত্বকে কিভাবে সহজ সরল করে ব্যাখ্যা করা যায় তারও বিভিন্ন চেষ্টা করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

সব শেষে—অভিনয়-শিল্প যে সহজ এবং হালকা কোনো জিনিস নয়—তার জন্যে যে দীর্ঘস্থায়ী অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে—এই জাতীয় অনেক ভাবনা এবং ভোঁতা চালবাজ শিল্পীদের কিছুটা ভয় দেখানোর চেষ্টাও করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

কেউ যদি বলেন কিছু হয়নি তারজন্যে কোনো খেদ থাকবে না। কেউ যদি বলেন—এটি উচ্চ পর্যায়ের একটি গবেষণা গ্রন্থ হয়েছে এবং এই জাতীয় গ্রন্থ বাংলা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হোলো—এতে গর্বিত হলেও গর্ব করে বুক ফোলানোর কোন স্পর্ধা প্রশ্রয় পাবে না নিজের পক্ষে। কারণ—আরো কাজ চাই—অনেক কাজ বাকী। এই গ্রন্থকে তথাকথিত পণ্ডিতিচালে কোটেশনে ভারাক্রান্ত করার চেষ্টা করিনি। যা করেছি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মৌলিকভাবে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত দেয়া—সেই সিদ্ধান্ত তত্ত্ব এবং ব্যবহারকে পাশাপাশি রেখে। —উদ্ধৃতি প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হয়েছে তবে তা মূল আলোচ্য

বিষয়কে গুরুত্ব দেয়ার জন্যে নয়—উদ্ধৃতি আছে প্রথমে আর শেষে —এবং সেই সব উদ্ধৃতি—শুধুমাত্র বোধ এবং জিজ্ঞাসাকে একত্রিত করার জন্যেই। যার ফলে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে সঠিক পথ বাছাই করা যেতে পারে। উদ্ধৃতি যাতে স্বনির্ভর হয় তার চেষ্টা করা হয়েছে। কেবলমাত্র—যেখানে যতোটুকু ব্যাখ্যা না করলে নয় সেইটুকু স্থানে নিজে কলম ধরেছি। গ্রন্থ শেষে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী গ্রন্থপঞ্জী দেয়া হলো না। কারণ— যত পুস্তক-এ গ্রন্থ রচনার জন্যে লেগেছে তার পাকা ছাঁকা হিসেব আমার হাতে নেই—অতএব ক্ষমা করুন।

অভিনয়-শিক্ষার বাস্তবতাকে বিবেচনা করে এই ধরনের কোনো কার্যক্রম এদেশে এর আগে নেয়া হয়েছে কি না আমার জানা নেই। প্রায় গোটা গ্রন্থ জুড়ে স্ব স্ব বিষয় নিয়ে, বিষয়কে নোতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

খুব ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পুস্তকের আকার ছোট করা গেলো না। ছোট করার উদ্দেশ্য ছিল কম দামে যাতে নাট্যকর্মীরা এই বই হাতে পায়। কিন্তু এছাড়া আরো অনেক—অনেক কথা যা অনুচ্চারিত রয়ে গেলো তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া উপায় নেই। যেমন মেক-আপ এবং অঙ্গসজ্জা বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার প্রয়োজন ছিল। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে বাংলা ভাষায় পৃথকভাবে পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় এবং 'নাটক-পরিচালনা' গ্রন্থে আলোচিত হওয়ায় পরিধি যথাসম্ভব ছোট করার চেষ্টা করা হয়েছে। তথাপি ছোট অক্ষরে এবং পঙ্‌ক্তির সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে বেশী বিষয়কে একত্রিত করার জন্য।

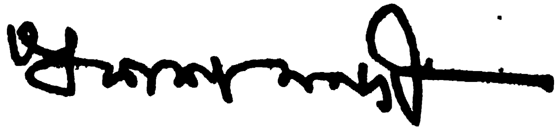
ছাপার মধ্যে অসংখ্য ভুল থেকে গেছে। এমনকি 'চরিত্র-ভাবনা' পর্যায়ে প্রথম ছকে (২) পরিবেশগত প্রভাবের বিভাজন ঠিকমতো চিহ্নিত হয়নি। তথাপি নাট্যবন্ধুরা সেটি অবশ্যই সামলে নিয়ে পড়তে পারবেন অনায়াসে। 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা—বিদেশে'

পর্যায়ে আলোচনার সময় ছাপার গোলোযোগে ছ পাতা লাফিয়ে গেছে, কিন্তু বিষয়বস্তুর কনটিনিউটি ঠিকই আছে। এই গ্রন্থের ছোটখাটো ত্রুটীর জন্য লজ্জাবণত চিত্তে ক্ষমাপ্রার্থী।

পুস্তকের কভার, অন্যান্য টেকনিক্যাল বিষয়ে অলংকরণ করে ধন্য করেছেন আইটার উপাধ্যক্ষ ডঃ লক্ষ্মীনারায়ণ পাচোরী। লেখার কাজে বিশেষভাবে সর্বক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করেছেন আইটার ছাত্র শ্রীঅঞ্জন দাশগুপ্ত, রমেন দে, প্রোগ্রাম অরগানাইজার শ্রীঅনিলবরণ ব্যানার্জী। এ ছাড়া অশোক দত্ত ও অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা বই সরবরাহ করে ধন্য করেছেন। স্টেট সেনট্রাল লাইব্রেরীর কল্যাণ মুখোপাধ্যায়ের অবদান ভোলবার নয়।

আর প্রকাশক বন্ধু সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—তাঁর কথা কি ভাবে উল্লেখ করি। আমার পাগলামোকে তিনি রীতিমতো ঝুঁকি নিয়ে প্রশ্রয় দেয়ার কাজে এগিয়ে এসেছেন। আইটার ছাত্রদের এবং বহু প্রত্যাশিত-অপ্রত্যাশিত নাট্যদরদী বন্ধুদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ তাগাদাও এই কাজের জন্যে দায়ী। সবচেয়ে দায়ী ইণ্ডিয়ান থিয়েটার আর্টস্-এর সেক্রেটারী শ্রীসুনীল শেঠ মশাই।

যাই হোক এত দায়-দায়িত্বের মধ্যেও যদি এই গ্রন্থ পাঠ করে উৎসাহিত হয়ে নাট্যকর্মীরা কিছু কাজকর্ম করার সুযোগ পান—তা হলেই আমি উৎসাহিত হবো এবং ধন্য হবো এই ভেবে অতীতের একটা বড় স্বপ্নের সামান্য অংশ পূর্ণ হলো আপনাদের সহযোগিতায়। আর নাট্য-শিক্ষা বিস্তৃতি-করণের ক্ষেত্রে আপনারা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন জেনে।



পৌষালী
শান্তিনিকেতন



আলোচ্য বিষয় ও পর্যায়ক্রম

জিজ্ঞাসা ঃ ঐতিহাসিক সূত্র ১

প্রকৃতির নিকটতম সৃষ্টি মানুষ। ঠিক সেই জন্যে মানুষ পৃথিবীতে এসে একচোটেই প্রকৃতির অনেকখানি দেখতে পায়। তাই প্রথমে দেখা, পরে শোনা, আবো পরে জানা—ক্রমে অন্বেষণ, উপলব্ধি এবং শেষে নিজেকে প্রকাশ করার আত্মিক তাগিদ। তাইতো দেখি সভ্যতার সূচনায় সংস্কৃতিরও সূচনা। আর সেই সূচনা অভিনয়—শিল্পকে বাদ দিয়ে নয়। যাক গে। চোখে দেখা এই পৃথিবীতে অভিনয়-জগতের ইতিহাসে প্রথম অভিনেতার নাম কি? 'ইখারনোফ্রেট'। যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার প্রায় ২০০০ বছর আগেকার কথা। স্থান ঈজিপ্ট। আধুনিক সভ্যতার জননী গ্রীস হলেও তার শুরু কিন্তু ঈজিপ্টে। খ্রীষ্ট জন্মাবার ৫৩৪ বছর আগে পৃথিবার দ্বিতীয় অভিনেতার নাম পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রীসে। অভিনেতার নাম 'থেসপিস'। তারপর একে এক অনেকেই আসে।

তবে মোটামুটিভাবে—কি ঈজিপ্ট, কি গ্রীস, আর কি ভারতবর্ষ নাট্যভাবনার উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের একটিই ঐতিহ্য পরিলক্ষিত হয়। তা হলো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নাট্যকলা স্বকীয় এবং স্ব-নির্ভর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। বৈশ্বিক শিল্প-চেতনায় মানুষ অসম্পূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতা পেয়েছে এবং কালক্রমে একাকিত্বের মধ্যে—সভ্যতার বিজয় পতাকা বহন করে আত্মিকসূত্র স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছে। সে সব কথা থাক। আমরা এখন আমাদের কথা ভাবি।

আমরা ভারতীয়। আগে ভারতীয়—তারপর বাঙালী। কিন্তু সবার আগে আমরা এই মাটির—এই পৃথিবীর। আমাদের মধ্যে ভেদাভেদ নেই। জাতিগত বিভেদ নেই। ধর্মীয় সংস্কার মানি না। কেননা, আমরা শিল্পী। শিল্পী বিভেদহীন নীতিকেই স্বীকার করে মানবিক তাগিদে। তবুও রাজনীতির চালবাজি আছে। একটি ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যেই আমাদের বসবাস করতে হয়—একটি শাসিত সমাজ-ব্যবস্থার অনুশাসনকে ইচ্ছা করে একলাফে টপকে গিয়ে অন্যসমাজে আশ্রয় নিতে পারি না বা হঠাৎ করে নোতুন সমাজ সৃষ্টি করতেও পারি না।

কিন্তু শরীর যেতে না পারলেও মন তো পারে—কারো মন বিশ্বচরাচরের পরিপন্থী হলেও অভিনয় শিল্পীর মন কিন্তু বিশ্বচরাচরের অসীম সীমারেখায় বাঁধা।

অভিনয় করতে যাব অথচ যে দেশে থাকি—অভিনয়-শিল্প সম্পর্কে সে দেশ কতোখানি ঐতিহ্য বহন করে তা জানবো না বা এতোদিন পর্যন্ত অভিনয়-শিল্প কতোখানি উন্নত হয়েছে তা না জেনে আরো ভালো কিছু সৃষ্টি করা কি করে সম্ভব? অন্যান্য শিল্পে কি হয় জানি না—তবে সব শিল্পেই সম্ভবত ফাঁকি দিয়ে কিছুই হয় না। বিশেষ করে অভিনয়-শিল্পে তো ফাঁকির কোনো স্থান নেই। কিন্তু আছে। অভিনয়-শিল্পে শিক্ষা-সাধনা ছাড়াই 'স্টেজে মেরে দেওয়া'র মতো ক্ষমতা আমাদের দেশের অনেক শিল্পীরাই পোষণ করেন। আমি তাঁদের ক্ষমতার তারিফ দেখে বিনতচিত্তে হাজারবার তাঁদের প্রণাম জানাই এবং প্রসংগত বলি—আমার লেখা—আমার শ্রম বোধহয় ব্যর্থ হলো! ইতিমধ্যে অভিনয়-শিল্প নিয়ে যতো লেখা লেখকরা লিখেছেন হয়তো সবাই ব্যর্থ হলেন সেই সব ঈশ্বরের বরপুত্র অসীম ক্ষমতাশীল অভিনয়-শিল্পীদের অপরিমেয় দম্ভের কাছে।

প্রথমে বিদেশে না গিয়ে স্বদেশ দিয়েই শুরু করি। স্বদেশের ঐতিহ্য কতোখানি দিলো সেবিষয়ে আমার মনে বারবার অনেক প্রশ্ন উঁকি মারে। তাই আমার প্রশ্ন অর্থাৎ আমার জিজ্ঞাসাকে আমি আপনাদের সামনে রাখতে চাই প্রথমে। আশাকরি এই জিজ্ঞাসাগুলি রাখার সুযোগ থেকে আপনারা আমাকে কেউ বঞ্চিত করবেন না।

গোড়ায় আমি আমার জিজ্ঞাসাকে ব্যক্ত করবো। তারপর বাঙলা

রঙ্গমঞ্চের আজ পর্যন্ত যেসব দিকপাল এবং জিজ্ঞাসুরা নাট্যকলা, রঙ্গমঞ্চ এবং অভিনয়ের উন্নয়নের স্বার্থে যেসব কথা বলে গেছেন তাও তুলে ধরবো একে একে। উদ্দেশ্য সব মিলিয়ে অভিনয়শাস্ত্র সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা দেয়া এবং এই ধারণাকে কেন্দ্র করে আরো কতো কাজ হওয়া প্রয়োজন তার সম্পর্কে একটা সঠিক চিন্তাভাবনা স্থির করা। যদিও এই করাটা আমার পক্ষে খুবই সামান্য। কারণ একটা জীবনে মানুষ কতোটা পারে—তাই অন্যের জন্যে কিছু জায়গা ছেড়ে দিতে হয়।

'ভরতের নাট্যশাস্ত্র' বহুকথিত তত্ত্বসম্বলিত একটি গ্রন্থ। কেবলমাত্র ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করলে—আর সেই গবেষণা যদি প্রয়োগবিধির দৃষ্টিকোণ থেকে হয় তাহলে তা যে কতো বৈজ্ঞানিক তার বিশ্লেষণ করলে আমরা নিশ্চয়ই হতবাক হবো। ইচ্ছা রইলো এবিষয়ে সহজভাবে কিছু বলার। কিন্তু ভরতমুনিতেই কি এদেশে অভিনয়-শিল্পের শুরু? মনে হয় ব্যাপারটা তা নয়। ভরতমুনির সূত্র এত সূক্ষ্ম এবং এত পরিশীলিত যে ভরতমুনির আগেও ভারতবর্ষে রীতিমতো নাট্যকলা এবং অভিনয়-শিল্প বেশ দাপটের সঙ্গেই চালু ছিল। এটা ভাওতা নয়—ভাবনার বিষয়। প্রমাণ? ঋগ্বেদ। বেশী দূর যেতে হবে না। ঋগ্বেদের যমযমীর পুরূরবা উর্বশীর সংলাপের অংশ এবং উর্বশী পুরূরবার সোমরস ক্রয়-বিক্রয়ের অংশটুকু পড়ে একটু অনুসন্ধান করলেই হবে।

তারপর আসুন পুরাণের যুগে—যদিও রামায়ণ-মহাভারতে ইতবিক্ষিপ্তভাবে অভিনয়ের উল্লেখ আছে তথাপি সেসব জায়গা বাদ দিয়ে শুধু 'হরিবংশ'-কে অনুধাবন করলেই ভারতীয় অভিনয়ের ঐতিহ্যের কিছু সন্ধান মিলবে।

এরপরেও পানিনির নটসূত্র খোঁজ করলে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য সম্পর্কে রীতিমতো শুদ্ধ হতে হয়।

আজকের যুগে Puppet Theatre, Shadow play নিয়ে যখন প্রচণ্ড মাতামাতি করি, ঠিক আজকের এই মুহূর্তে বসে যদি ভাবতে পারি খ্রীষ্ট জন্মের অনেক আগে আমাদের দেশে পুতুলনাট্য এবং ছায়ানাট্য ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল—তখন কেমন লাগে?

তারপর আসুন বৌদ্ধ যুগে। বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী ঘাঁটলেই তার কিছু সন্ধান পাওয়া যাবে।

তারপরেই চলে আসুন বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রের বিশিষ্ট কয়েকটি সূত্রে,

দেখবেন ভারতীয় অভিনয়ের কি পারম্পরিক সূত্র রয়েছে—সূত্র রয়েছে তত্ত্ব এবং ব্যবহারিক দিক থেকে। আর এতোটা পথ আগে না জানতে পারলে ভরতকে জানবো কি করে—আর ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের অনেকখানি দিক অজ্ঞাত থাকবে—নয় কি?

বৈদিক, বৌদ্ধযুগে ভারতীয় ঋষি এবং ঋত্বিকরা যা করে গেলেন তা দেখেই তো 'ভরতমুনি বিরচিত সুপ্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র সারস্বত সমাজে পঞ্চম বেদ বলে চিহ্নিত হয়েছে।'

হয়তো বিভিন্ন সৃষ্টি এবং স্রষ্টার সময়সীমা নিয়ে বিভিন্ন মহলে মতভেদ দেখা দিতে পারে—কিন্তু গৌরব এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে নিশ্চয়ই কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না।

ভরতমুনির পর নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয় দর্পণে'র নবমূল্যায়ন কিংবা বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণ'—গ্রন্থে নাট্যকলা সম্পর্কীয় আলোচনা কি মিথ্যা প্রতিবাচ্য হবে? ভারতীয় শাস্ত্রকারের কাছ থেকেই তো আমরা জানতে পারি—'এমন জ্ঞান নাই, এমন শিল্প নাই, এমন বিদ্যা নাই, কর্ম নাই, ধ্যান নাই যা নাকি নাট্যকলায় দেখা যায় না।'

আবার শাস্ত্রকারদের মুখে এমন কথাও শোনা যায়—'নাট্যকলার অভিনয় যিনি সম্যকভাবে দর্শন, শ্রবণ এবং উপভোগ করেন, তাঁর ব্রহ্মর্ষিদের সঙ্গে অক্ষয় পুণ্যময় সদগতি লাভ সম্ভব হয়।'

বৈদিক থেকে বৌদ্ধ—বৌদ্ধ থেকে সংস্কৃত এবং সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষার যুগে একটু ফিরে আসুন। বাংলা ভাষা সৃষ্টি হবার পর থেকেই তো বাংলা ভাষায় বাংলা নাটক নিয়ে ভাবতে হয়। আসলে নাটকের কথা ভাবা উচিৎ ছিলো ভাষা সৃষ্টি হবার অনেক পরে। কিন্তু বাংলা ভাষা গড়ে ওঠার শুরুতেই বিচ্ছিন্ন হলেও অভিনয়ধারা প্রচলিত ছিলো।

যেমন চর্যাপদ। চর্যাপদে যেমন আছে নৃত্যগীতের উল্লেখ তেমন আছে সুর-তাল-লয়ের কথা। চর্যাপদের 'বুদ্ধা' নাটকে নাচগানের সঙ্গে অঙ্গরচনার উল্লেখ চোখে পড়ে। এই প্রকার নাট্যের প্রচার সে সমাজে যে কী ব্যাপক ছিলো তার একটা উদাহরণ রাখা যেতে পারে:

নাচন্তি বাজিল গান্তী দেবী
বুদ্ধা নাটক বিসমা হোই

নটপেটিকার উল্লেখে বোঝা যায়—ভ্রাম্যমান অভিনয় শিল্পীরা নাটকের

সাজসরঞ্জাম নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে অভিনয় প্রদর্শন করতো। যদিও গানের মধ্য দিয়ে উক্তি-প্রত্যুক্তি করা হতো এবং শুরুতে একজনই অভিনয়ে অংশ নিতো তথাপি অভিনয়ের শেষভাগে দুইজন অভিনেতা নৃত্যগীত-সহযোগে অভিনয় করতো এবং নেপথ্যে বাদ্যযন্ত্র তথা শব্দক্ষেপণেরও ব্যবস্থা ছিলো।

কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। পূর্বের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়া বিশিষ্টভাবে অঙ্গসঞ্চালনের রীতি ও নীতি এই শ্রেণীর অভিনয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

এরপরেই বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। যাকে অনেকে নাটগীতি বলে উল্লেখ করতে চান সেখানেও কাব্যাকারে ছোটো ছোটো অংশের দীর্ঘমেয়াদী সময়ে অভিনয় হতো। সংস্কৃত নাটকে রস অনুযায়ী যেমন দিনে-দুপুরে এবং সন্ধ্যায় অভিনীত হতো, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বেলায় কিন্তু তা নয়—অভিনয় হতো দিনের বেলায়। নাটকের অংশ সংক্ষিপ্ত হলেও বহু চলতি কথার প্রচলন ছিলো এই সব অভিনয়ে।

এরপর বাংলার প্রথম রেঁনেশা তথা শ্রীচৈতন্যের যুগ। বাংলাদেশে এবং ওড়িশায় শ্রীচৈতন্য নিজে অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন। 'যাত্রা' শব্দের উল্লেখ সম্ভবতঃ এই সময় থেকে প্রসিদ্ধি লাভ করে। শ্রীচৈতন্য নারী-পুরুষ এবং হনুমানের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। গান, অঙ্গ-সঞ্চালনের সঙ্গে সাত্ত্বিক অভিনয়ের সার্থক প্রকাশ ঘটে শ্রীচৈতন্যের আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে। দর্শকের সঙ্গে অভিনেতাদের দূরত্বের ব্যবধান ঘোচানো হয় এই শ্রীচৈতন্যের অভিনেতা হিসেবে সক্রিয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করার মধ্য দিয়ে। এই সময়ে দানকেলী এবং জগন্নাথ বল্লভের মতো লৌকিক নাট্য—নিবেদনে হাস্যরস বিতরণেরও তথ্য পাওয়া যায়।

তারপর সপ্তদশ শতাব্দীতে 'গোপীচন্দ্র নাটক' আর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভরতচন্দ্রের 'চণ্ডী' নাটকের খোঁজ নিলে কতো যে তথ্য মিলবে তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনুপ্রবেশ করার আগে দু'একটা কথা বলে নিতে চাই। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলার নবজাগরণের যুগ—পাশ্চাত্য অভিজ্ঞানের সমন্বয় এবং 'পিকচার ফ্রেম' থিয়েটারের আবির্ভাব—যে থিয়েটারকে নিয়ে আমরা আজ মাতামাতি করি সেই থিয়েটারের অগ্রগতির সূচনা।

কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা—তাহলে আমাদের ঐতিহ্য আমাদের দেশীয় নিজস্ব রঙ্গভূমিতে স্বকীয় অভিনয়ধারা নিয়ে কি নোতুন করে গবেষণা হবে না? নাকি গবেষণার মতো শক্তি রাখি না? বিদেশের নাট্যকলা এবং ভালোর সবকিছুই নিজেদের করে নেব—কিন্তু আমাদের জিনিসকে উপেক্ষা করে? এ প্রশ্নের জবাব বাধ্যতামূলক নয়। তবু যদি এতোক্ষণ যে কথাগুলো বলা হলো সে সম্পর্কে কেউ নোতুন করে গবেষণা করেন তবেই আমার আজকের এই ভাববিনিময়ের কাজে বসা সার্থক হবে।

এবারে আমরা বিলিতি প্রভাবিত থিয়েটারের কথাপ্রসংগে আসবো। বাঙালীর হাতে 'পিকচার ফ্রেম' বা 'প্রসিনিয়াম' থিয়েটার আসার সময় থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চে কি হলো। আপনারা সকলেই জানেন যে বাঙালী সাহচর্যে রুশীয় মনীষী লেবেডেফ আমাদের দেশে নাট্যাভিনয়ের সূচনা করেন ১৭৯৫ সালে। মহিলারাও অংশ নেন। টিকিট বিক্রিও হয়। ডুমতলায়।

তবে শ্রদ্ধেয় ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা নাট্যপ্রসংগে' প্রবন্ধে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন—বোম্বাই গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটে সর্বপ্রথম মঞ্চ বেঁধে অভিনয় হয়, কোলকাতার অভিনয়ের বিশ-পঁচিশ বছর আগে। কিন্তু তবু নাট্যাভিনয়ের ধারাবাহিক নীতি, স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত অভিনয়, নাটকে অভিনয়ের বিভিন্ন 'স্কুল' -এর অবলম্বিত অভিনব প্রকরণ এসব বিচার করলে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগর নিশ্চয়ই কোলকাতার কাছে ম্লান হয়ে যাবে।

এরপর চার যুগ বাংলা রঙ্গমঞ্চ বলতে গেলে 'অন্ধকারযুগ'। ১৮৩৫ সালে নবীন চন্দ্র বসু মশাই নিজের চেষ্টায় বাংলা নাটক অভিনয়ের সূচনা করেন 'বিদ্যাসুন্দর' দিয়ে।

কিন্তু সখের দলের অভিনয় বলতে ১৮৫৭ সাল। আর সেই সখের দলে অভিনয় দেখার জন্যে সাধারণ মানুষ প্রবেশাধিকার পেতো না। ব্যক্তিগত বিত্ত-শালী মানুষের প্রভাবে রঙ্গমঞ্চের যবনিকা সরেছিল কিন্তু বিদ্বান সমাবেশ, ধনী সমাবেশ এবং জাতিগত বৈষম্য প্রকট ছিলো বলে নাট্যমঞ্চ অভিজাত মহলের বাগানবাড়িতে এবং পরিজন-প্রিয়জনের মান রক্ষার জন্যেই যেন সৃষ্টি হয়েছিলো।

তৎকালীন পত্রপত্রিকায় রঙ্গমঞ্চে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার সম্পর্কেও যেমন বলা হয়েছে তেমনি অভিনয়-শিক্ষা সম্পর্কেও বলা হয়েছে। যেমন নব প্রবন্ধ পত্রিকায় ১৮৬৭ সালের আগস্ট মাসের সংখ্যায় বলা হয়েছে :

> অভিনেতৃগণও সবিশেষ মনোযোগ দ্বারা অভিনয় কার্যে সুশিক্ষিত হইয়া দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিতে পারগ হইবেন।

কিন্তু সখের থিয়েটারের শুরুতেই দলাদলি। টিকিট বিক্রি হবে কিনা তাই নিয়ে মনোমালিন্য। ফলে শুরু হলো 'বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার' নাম নিয়ে পরে 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ'—শেষে 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। গিরিশ ঘোষ দল ছাড়লেন—অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী হলেন ন্যাশানাল থিয়েটারের নাট্যশিক্ষক।

গিরিশচন্দ্র নটগুরু—নাট্যাচার্য। কিন্তু তিনিও ছদ্মনামে সংবাদপত্রকে দুই-খানি পত্র লিখেছিলেন এবং তা ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় ১৯ এবং ২৭শে ডিসেম্বর ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যদিকে তখন মোটামুটি দর্শক সচেতন হতে শুরু করেছে এবং মহিলাশিল্পীদের অভিনয়-শিল্প-নৈপুণ্য প্রতিভাত হচ্ছে।

শুরুর যুগে আমাদের অভিজাত ব্যক্তিত্বের স্বরূপ যদি এই হয় তা হলে আজকের পটভূমিকায় বসে আমরা যা করছি তাকি বাস্তববিরোধী—না কি অন্য কিছু? তবে অতীত যা করেছে বা অতীতের যা ভুল তা বিশ্লেষণ করার স্পর্ধা রাখবো না অন্ততঃ ভবিষ্যতের কথা ভেবে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, তৎকালীন অনেক পত্রপত্রিকা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যত সম্পর্কে সচেতনভাবেই নিরপেক্ষ সমালোচনার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো। অভিনয়ের উৎকর্ষতা, দৃশ্যসজ্জা প্রভৃতি বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছিলো।

ক্রমান্বয়ে বিলিতি ভাবনা দূরীকরণের আন্তরিক চেষ্টা দেখা যায়। 'যাঁহাদের ধারণা ছিল যে ইংরাজী থিয়েটারে ভিন্ন প্রকৃত অভিনয় হয় না তাঁহারা নিজেরাই নিজস্ব মত পালটাতে লাগলেন।' বসার স্থান, আলোক-সম্পাতের উন্নতির সাথে সাথে বিদেশী বাদ্যযন্ত্রের পরিবর্তে লক্ষ্ণৌ থেকে দিশি যন্ত্র দিয়ে নেপথ্যে শব্দ ক্ষেপণের সূচনা হলো। তবে বেলবাবু এবং অর্ধেন্দু শেখরের প্রচেষ্টায় নাটকের মধ্যে মাইমের প্রবর্তন শুরু হলো এই সখের দল থেকেই।

পরে অবিশ্যি গিরিশচন্দ্র দলে যোগ দিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র ছদ্মনামের আড়ালে ১৮৭৩ সালে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ভীমসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

এরপরেও দলাদলি। ফলে সখের দলের অগ্রগতিতে সম্পূর্ণ যবনিকা পড়ে।

যাত্রা শুরু হয় নোতুন রঙ্গমঞ্চে—যা স্থায়ী এবং আজো যা কিছু কিছু অক্ষত।

রঙ্গমঞ্চের শুরুর যুগে আর একটি ছবি আমাদের অনেক সতর্কতার বাণী দেয় গণনাট্যের ১৯৭২ সালের জুলাই সংখ্যায় বিনয় ঘোষের একটি প্রবন্ধে। 'তখনকার হঠাৎ বড়লোক বাঙালী দালাল বেনিয়ান, মুচ্ছুদ্দি ও দেওয়ান বাবুর কুকুর-বাঁদরের বিয়েতে লাখটাকা খরচ বহন করছেন, বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় তাড়াতাড়া নোট প্যালা দিচ্ছেন, সখের কবিয়াল, হাফ-আখড়াই ও খেউড়ের দল পুষছেন, ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন, বুলবুলি ও মোরগের লড়াই দেখছেন এবং সহরে বিদেশীদের রঙ্গালয়ে সাহেব মেমদের কৌতুকাভিনয় দেখছেন।'

কোলকাতায় প্রথম রঙ্গালয় লালবাজার স্ট্রীটের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এবং দ্বিতীয়টি স্থাপিত হয় বর্তমান মহাকরণের পেছন দিকে। এখানে অর্থাৎ এই 'ক্যালক্যাটা থিয়েটারে' মাথাপিছু টিকিটের হার ছিল যথাক্রমে ৮, ১২, ১৬ এবং ৬৪ টাকা। ভাবুন ব্যাপারটা কি?

ইতিমধ্যে হিন্দু কলেজ রুচি বদলের এক শীর্ষস্থান দখল করে বসলো। বাঙালীরা অভিনয়ে যোগ দিলো—নাট্যচর্চা শুরু হলো—শেক্সপীয়র এলো। ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার হিন্দু থিয়েটার স্থাপন করলেন। তবে বাঙালীদের দ্বারা বাঙলা নাটক অভিনয় শুরু করলেন ১৮৩৩ সালে নবীনচন্দ্র বসু মশায়।

১৮৫০ সাল থেকে প্রায় কুড়ি বছর বাংলাদেশের আর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রাখলে গণতান্ত্রিক শিল্প হিসেবে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের অগ্রগতি সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা রাখা যেতে পারে।

একদিকে ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা-বিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা এবং বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন, অন্যদিকে নববাবুদের য়ুরোপীয় রীতিনীতির অনুকরণ, মদ্যপান এবং বেশ্যাশক্তিপ্রিয় বাবুদের বিরুদ্ধে লড়াই। কাজেই বিষয়বস্তুগতভাবে সংঘাতমুখর জীবনের প্রতিফলন দেখতে পাই সেই সময়ের নাটকে। সমাজ-সচেতন গণনাট্যের শুরু বলতে এই সময়কেই চিহ্নিত করা উচিত।

বিক্ষিপ্তভাবে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ,' রামনারায়ণের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব, দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'জামাইবারিক', 'সধবার একাদশী', মধুসূদনের প্রহসন 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনয় হলো। নাটকে জনজীবন এলো। সমাজসচেতনতা এলো।

আমরা জানি মধুসূদনের পরামর্শে, পণ্ডিতপ্রবর সত্যব্রত সামাশ্রমীর চেষ্টায় বাঙলার স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে বারাঙ্গনা গ্রহণের জন্য 'বেঙ্গল থিয়েটার' সমাজের

নিকট প্রথম দায়ী হলো। এর জন্য তৎকালীন সংবাদপত্রগুলিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।

কিন্তু ১৮৮৪ সালে স্টার থিয়েটারে অভিনীত 'চৈতন্যলীলা' দেখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নটী বিনোদিনীকে আশীর্বাদ জানিয়ে বাংলার রঙ্গমঞ্চ তথা অবহেলিত নারীসমাজকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিলেন।

এসময়ের অভিনয়-রীতি সম্পর্কে আমরা কোনো সুস্পষ্ট এবং বাস্তব ছবি দেখতে পাই না। তবে মেঘনাদবধ ১৮৭৫ সালে অভিনীত হবার পর 'নগরের গলিতে গলিতে বালকেরাও বীর দর্পে 'মেঘনাদে'র অংশবিশেষ আবৃত্তি করিত।' (ডঃ অরুণকুমার মিত্র—অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য) এছাড়া রাজকৃষ্ণরায় লিখেছেন তাঁর 'হরধনুভঙ্গ' নাটকের ভূমিকায়: 'অভিনয়-কারিদিগের অভিনয়কালে মেঘনাদবধের চতুর্দ্দশাক্ষরাত্মক অমিত্রাক্ষর ছন্দ, অঙ্গভঙ্গি ও বাগভঙ্গির অনুগত হইয়া আমাদের কর্ণে কেমন আর একতর নূতন ছন্দের ছাঁদ গড়িয়া দিয়াছিল।'

খুবই দুর্ভাগ্য যে বেঙ্গল থিয়েটারের ঐতিহ্যময় গৌরব আজকে গবেষণার বিষয় হলেও তৎকালীন সমালোচনা-রীতি সম্পর্কে আমাদের কোনো সুস্পষ্ট নীতি চোখে পড়েনা। বরং ব্যক্তিগত কটাক্ষ—নাট্যসমালোচনায় অভিনয়ের গুণাগুণের চেয়ে বেশী গুরুত্ব পেল অভিনেত্রী প্রসংগ। একটি নমুনা:

'এ পর্যন্ত আমরা যাত্রা, নাচ, কীর্তন, ঝুমুরেই কেবল বেশ্যাদিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট বংশীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাদিগের অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম। ভদ্রসন্তানেরা আপনাদিগের মর্য্যাদা আপনারা রক্ষা করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়'—'ভারত সংস্কারক' ১.· ৩ সালের ২২শে আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত।

এই সময়ের অভিনয়-রীতি প্রসংগে সমাচার দর্পণ কিন্তু একটি দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলো।

কুলীনকাব্য, কমলিনী অভিনয় প্রসঙ্গে ১৮৭৭ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত মন্তব্য হলো: 'অভিনয়ে কৌলীন্যপ্রথার আচার-ব্যবহারাদি স্পষ্টতঃই দর্শিত হইয়াছিল; বাস্তবিক কুলীন মহাত্মাদিগের কার্য্যকরণসমূহ অতীব ভয়ানক ও কঠোর। অন্যদিকে, আলিবাবার অভিনয় বাঁদরামী অপেক্ষা কিছুই নয়।'

সমাচার চন্দ্রিকা ১৮৭৭ সালের ২রা এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশ্যে বললো: 'বঙ্গ-

রঙ্গভূমির ঐক্যতান বাদন অতি জঘন্য ; ইহার উন্নতি না করিতে পারিলে এবং অভিনেতৃগণের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন না হইলে বড় সুবিধা হইবে না। বঙ্গরঙ্গভূমিতে নাটকগুলির অভিনয় ভাল হয় এবং এখানে ভাল অভিনেতৃ আছে।'

তারপর '১৮৭৬ সালে এলো সেই কুখ্যাত Dramatic Performance Act অর্থাৎ অশ্লীল, নিন্দাজনক অথবা অপবাদজনক কোনো নাটক অভিনীত হলে নাট্যশালার অধ্যক্ষ, অভিনেতৃ এবং দর্শকগণ দণ্ডার্হ হইবেন।'

১৮৯৪ সালে মে-জুন 'পুরোহিত' পত্রিকা মৃণালিনী নাটকের অভিনয়ের প্রশংসা করলো এই বলে : 'স্বাভাবিক অভিনয়ই প্রকৃত অভিনয়।…কি কণ্ঠধ্বনি, কি অঙ্গসঞ্চালন, কি ভাবভঙ্গী কোন বিষয়ে পাত্রপাত্রীদের অস্বাভাবিক ভাব ছিল না।'

বস্তুত এতো কথা—কিছু তথ্য দেবার কারণ কিন্তু একটাই—তা হলো পিকচার ফ্রেম থিয়েটারকে নিজের করে নেওয়ার মধ্যে কতো চিন্তা কতো ভাবনা হয়েছে সে বিষয়ে সামান্য ধারণা দেয়া এবং অভিনয়ের style নিয়ে কতটা চিন্তাভাবনা হয়েছে—নাট্যকলার উন্নতির জন্যে কতো মানুষ কতোভাবে চিন্তা করেছেন—এ সম্পর্কে কিছু তথ্য দেয়া।

গিরিশবাবুর অভিনয়ে সুর ছিল এবং শুরুর যুগে প্রকাশভঙ্গিমাও আকারে-প্রকারে বড় ছিলো—যার প্রভাব অমৃতমিত্র থেকে নির্মলেন্দু লাহিড়ী পর্যন্ত কার্যকর ছিলো। অন্যদিকে অর্ধেন্দুশেখর আবার আর এক রীতির অভিনয় প্রবর্তন করলেন যার ঐতিহ্য শিশির কুমার পর্যন্ত চলে এলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাটক আর শুধু শিল্পের পোশাক পরে চলতে চাইলো না। গদ্যময় জীবন আর জীবিকা—মানবিক তাগিদকে সোচ্চারে প্রকাশ করা হলো রঙ্গমঞ্চে। শুরু হলো নবান্নর যুগ। সেই থেকে বাংলার রঙ্গমঞ্চে কতো 'ইজ্‌ম' এলো—কতো কায়দা—কতো রকমের আন্দোলন। কিন্তু এরপর? পর্দা পড়িলো আর দর্শকের মাথার ওপর আলো জ্বলিলো এবং সকলে মুগ্ধ হইয়া গৃহে গমন করিলো? সম্ভবতঃ না। তার কারণ বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়, নাট্যকলা, নাট্যউন্নয়ন নিয়ে যে সব দিকপালেরা এ পর্যন্ত নানাভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছেন সেই সব চিন্তাগুলিকে খুব সংক্ষেপে একজায়গায় রাখা যাক। উদ্দেশ্য নিজের চিন্তা বাড়ানো এবং কথা শেষ করে কাজের মধ্যে প্রবেশ করা। না, বিদেশী পণ্ডিতদের কথা এখন বাদ থাকবে। প্রয়োজনে ব্যবহারিক দিক নিয়ে যখন

আলোচনা হবে তখন সুবিধামত (যদি প্রয়োজন হয়) বিদেশী পণ্ডিতদের কথা কিছু কিছু বলা যাবে। এই অবকাশে বাংলা রঙ্গমঞ্চে এতোদিন যাঁরা অনেককিছু করে গেলেন সেই সব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কলাকৌশল সম্পর্কেও তো কিছু বলা যাক। যাতে করে বাংলা অভিনয়-শিল্পের একটা সামগ্রিক ধারণাকে আমরা চোখের সামনে রাখতে পারি। বটেই তো। কিন্তু সে কাজ কি অতোই সোজা! পড়াশোনা করে গবেষণা করার মতো মানুষ কৈ? আছে বৈকি। তা হলে গবেষণা হোচ্ছে না কেন? নিষ্ঠা আর অনুসন্ধিৎসু মনের মানুষের অভাব। কারণ বাংলা ভাষা সৃষ্টির আগে যে অভিনয়-রীতি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল সেই নিয়েই তো একটা আটশো পাতার থিসিস হতে পারে। আর বাঙালীর হাতে বাংলা রঙ্গমঞ্চ এবং অভিনয় নিয়ে আরো একটা হাজার পাতার থিসিস হতে পারে। তাছাড়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আজকের এই সময় পর্যন্ত এদেশে অভিনয়-শিক্ষা নিয়ে কোথায় কি হচ্ছে সে সব কথা ভাবলে তো স্যারিডন খেতে হবে।

এখন দেখা যাক না কেন—অতীত থেকে এপর্যন্ত দিকপালেরা কে কি বললেন। আসলে, কথাগুলো থেকে কেবল সারকথা কিছু সামনে রাখছি। হয়তো কারোর কাজেও লাগতে পারে।

মাইকেল মধুসূদন ঃ

কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস কোথা তব কালিদাস
কোথা ভবভূতি মহোদয়
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঃ

'স্বভাবের দান ছাড়া অভিনেতার শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। নটের কার্য্য to give to airy nothing a local habitation and a name. কল্পিত ও সাংসারিক চরিত্র উপলব্ধি ব্যতীত নট কখনও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না।

হেমেন্দ্রকুমার রায় (অনুমিত) ঃ

রঙ্গালয়ের দর্শকরা যা দেখতে যায়, সেই অভিনয় ছাড়া একালের থিয়েটার যে আর সব বিষয়ে উন্নত হয়ে উঠেছে, একথা অস্বীকার করবার কোন কারণ নেই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ

দেশের কল্যাণের জন্যই আজ দেশের নাট্যকারগণের কলমের গাঁটে গাঁটে আইনের ফাঁস বাঁধা এবং এমন কথাও আজ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে যে, দেশের কবি, দেশের নাট্যকারগণের অন্তর ভেদিয়া যে বাক্য, যে সঙ্গীত বাহির হইয়া আসে, দেশের তাহাতে কল্যাণ নাই, শক্তি নাই।

কাঙাল হরিদাস ঃ

আমরা আজকাল দেখিতেছি, নাটকাভিনয় একরূপ ব্যবসায় ও প্রতিহিংসা চরিতার্থের উপায়স্বরূপ হইয়াছে। এ ব্যাপার যেমন দুরূহ তাহাতে কৃতবিদ্য ব্যক্তির ভার লওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আমরা অনেক স্থলে গণ্ডমূর্খের দল দেখিতে পাই।

বিপিনচন্দ্র পাল ঃ

I do not refer here to what are called the chorous gives in the English Theatre, but to those who are real actress, who have to study to understand, to practise the different characters in the play which they are called upon to interpret before large and critical audiences.

মনোমোহন গোস্বামী ঃ

...অভিনেতাগণের মধ্যে অধিকাংশই হস্তিমূখ এবং মূর্খতাই আমাদিগের রঙ্গালয়ের উন্নতির পথে বিষম অন্তরায়; অনেক অভিনেতাই একেবারে দিগ্‌গজ পণ্ডিত; তাঁহাদিগের যে আর কিছু শিখিবার আছে, এ কথা তাঁরা ধারণা করিতে অক্ষম...যতদিন না রঙ্গালয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয় ততদিন নাট্যমঞ্চের উন্নতির গতি কখন দ্রুত হইতে পারে না।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ (গিরিশচন্দ্রের শোক সভায়)

নিজের দোষ নিজে ব্যক্ত করিলে মনে স্বতঃই শান্তির উদয় হয়—সহজে সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

শ্রীমতী সুশীলাবালা ঃ (গিরিশচন্দ্রের শোক সভায়)

...গুরুদেবের দেহান্তরে যদি শিষ্যের শোক স্বাভাবিক হয়, তবে আমাদের ক্রন্দন, আমাদের হাহাকার, আমাদের শোক দোষনীয় হইবে কেন?

দ্বিজেন্দ্রলাল ঃ

…অভিনয়ের ঘটনাগুলি যত প্রত্যক্ষবৎ হয় ততই ভাল। সেইজন্য উক্তিগুলি যত স্বাভাবিক হয় ততই শ্রেয়।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঃ

স্টার থিয়েটারের কাজ চলিত ঠিক যেন কলে, ঠিক যেন ঘড়ির কাঁটার তালে। আড়ম্বর নাই, হৈ হৈ নাই, ঢাক নিনাদ নাই, ধাপ্পা নাই, চাল নাই, হুজুগনাই,—নিরুপদ্রবে, নীরবে যে যাহার কার্য্য করিয়া যাইতেছে। সব বিষয়েই এখানে একটা ধরা বাঁধা নিয়ম ছিল।

শিশির কুমার ঃ

নিজে খুব বড়ো অভিনেতা না হলে, অভিনয় সম্পর্কে খানিকটা তত্ত্বজ্ঞান না থাকলে কেহই একটা অভিনেতৃমণ্ডলীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন না।

একটি জাতির পরিচয় তার রঙ্গমঞ্চে। সুতরাং জগতের বড় জাতি বলে পরিচিত হতে হলে উন্নত নাট্যশালার প্রয়োজন।

অমৃতলাল বসু ঃ

নাট্যশাস্ত্রে আছে সূত্র, ভারতে ভরতপুত্র
রাজার সমান হবে গম্ভীর উদার।
রাজার সমান তার, শাসন-পালন-তার,
সে কেলের সূত্রধর আজ ম্যানেজার॥
ভাবভঙ্গি আচরণে, রাজারে রাখিয়া মনে,
স্থির করে লবে নট নিজ ব্যবহার॥

ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ঃ

অভিনয়-বিদ্যার 'বর্ণ পরিচয়' কালের শিক্ষনীয় আর একটি বিষয়ের প্রতি এখনকার অনেক ঔদাসিন্য দেখা যায়। অনেক অভিনেতাই আজকাল রঙ্গমঞ্চে যাতায়াত করিতে ও দাঁড়াইতে জানেন না।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ

এই সকল নাট্যশালা সাধারণ না হইলেও উহাদের সাজসজ্জা অতি উচ্চাঙ্গের ছিল। এই গুলিতে যে সকল অভিনয় হইত তাহাতে খুব উৎকর্ষ দেখা যাইত। প্রকৃত প্রস্তাবে সখের নাট্যশালাতেই বাংলা দেশের সাধারণ নাট্যশালার ভিত্তিস্থাপন ও শিক্ষা হয়।

আমি থিয়েটারের হিস্ট্রি
গ্রীন চশমা নাকে দিয়া গো
দেখি গ্রীনরুমের মিস্ট্রি
রাঙা ছেলেগুলি সখা সাজে সব
করে নারীর মত রব
তাদের আবার দেখে আক্কেল গুড়ুম
ইচ্ছে হয় কিস্ করি।

একদল যখন 'বুঝলে কি না' প্রহসন অভিনয় করে তখন অন্যদলে—যেমন ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 'কিছু কিছু বুঝি' নামে প্রহসন লিখে অর্ধেন্দুশেখর ধর্মদাসসুরকে দিয়ে অভিনয় করিয়ে দেখিয়ে দিলেন। ওপরের দৃষ্টান্তটি সেকালের সাহিত্যিক দলাদলির একটি চূড়ান্ত নমুনা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ

ছয় মাস যাবৎ দিনে রিহার্সাল আর রাতে বিবিধ যন্ত্রসহকারে কনসার্টের মহলা চলিল…অভিনয় নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল…দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব চেষ্টার কোন ক্রটি করা হয় নাই।

শংকর ভট্টাচার্য ঃ

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ছিল বাঁশীর মত এবং সে স্বরের বিস্তার ছিল খুব বেশী। তাঁর অভিনয় ছিল আবৃত্তিপ্রধান এবং সে আবৃত্তি ছিল অত্যন্ত সুর ঘেঁসা। তিনি তাঁর নাটকে যে সব ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সেগুলি তাঁর নিজস্ব প্রতিভার সঙ্গে খাপ খাইয়েই সৃষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ ঃ

…যাহা বড় তাহা কেন নিজের অংশে খর্ব করিতে যাইবে। ভাবুকের চিত্তের মধ্যেই রঙ্গমঞ্চ আছে। সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে যাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল…বিলাতের ষ্টেজে শুধুমাত্র এই খেলার জন্য যে বাজে খরচ হয়, ভারতবর্ষের মত অভ্রভেদী দুর্ভিক্ষ তাহার মধ্যে তলাইয়া যাইতে পারে।

ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায় ঃ

নাট্যকার যে সব চরিত্র সৃষ্টি করেন, সেই সব চরিত্রের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য, তাদের স্বভাব, তাদের সংস্কৃতি অনুধ্যান করে সম্যকভাবে আয়ত্ত করেন,

অভিনেতা তারপর সেই আয়ত্ত চরিত্রকে আপনার মনন ও বোধির জারক রসে জারিয়ে রূপায়িত করেন মঞ্চে।

শম্ভু মিত্র ঃ

জীবনের ওপরের স্তরের তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটি উত্তরণ করে আমরা যেন চলিষ্ণু বর্তমানের রূপটি প্রকাশ করতে পারি। খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে, স্বল্প কিন্তু গভীর রেখায়।

শোভা সেন ঃ

সখীর দল থেকে ধীরে ধীরে শীর্ষে ওঠার কাহিনীর পেছনে অনেক সাধনা অনেক ত্যাগের ইতিহাস থাকে। এখনকার মত গ্ল্যামার দিয়ে নাম কেনার যুগ সেটা ছিল না। সাধনা শিক্ষা ও তপস্যার সঙ্গে সঙ্গে জীবনমন এই ব্রতের পেছনেই সমর্পণ করেছিলেন তাঁরা। তাই তো এঁদের কাছে আজকের আমরা ম্লান। অভিনয়ের মান আজ কোথায় নেমে এসেছে!

ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ ঃ

সহস্র সহস্র অশিক্ষিত দর্শকের ঘন করতালির মূল্যাপেক্ষা একটি সুনিশ্চিত নাট্যকলা-বিশারদ দর্শকের নিরপেক্ষ ও সহানুভূতিসূচক ইঙ্গিতের মূল্য অনেক অধিক···শিক্ষা কর, চিন্তা কর, তোমার মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তি আপনি বিকশিত হইবে।

উৎপল দত্ত ঃ

অভিনেতার কাজটা কি? সে মঞ্চে গিয়ে চেষ্টা করে সত্য হতে, বাস্তব হতে, অথচ সামনে বসে আছে একঘর দর্শক যাদেরকে সে ভুলতে পারে না। যাদের জন্যে তাকে গলা তুলতে হয়, সজোরে হাত-পা নাড়তে হয়, যেটা স্বভাবতই অবাস্তব, অসত্য। তাই অভিনেতা একই সঙ্গে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী। অভিনেতা একশত বার রিহার্সাল দিয়ে মঞ্চে আসে, তার প্রতিটি কথা ও অংগভঙ্গী অনুশীলিত, সুনির্দিষ্ট; অথচ মঞ্চে প্রতি মুহূর্তে তাকে এমনভাবে কথা কইতে হয় যে মনে হবে জীবনে এই প্রথম কইছে। প্রবল শৃংখলার মধ্যে স্বাভাবিক হতে হয়। অভিনেতা একই সঙ্গে শৃংখলিত এবং মুক্ত, নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ঃ

এই যে পণ্য হিসেবে শিল্প গুলো চার পাশে ঢুকছে এবং প্রচণ্ড ভাবে বাড়ছে —তাদের শক্তি বাড়ছে, বাড়ছে ব্যাপ্তি—সেটা প্রতি মুহূর্তে রুচিকে

পালটাচ্ছে। রুচিকে নিম্নগামী করছে। লোককে অধৈর্য্য করে তুলছে। শিল্প এবং শিল্পে টিঁকে থাকার জন্য যে মানসিকতা সেটা নষ্ট করছে…

এগুলোই কারণ—সাংস্কৃতিক জগতের এই চেহারাটা, মোটের ওপর প্রমোদ বস্তুর চাহিদা ও সরবরাহের গণ্ডগোল, ব্যবসায়ীদের ভূমিকা, সেই ভূমিকার ফলে লোকের রুচি দিনের পর দিন নিম্নগামী হওয়া এবং সেই রুচিতে বাজারটাকে আরো খারাপ করে দেওয়া, শিল্পসৃষ্টির—শিল্পবোধের পরিবেশ নষ্ট হওয়া।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ

আমার ধারণা commitment ছাড়া কোন থিয়েটার হতে পারে না। সত্যি বলতে গেলে side করতেই হবে। আমি এমনভাবে সত্য বলতে পারি যে সত্যটা মিথ্যারই ভাই। খুব গায়ে গায়ে লেগে থাকে। আমি বললাম যে আমি বাস্তবকে দেখাচ্ছি। সোজা কথা হোচ্ছে বাস্তবটা কার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাচ্ছি।

কথা কথা কথা। এত কথা কেন? লাভ কি হলো? লাভ হলো কথায় কথা বাড়লো। আমরা তো কাজের চেয়ে কথাই বেশী ভালবাসি? নয়কি! থিয়েটার নিয়ে কাজ হোচ্ছে ঠিক—কিন্তু কাজের চেয়ে কথা আর লাফালাফিটা কি বেশী হোচ্ছে না?

নইলে এত দলাদলি কেন? ব্রেশট্, স্তান্‌লিস্লাভস্কির পরে আর কি করতে হবে?

নকল?

তা তো করি। সামান্য কজন দিকপালদের কথা বাদ দিন। এ পর্যন্ত যা কাজ হয়েছে তা কিছুটা ব্যক্তিগত স্বার্থে এবং খানিকটা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। শিল্পী অভিনয় করবে শিক্ষা না নিয়েই? গিরিশবাবু তো শিক্ষা দিতেন—শম্ভু মিত্তির তো বহুরূপীতে অনেককেই শিক্ষা দিয়েছেন—উৎপলবাবুর অবদান কি ভুলে যাব? নিশ্চয়ই না। তবুও আমি কিংবা দূর গাঁয়ের কোন একটি নাটুকে পোকায় ক্ষতিগ্রস্ত মাথা নিয়ে কোন একজন বহুরূপী, নান্দিকার বা উৎপলবাবুর দলে কিছু শিখতে চাইলে শিখতে পাবে কি? না। তা হলে অতীত থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু প্রসার বিশেষ করে নাট্যশিক্ষার তা ব্যক্তিগত চেষ্টায়—নিজের দলকে ঠিক রাখার জন্যে নতুবা একটা প্রযোজনাকে সফল করে

তোলার জন্যে অথবা নিজে ওপরে ওঠার জন্যে। দেশের বিপুল মানুষের নাট্য-পিপাসার ক্ষুধা নিবারণের জন্য ব্যাপক নাট্যশিক্ষা সম্প্রসারণের কথা কতজন চিন্তা করছেন?

আর একটা ভাববার কথা বলি। এ সব অবিশ্যি আমার নিজের কথা। আমার ভাবনার সঙ্গে মিল হলে আমাকে মেনে নেবেন। যদি মিল না হয় তাহলে আমার সম্পর্কে আর যাই ভাবুন—দোহাই তর্ক জুড়বেন না।

এটাতো আমরা সকলেই জানি যে—অভিনয় শিল্প এমনই একটি শিল্প যেখানে একা কিছু করা যায় না—করা সম্ভবও নয়। অনুশীলন, শিক্ষা এবং উপস্থাপনার প্রতিটি ক্ষেত্রে যৌথ প্রয়াস প্রয়োজন হয়। কিন্তু অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে এমন কোন উল্লেখযোগ্য এবং নির্ভরশীল আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যাতে করে আমি আমার ছেলেমেয়েদের নির্দ্ধিধায় এই শিল্পে অংশ গ্রহণের জন্যে ছেড়ে দিতে পারি। যতদিন না এই নির্ভরতার চাক্ষুষ প্রমাণ পাচ্ছি—যতদিন না রঙ্গমঞ্চে চারিত্রিক অবক্ষয় থেকে ভয়হীন চেষ্টার ইঙ্গিত পাচ্ছি ততদিন এই পপুলার শিল্পে যে অপটু এবং আনাড়িদের ভীড় একটু বেশী হবে—এটাই স্বাভাবিক।

তবে খুব সুখের কথা—ইদানিং অনেক শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করে মঞ্চ জগতে আসতে চাইছেন। খুব বেশী কিছু হওয়া আবার অগ্রগতির পরিপন্থী হতে পারে। তাই বলি—অল্প হোক, কিন্তু তা যেন সার্থক হয়। হাজারটা উঁচু নীচু, সরু গর্তে বোঝাই করা রাস্তার চেয়ে—একটা চওড়া সোজা রাস্তা অনেক ভাল—তাতে দ্রুত যাওয়া যায়, হোঁচড় খাওয়ার ভয় থাকে না—পথের একটা সুনির্দ্দিষ্ট নিশানা থাকে বলে পথ হারানোও ভয় থাকে না। আর সেই পথ রচনা করা তখনই সম্ভব যখন এই শিল্পের সাধনা ও শিক্ষনের ব্যাপকতা অনুধাবন করে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত বিজ্ঞান-সম্মতভাবে নাট্যশিক্ষা সম্পর্কে নীতিগ্রহণ এবং তাকে কার্য্যকর করতে পারবো।

কেউ হয়তো বলতে পারেন—মঞ্চজগৎ ছাড়া কি অন্যত্র চারিত্রিক অধঃপতনের দৃষ্টান্ত নেই? কেন থাকবে না। কিন্তু মঞ্চের জগৎটা এত কাছাকাছি যার অনেক কিছু সামনাসামনি দেখতে পাওয়া যায়। অন্যত্র যা ঘটে তা নেপথ্যে। যাক গে সেই সব কথা। কথা বলতে শুরু করে কথার পিঠে কথা বাড়বে। মোট কথা—একটিই কথা—যে কোন বিষয়ে একটি নৈষ্ঠিক দিক অবলম্বন করলে তাতে লাভ ছাড়া লোকসান হয় না।

যুক্তি-তর্ক-মীমাংসা ঃ নাট্যশিক্ষণ ২

অভিনয়ের জন্যে আবার শিক্ষা কিসের মশাই ?

অভিনয় কি শেখার জিনিস ?

মঞ্চে অভিনয় করবো তার জন্যে আবার নিয়মমাফিক ট্রেনিং ! এতদিন তো এসব কথা শোনা যায়নি। যে দিন গেছে তাকে আঁকড়ে ধরে লাভ কি ? যা গেছে তাতো উপলব্ধির বিষয়। যা আজ চলছে তা আজ বুদ্ধি দিয়ে ভাবার বিষয়। যা কাল আসবে তাকে সঠিক পথে চালিত করার জন্যে অনুশীলন, নোতুন আবিষ্কারের প্রয়োজন। নোতুন আবিষ্কার আর অনুশীলন কি শিক্ষা ছাড়াই হয় ? কথাটা নিশ্চয়ই ভাববার মত। আবার ভাবনার কথা ভাবতে বসলে তর্ক আসবে—আসবে নোতুন ভাবনার উদ্ভাবন। আসুক না কেন ! এতদিন যে চালে মঞ্চ জগতে অভিনয় চলছিল তা থেকে যদি নোতুন পথের উত্তরণ ঘটে তাতে আপত্তি কিসের ?

আপত্তি অনেক। তর্কের খাতিরে হোক আর বেপরোয়া বুদ্ধিক্ষেপণকে প্রশ্রয় দেওয়ার সূত্রেই হোক আপত্তি অনেক। আবার অনেকের আপত্তি অনেক রকমের। এখন দেখা যাক—আপত্তিগুলো কোন কোন দিক থেকে আসে। হঠাৎ করে যদি কেউ রাগ না করার মত অনুগ্রহ করেন তা হলে বলি—আপত্তি-গুলো আমার নিজের মনগড়া নয়। তা হলে ?

গত কয়েক বছর অভিনয় পরিচালনা বিষয়ে হাতে-কলমে কাজ করাতে হয়েছে অনেক জায়গায়। শহরে ইণ্ডিয়ান থিয়েটার আর্টস্-এর ছাত্রছাত্রীদের

সঙ্গে। তার সংখ্যা অবশ্যই কম। তাছাড়া গ্রামীণ নাট্যপ্রশিক্ষণ প্রকল্পে প্রায় দশ হাজার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাজ করার সময় নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। উত্তরও দিয়েছে। কেউ খুশী হয়েছেন—কেউ আবার খুশী হয়নি। শিক্ষণ শিবিরে অনেকে এসেছিলেন শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে। কেউ এসেছিলেন মজা দেখতে আবার কেউ এসেছিলেন নিজেদের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সুপরিচিতি দিতে। সুতরাং বানানো কথা নয়। এদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে মানুষের কাছে এসে আমার ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে যা জানতে পেরেছি বর্তমান আলোচনায় সেই অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করবো। আর সঙ্গে সঙ্গে আগেকার ভারাক্রান্ত শিক্ষা-শৈলীকে মোটামুটি সোজা ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করবো। উদ্দেশ্য —সবাই যাতে বুঝতে পারেন।

তাহলে অভিনয় শিক্ষার বিপক্ষে যে তর্ক উঠেছে আগে সেই সব তর্কগুলোকে এক জায়গায় রাখছি। যাঁরা অভিনয় শিক্ষার স্বপক্ষে থাকবেন আর কিছু না হলেও তাঁরা আমার লেখা যে শেষ পর্যন্ত পড়বেন এ বিশ্বাস রাখি। তবে শিক্ষা তো আর শুধু পড়ে হয় না—করে, ঠেকে, জেনে, শুনে, ভেবে এবং শিখে তবেই শিক্ষার বিস্তার ঘটে।

এবারে অভিজ্ঞতাপ্রসূত তর্কের কথা।

১ম তর্ক: অভিনয় শিল্পী জন্মায়—তাকে তৈরি করা যায় না। তবে অভিনয় শিক্ষা কেন?

২য় তর্ক: এত দিন এদেশের মঞ্চে যাঁরা অভিনয়ের দিকপাল হিসেবে চিহ্নিত হলেন তাঁরা তো কেউ শিক্ষা নেননি। তাহলে অভিনয় শিক্ষা কেন?

৩য় তর্ক: শিক্ষা ছাড়াই যখন অভিনয় শিল্পের তথা নাট্য-শিল্পের মান উন্নত হোচ্ছে—সে ক্ষেত্রে শিক্ষার জটিলতা আরোপ করে নাট্য-শিল্পকে ভারাক্রান্ত করার চেষ্টা কেন?

৪র্থ তর্ক: [আমার প্রতি ব্যক্তিগত কটাক্ষ] অভিনয় নাটক সম্পর্কে যখন এত আপনি পণ্ডিত তখন অভিনয় না করে চারিদিকে শিক্ষা দানের জন্যে মাতামাতি করছেন কেন?

৫ম তর্ক: [অনুরূপ] অমুক শিল্পী অমুক পুরস্কার পেয়েছেন—আপনি এত শিক্ষা নিয়ে কোন পুরস্কার পাচ্ছেন না কেন?

৬ষ্ঠ তর্ক: পূজামণ্ডপে নাটক করা—অবসর বিনোদনের জন্য সখের

থিয়েটার থেকেই তো নোতুন শিল্পীর সৃষ্টি হয়েছে এদেশে—সুতরাং কি কারণে সখের থিয়েটারে আর প্রতিযোগিতার ওপর কটাক্ষ করছেন ?

৭ম তর্ক : আপনার এখানে নাটক সম্পর্কে জানতে এসে আপনি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না, উল্টে আমাদের অপমান করেন—আমরা, বিশেষ করে আমি (?) এই প্রশিক্ষণের প্রতিবাদ করি।

৮ম তর্ক : তত্ত্ব (Theory) জেনে কি হবে! প্র্যাকটিক্যাল কিছু থাকলে করে দেখান। আমরা কিছু দেখতে পেলেই শিখতে পারবো।

৯ম তর্ক : অতীতের বড় বড় শিল্পী পরিচালকরা কত কাজ করেছেন—তাঁদের কথা তাঁদের শিক্ষা পদ্ধতি বিষয়ে কিছু বলা হচ্ছে না কেন ?

১০ম তর্ক : রবীন্দ্রনাথ কোন স্কুল গিয়ে কবিতা শেখেননি—নাটকের জন্যে আবার স্কুল-কলেজে শিক্ষার কি প্রয়োজন আছে ?

এবারে প্রশ্নের জবাব দিই একে একে।

: জবাব বা উত্তর :

১ম তর্ক :

অভিনয় শিল্পী জন্মায় ঠিক—তাকে তৈরি করা যায় না তাও ঠিক। কিন্তু মঞ্চের প্রয়োজনে অভিনয় শিল্পীকে তৈরি হতে হয়।

২য় তর্ক :

কে বললে শিক্ষা নেননি ? প্রতিভারও তো শ্রেণীবিভাগ আছে। দারুণ প্রতিভাজাত শিল্পীর পক্ষে কোন জিনিস আয়ত্ব করতে যে সময় লাগে, অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগে কম প্রতিভাধর শিল্পীর। তাছাড়া, তাঁরা শিক্ষা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে না নিলেও—প্রচুর পড়াশোনা করেছেন, বড় বড় প্রতিভাধর মানুষের সান্নিধ্যে এসেছেন এবং অভিজ্ঞতার নির্যাস দিয়ে একটা পরিশীলিত শিল্প সৃষ্টি করেছেন। এর জন্যে অনেক দিন এবং দীর্ঘ সময় লেগেছে। আগে শিক্ষার জন্য শিক্ষকও ছিল না আর শিক্ষা গ্রহণের জন্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ছিল না। তাই তাঁদের দীর্ঘ সময় নাট্যসাধনায় ব্যয়

করতে হয়েছে। সুতরাং শিক্ষা ছাড়া সেই প্রতিভার উত্তরণ সম্ভব হয়নি। প্রত্যক্ষ না হলে পরোক্ষভাবে শিক্ষা নিতে হয়েছে—নাট্যবিষয়ে শিক্ষিত হতে হয়েছে। নইলে তাঁরা দিকপাল হলেন কি করে ?

৩য় তর্ক :

শিক্ষাগ্রহণের প্রথম ধাপ জটিল হবে। আপনার অনুসন্ধিৎসা—জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাগ্রহণ ক্রমশঃ জটিল থেকে সহজ—সহজ থেকে সহজতর হবে। একথা সত্যি সামাজিক প্রয়োজনে প্রসিনিয়াম থিয়েটারের সম্প্রসারণ একটা অপ্রতিহত গতি নিয়ে এগিয়েছে এবং একথাও সত্যি নাট্যশিক্ষা ছাড়াই এদেশে নাট্যকলার সম্প্রসারণ ঘটেছে। ফলে একক প্রতিভার কারুকৃতি নিয়ে আমরা অনেকটা এগিয়েছি ঠিক। কিন্তু আজ? হঠাৎ কেন নাট্যমঞ্চ এক জায়গায় এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে? কেউ বলবেন —অনেক নাটক হোচ্ছে—বহুদিন ধরে নাটক চলছে, এর কি কোন মূল্য নেই? আমি বলবো—গতানুগতিকতার চশমাটা খুলুন দয়াকরে—নাটকগুলো দেখুন আরো পরিষ্কার চোখে। দেখুন সত্যি কি একটু একঘেয়েমি প্রশ্রয় পাচ্ছে না? দর্শক চাহিদাকে সামনে রেখে মাথায় চাঁটি মেরে মুনাফাবাজীর দল মঞ্চ জগতে কি করছেন? এই পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি যদি না আসে—নোতুন চিন্তাশক্তি প্রয়োগের দিকে যদি ঝোঁক না দেন তা হলে আজকে নোতুন করে নাট্যশিক্ষা নেবার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমিও বিশ্বাস করি না। অভিনয় শিক্ষা বা নাট্যশিক্ষা জটিলতা সৃষ্টির জন্যে নয়—শিল্পের মান উন্নয়নের জন্যে। প্রতিভা থাকলেই সেই প্রতিভা বিকশিত হবে তার কোন মানে নেই। প্রতিভাকে অরগানাইজড বা সংহত করার জন্যে বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই আছে। প্রাচীন ভারতেও নাট্যশিক্ষা ছিল, কালিদাসের আমলেও নাট্যশিক্ষার প্রচলন ছিল—বর্তমানে উন্নতিশীল প্রতিটি দেশেই নাট্যপ্রশিক্ষণের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। তবে এটা ঠিক—নাট্যমঞ্চ সকলের জন্যে নয়—নাট্যমঞ্চ সাধকের পীঠস্থান। যাঁরা সাধক নন—সাধনা না করে যাঁরা আসর মাৎ করতে চান—নাট্যশিক্ষা তাঁদের জন্যেও নয়।

৪র্থ তর্ক :

মাফ করবেন আমি মোটেই পণ্ডিত নই। তবে বহু পণ্ডিতদের সান্নিধ্যে এসেছি। অতীত যা করেনি—যার ফলে আমরা চলতে চলতে পথ হারাতে বসেছি—আমি সেই সব পণ্ডিতদের কথাই সাজিয়ে দেব, ভবিষ্যৎ শিল্পীদের

জন্যে। আমি হোঁচট খাওয়া ছুমড়ে পড়া নাট্যশিল্পকে শিক্ষার নোতুন আলোতে উদ্‌ভাসিত করতে চাই—আর চাই উপেক্ষিত শিল্পীদের কাছে কিছু দৃষ্টান্ত রাখতে—যাতে তাঁরা সামনের দিনে কিছু পান আর না পান অন্ততঃ ভাবনা চিন্তা করে তবে কিছু করেন—আমি সেই কাজ করতে চাই। তাই অভিনয় করি না—পরিচালনা ছেড়ে দিয়েছি—নাটক লেখা প্রায় বন্ধ (নিজস্ব খেয়ালীপনা—কাঁচা ভাষায়—পাগলামো আর কি! কারণ সবাই তো সমান নয়) অভিনয় তো অনেকে করেছে—দেশের অভিনয় শিল্পের দশাতো জানা গেছে? তাছাড়া কে সুযোগ দেবে? পয়সা কোথায়? কাজেই সবাই যা করছে আমি না হয় একটু আলাদা কিছু করলুম! এত দল তার মধ্যে আর একটা দল বাড়িয়ে কি লাভ! দীর্ঘ দিন তো বাংলা মঞ্চে দলাদলি চলে আসছে। এর থেকে আমি না হয় একটু তফাতে থাকি।

তাছাড়া একটু শিক্ষাদীক্ষা আর মার্জিত রুচীর কথা ভেবে একটু চেষ্টা করা যেতে পারে—যদি শিক্ষাসচেতন মানুষ দলাদলির নামাবলী খুলে ফেলে একসঙ্গে কাজ করতে পারেন এবং এক জায়গায় সব শিল্পীর শিল্প যখন মিলিত হয়ে নাট্যশিল্প হয় তখন সব শিল্পী দলাদলির উর্দ্ধে কেন একটা প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াতে পারবে না? ঠিক এর জন্যেই দরকার নাট্য-শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ। একমাত্র সুশিক্ষাই সামগ্রিক স্বার্থে মহত্তম শিল্প সৃষ্টির সহায়ক। সুতরাং শিক্ষার শুরুটা জটিল হলেও—তাকে আপন করে নেয়ার মধ্যেই ক্রমশঃ তা সরল হয়ে উঠে।

৫ম তর্ক :

ছুর মশাই! অমুক শিল্পী তো নমস্য। গুণে-মানে-জ্ঞানে-সম্মানে। কার সঙ্গে কার তুলনা! আমার ওপরেও কেউ নেই—সঙ্গে আছেন আপনারা। সুতরাং ভালমন্দ যা কাজ করছি সেটাই আমার পুরস্কার (আসলে তিরস্কারও হতে পারে)। আর আমি নাটকে শিক্ষা নিয়েছি? কে বললে? যদিও বা কিছু শিক্ষা নিয়ে থাকি তা নিজের তাগিদে। আর পুরস্কার? সে দু'চার জায়গায় পেয়েছি (না মশাই চেনা জানা বা ধাক্কা দেবার মত কেউ ছিল না আজও নেই)। তাছাড়া এদেশে শিক্ষা নিয়ে কেউ যে উচ্চ শ্রেণীর পুরস্কার পায় তাতো জানতুম না। শিক্ষান্তে এদেশে বিদেশে কিছু ছাপা কাগজের ওপর সইকরা মানপত্র পেয়েছি (ডিগ্রি, ডিপ্লোমা আর কি!) লোক দেখানো পুরস্কার—কাগজে ছবি বেরুনোর মত—বেতারে আলোচনা হবার মত কোন

পুরস্কারে আমার লোভ নেই। পেলেও দুঃখ নেই—না পেলেও দুঃখ নেই। আসলে কাজটাই বড় কথা। আর যে দেশের কাজের সময় পুরস্কারের বা সম্মানের মূল্য নেই—মৃত্যুর ঠিক আগে বা পরে পুরস্কার বণ্টনের ব্যাপার সেদেশের (যদিও নিজের দেশ) পুরস্কারকে আমি খুব প্রয়োজনীয় বলে মনে করি না।

ষষ্ঠ তর্ক :

কে অস্বীকার করছে? পূজামণ্ডপ, প্রতিযোগিতা সখের দল থেকেই তো আমাদের থিয়েটারের বিস্তৃতি। কিন্তু সেটাতো প্রথম যুগের কথা। সেই রবীন্দ্রনাথের কথা—'কেমনে মানুষ হইবে, না করিলে খেলা'! কিন্তু খেলা যখন শিল্পে উত্তীর্ণ হলো—খেলা যখন পৃথিবীব্যাপি স্বীকৃতি পেল তখন খেলা তো আর খেলা থাকে না। সেই খেলায় পূর্ণতা এলে বড় একটা বোধ, বড় একটা সত্যের প্রকাশ হয় আর ঠিক তখনই প্রয়োজন সঠিক নিশানা—নিষ্ঠাসহ অধ্যবসায়—দীর্ঘ অনুশীলন। অনুশীলন কি শিক্ষা নিরপেক্ষ?

আর প্রতিযোগিতা নিয়ে রাগ করবেন না দোহাই। শিল্পের কোন প্রতিযোগিতা হয় বলে আমি বিশ্বাস করি না। এক একটা শিল্প স্বরূপে স্বতন্ত্র। রঙ্গমঞ্চ তো খেলাধূলোর স্টেডিয়াম নয়। খেলাধূলায় নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করার একটা ব্যাপার আছে। জাল আঁটা কাঠের ফ্রেমের ভেতর বল প্রবেশ করিয়ে গোল দেয়ার ব্যাপার আছে। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে এমন কোন ব্যাপার নেই। এটা শিল্পের স্থান—তাই পুরস্কার নয়—সম্মান—প্রাইজ নয়—অনার বা এওয়ার্ড। প্রতিযোগিতা নয়—উৎসব অর্থাৎ কমপিটিশন নয়—ফেসটি-ভ্যাল। অন্য দেশে যেমন নাটকের উৎসব হয়—আমাদের দেশে উৎসব নয়—প্রতিযোগিতা। শিল্পের প্রতিযোগিতা যে হয় না . হতে পারে না, এমন কথা বলতে চাই না। প্রতিযোগিতা হলেও তার স্বরূপ আলাদা—আর সেই প্রতিযোগিতার জন্যে একটি নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করতে হয়—নইলে প্রতিযোগিতার সার্থকতা কোথা? আমাদের দেশে সরকার নাট্যশিক্ষা সম্পর্কে বিশেষভাবে উদাসীন বলে থিয়েটারের জন্যে ট্যাক্স বসানোর প্রশ্ন ওঠে—থিয়েটার যে জাতীয় জীবন আর চরিত্রকে প্রতিভাত করে সরাসরি সে কথা ভাবলে নাট্যশিল্পের জন্যে সরকার এতদিন কিছু-না-কিছু করে ফেলতো। বিদেশে থিয়েটারের উন্নতির জন্যে যেমন সরকারী-বেসরকারী কর্তৃপক্ষ দু'হাত উজাড় করে অর্থ ব্যয় করে—আমাদের দেশে সে সব কোথা? সুতরাং যা করার তা নিজের চেষ্টায়—নিজের সাফল্যের জন্যে—ব্যক্তিগত

প্রচেষ্টায় কিঞ্চিত বেশী। কিন্তু ব্যাপক নাট্যশিক্ষা এবং সেই শিক্ষায় সরকারী স্বীকৃতি থাকলে আমরা নিশ্চয়ই আরো নোতুন কথা ভাববো।

৭ম তর্ক:

সব প্রশ্নের উত্তর কি আর সবাই গুছিয়ে দিতে পারে! প্রশ্ন যখন আশা করবো তখন উত্তর দেবার জন্যে নিশ্চয়ই সচেতন থাকবো। কিন্তু আমি বিশ্বের বিশ্বকর্মা নই। কাজেই সব প্রশ্নের জবাব না দেয়াটাই স্বাভাবিক। তবুও প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতে হবে। কিন্তু যিনি প্রশ্ন করছেন তিনি যদি সজ্ঞানে আগে থেকেই প্রশ্নের জবাব মনে মনে ঠিক করে রেখে জবাব প্রত্যাশা করেন তা হলে ব্যাপারটা জামাই ঠকানোর মত হবে না কি? প্রশ্নের যিনি জবাব দেবেন তিনি যেমন সচেতনভাবে যে বিষয়ে প্রশ্ন সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। যিনি যে বিষয় নিয়ে কাজ করছেন—সেই বিষয়ে কি কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে—তিনি সে সম্পর্কেও সজাগ থাকবেন। কিন্তু প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন যদি বিষয়ের বাইরের কিছু হয়। তা হলে? প্রশ্নকর্তা উত্তরদাতাকে বিপাকে ফেলবেন ঠিক—কিন্তু প্রকাশ্যসভায় আর যাঁরা অনেক প্রত্যাশা নিয়ে জানতে এসেছেন তাঁদের প্রতি সুবিচার করবেন কি? কাজেই তাৎক্ষণিক বুদ্ধিজীবি হওয়ার চেয়ে প্রশ্নকর্তার দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন হওয়া সবার আগে প্রয়োজন। নইলে ঝগড়া বাড়বে। কাজের থেকে অকাজের দিকে আমরা মনোনিবেশ করবো। প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন নিশ্চয়ই করবেন—জানার আগ্রহে, আর যে আগ্রহ সামগ্রিক স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিতর্কের আসর আর সাধনার পীঠস্থান কি এক জায়গা? জ্ঞান অন্বেষণের প্রথম ধাপে যে প্রশ্ন আসবে তা অন্যায় নয়—কিন্তু প্রশ্নের চেয়ে জানার আগ্রহ বিরাট হলে তবেই মহৎ কার্যকর কিছু জিনিস পাওয়া যায়। আর অজানা জিনিস জানতে এসে যদি কেউ অপমানিত বোধ করেন আমি সেই অপমান—সজ্ঞান ব্যক্তিকে করজোড়ে অনুরোধ করবো—দয়া করে সকলের স্বার্থ জড়িত এমন কোন সভায় উপস্থিত হবেন না। কারণ, জ্ঞান যিনি নিতে আসেন অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করা যার আন্তরিক ইচ্ছা তাকে প্রথমেই বিনয়ী আর নম্র হতে হয়। জ্ঞান অর্জন করতে এসে যিনি জ্ঞান দিতে চান তিনি আর যাই করুন—সবার আগে নিজের সম্পর্কে সচেতন হোন। নইলে—সারাজীবন শুধু প্রশ্নই করবেন—উত্তর পাবেন না। বরং উত্তরের চেয়ে প্রকাশ্যে উপেক্ষিত হবার সম্ভাবনাই বেশী। কাজেই যা প্রশ্ন করবেন তা যদি জ্ঞানার্জনের পক্ষে সচেতনভাবে না আসে তা হলে যিনি জবাব দিচ্ছেন তিনি সেই অসচেতন অবুঝকে বোঝানোর জন্যে যদি একটু জোরে কথা বলেন তাতে অপমানের

প্রশ্ন ওঠে কেন? অপমান সচেতন মানুষ—প্রশ্ন সচেতন না হলে প্রশ্নকর্তা সম্পর্কে কি ভাববো? তাছাড়া একজন দু'জনের প্রতিবাদে সারা পৃথিবীব্যাপি স্বীকৃত নাট্যপ্রশিক্ষণকে কি করে বাতিল করা যায়? বাতিল করা যেতে পারে। কিন্তু শুধু প্রতিবাদ করলেই তো হবে না—ভাবতে হবে হাজার হাজার ভবিষ্যৎ নাট্যকর্মীর জন্যে তিনি প্রতিবাদ করার পর কোন্ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন?

৮ম তর্ক:

কে বললে থিওরী প্র্যাকটিশের বাইরের জিনিস। দীর্ঘ দিনের ব্যবহারিক জ্ঞান এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতি হচ্ছে থিওরী। অনেক দিনের অনেক জনের সাধনার নির্যাস ঘেঁটে তবেই একটা থিওরী তৈরি হয়। থিওরী ছাড়া কখনো প্র্যাকটিস সার্থক হয় না। অনেক থিওরী এবং তার প্রয়োগবিধি সম্পর্কে পূর্বে জ্ঞাত হতে পারলে তবেই অনেক দিনের সাধনা—অনেক মানুষের সাধনাকে অল্পদিনের মধ্যে জানা যায়। যার ফলে নিজে নোতুন সূত্র বের করতে পারবেন—নোতুন করে সবকিছু ভাববেন। থিওরী এবং প্র্যাকটিশ যাকে বলে তত্ত্ব আর ব্যবহার—তা কিন্তু একের সঙ্গে অন্যে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই দু'টি জিনিসকে কখনো পৃথকভাবে দেখা ঠিক হবে না। আসলে জিনিসটা অনেক দিনের অনেক চিন্তার ফলশ্রুতি বলে—তত্ত্বকে প্রথমে একটু শক্ত বলে মনে হবে। কিন্তু একটু চোখ খুলে তাকালে আর সহজ করে ভাববার মত মানসিক প্রস্তুতি নিলে কোন তত্ত্বই আর শক্ত বলে মনে হবে না।

যাঁরা বলেন আমরা দেখলেই শিখতে পারবো—তাঁরা সম্ভবতঃ ভুল করেন। কারণ অভিনয়ের ক্ষেত্রে 'করা'টাই বড় জিনিস—শিখতে গেলেই করতে হয়। দেখাতে জানার আগ্রহ বাড়ে। কিন্তু অভিনয় শুধু জানাতেই সব নয়। আগে জানা—তারপর ভাবা আরো পরে করা—সবশেষে মঞ্চে নামা। আবার করা অর্থে দু'একদিন নয়। দীর্ঘদিন—দীর্ঘ সাধনা—একটা সুনির্দিষ্ট পথ ধরে। গান কি কেউ শুনলেই গাইতে পারে? ছবি আঁকা চোখে দেখলেই কি আঁকা যায়—নাকি নিয়ম মেপে পথ চলে তবেই সাধনায় উন্নীত হতে হয়? গানে যখন দীর্ঘ তালিম—দীর্ঘ চর্চা—দীর্ঘ অনুশীলন—অভিনয়ে নয় কেন?

৯ম তর্ক:

কে বললে বলা হচ্ছে না। বলুন যতটা বলা দরকার ততটা বলা হচ্ছে না। তাছাড়া অতীতের অভিনেতা, পরিচালকরা কাজ করেছেন ঠিক। কিন্তু ভবিষ্যৎ শিল্পীদের সম্পর্কে নিকট অতীতের লিপিবদ্ধ কোন জিনিসের

পরিমান কতখানি বর্ত্তমান। সার্বিকভাবে চিন্তা করে থিয়েটারের মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা যতদিন না কার্যকর হোচ্ছে—এবং সরকার পাশে এসে পরোক্ষ ভূমিকা নিচ্ছে ততদিন আমাদের ব্যক্তিগত চেষ্টার মধ্য দিয়েই সাফল্য আনতে হয়। এ দেশে বিভিন্ন প্রতিযোগিতাগুলি সেক্ষেত্রে আপাততঃ—অন্তত আমাদের দেশে মোটামুটি একটা ভূমিকা পালন করছে। অনেক অখাদ্যের মধ্যে যদি কিছু প্রোটিন পাওয়া যায়! যাচ্ছেও। কাজেই প্রতিযোগিতা বা সখের দলের ওপর আমার কোনরূপ অনাস্থা বা অনীহা নেই। আমি বলছি—প্রতিযোগিতা বা সখের থিয়েটারে প্রতিভাধর মানুষের চেয়ে ইদানিং আনাড়ী মানুষের ভীড় বেশী হচ্ছে। যা অনেকটা অতীতের তার সম্পর্কে গল্প শুনে বা কিছু লেখা পড়ে ধারণা করতে হয়। যা একটু নিকট অতীতের তাকে জানতে টেপ—বড্ড জোর কিছু স্টীল ফটোগ্রাফ। থিয়েটার সংরক্ষণের জন্যে আরকাইভ এখনো আমাদের দেশে হয়নি যার ফলে অতীতের কর্মকাণ্ডের ভূমিকা বা অবদান সম্পর্কে আজ যতটা আবছা দেখতে পাচ্ছি ভবিষ্যতের নাট্যকর্মীরা আরো অন্ধকার দেখবে। সুতরাং প্রস্তুতি নেয়ার সময় এলো—নোতুন করে কিছু করার, ভাবার আর সংরক্ষণের। অতীতের শিক্ষাবিদের নামের তালিকা আঙ্গুলে গুণে বলা যায়। তাঁরা নির্দিষ্ট কি পথ দিয়ে গেছেন বা সে কাল সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য কোন দলিল আমাদের হাতে আছে কি—যা ভবিষ্যতের শিল্পীদের হাতে তুলে দেব—যেমন নাকি ভরতের নাট্যশাস্ত্রকে কাছাকাছি দেখতে পাই।

১০ম তর্ক :

ঠিক কথা। কিন্তু কবিতা আর নাটক কি এক বস্তু? কবিতা নির্লিপ্ত এক জগতের আত্মগত প্রকাশ—ভূমিকাটা সেখানে একক। ভাষা তার মাধ্যম। কিন্তু নাটক—নাটক তো দৃশ্যকাব্য। নাটক যৌথ শিল্প। সব শাস্ত্র নিয়ে তবেই নাট্যশাস্ত্র। এখানে সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি কি না আছে। কাজেই অনেক শিল্পীর শিল্পকে নিয়ে যেখানে আর একটা বৃহৎ শিল্পের প্রকাশ সেখানে শিক্ষা ছাড়া সেই শিল্পের বিকাশ কি করে সম্ভব? রবীন্দ্রনাথ কবিতা স্কুলে গিয়ে শেখেননি ঠিক। কিন্তু তিনি গান নাচ অভিনয় নিজের হাতে শেখাতেন কেন? রবীন্দ্রভারতী, বিশ্বভারতী কিংবা নাট্য-শিক্ষা দেয়া হয় এমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে নাটক বিভাগ বা চারুকলা বিভাগ তুলে দেয়াই ভাল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে নাটকের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার

জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে মাননীয় পণ্ডিতের কথায় সেগুলো অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়াই উচিত—নয় কি ?

সিদ্ধান্ত :

অভিনয় শিল্প—শিল্প মানেই নোতুন সৃষ্টি—শিল্প শিক্ষা নিরপেক্ষ নয়, শিক্ষা সাপেক্ষ। বহু দিনের বহু সাধকের বহু সাধনার মূল সূত্র এবং সেই সূত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে সচেষ্ট না হলে আগেরটা জানবো কি করে ? আগেরটুকু জেনে তবেই তো নোতুন সৃষ্টির জন্যে প্রস্তুতি নিতে হয়। আসলে আমাদের দেশে শিক্ষা ছাড়াই অভিনয় শিল্পের প্রসার ঘটেছে দাপটের সঙ্গে—তাই দীর্ঘ ব্যবধানের পর যখন শিল্পের কথা ভাবি—শিল্প সৃষ্টি করি তখন শিল্পের একটা সুচিন্তিত শিক্ষাক্রম সম্পর্কে একটা বাস্তব ধারণা আমাদের সামনে থাকে না বলেই 'শিক্ষা' কথাটা মেনে নিলেও শিল্পের জন্যে শিক্ষা কথাটা মেনে নিতে একটু অসুবিধা হয় অথচ শিল্প সাধনা আর অনুশীলন নিরপেক্ষ নয়। কিন্তু সাধনা আর অনুশীলন কি শিক্ষা নিরপেক্ষ ? জেনে হোক, না জেনে হোক যখন শিল্প সৃষ্টি করছি তখন লজিক্যাল (যুক্তিসম্মত) আর রিয়াল (বাস্তব সম্মত) করার জন্যে আমরা একটা সুচিন্তার জগতে অবশ্যই উপনীত হই—এলোমেলো কিছু করে সার্থক সৃষ্টি হয় না। কাজেই জেনে হোক না জেনে হোক অভিনয় সম্পর্কে মোটামুটি চলে যাওয়া গোছের একটা জ্ঞান বা শিক্ষা নিয়ে তবেই মঞ্চে উঠি। আর অকালপক্করা—আনাড়ি শিল্পী পদবাচ্য অভিনয় কুশলীরা প্রতিভার নাম নিয়ে বাজী মাৎ করতে গিয়ে বিরাট এক দর্শকের কাছে যে কি পরিমান হেয় হয়ে পড়েন সে কথা ভাবতে পারলে আমাদের দেশের নাট্য-জগতে এত অশিক্ষিত পটুত্বের বাড় বাড়ন্ত হতো না।

তাছাড়া—অভিনয় শিল্পের, দুটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটির কথা বলে এ পর্যায়ে আলোচনা শেষ করবো। প্রথম ত্রুটি—অভিনয় শিল্প তাৎক্ষণিকতা দোষে দুষ্ট—যতক্ষণ অভিনয় ততক্ষণই তার আবেদন। বড়জোর কিছুদিন সেই আবেদন মনের মণিকোঠায় স্থায়িত্ব লাভ করে, কিন্তু দীর্ঘ দিন নয়। দ্বিতীয় ত্রুটি—অভিনয় শিল্পের জটিলতার কথা খুব বেশী ভাবনার অবকাশ না রেখে—সরাসরি স্বল্প সাধনায় প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ পাওয়া যায় বলে এই শিল্পে অন্যান্য শিল্পের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী মানুষ অংশ গ্রহণ করে। দলাদলির কথা বাদ দিলুম। শিল্পসচেতনতা এবং শিক্ষার প্রচণ্ড ভূমিকার কথা ভাবলে অহং বোধ দূর হতে পারে। প্রতিভা অনেক বেশী থাকলেও

নিষ্ঠাহীন হলে কতজন কতদূর এগুতে পারেন? এরপর ভাবুন—বাংলার রঙ্গমঞ্চ প্রথম দশায় যা ছিল—অভিনয়ের গুণগত মানের দিক থেকে আমরা নিজস্ব কোন মানে উত্তীর্ণ হতে পেরেছি কি? অবিশ্যি কেউ কেউ দর্শক রুচীর কথা বলতে পারেন। অভিযোগ তুলতে পারেন এই বলে—দর্শক নেই—ভাল জিনিস দেখাবো কি করে? তাই দর্শক যা চায় তাই দেখাবো! বা! এই যদি সিদ্ধান্ত হয় —ভারতে ৮০% ভাগ যেখানে নিরক্ষর সেখানে দর্শক সৃষ্টির আন্দোলনের কথা না ভেবে শুধু কেরামতি দেখিয়ে অভিনয়ের মান উন্নয়ন করবো? ষ্টাণ্ট? প্যাচ? তা হলে এর থেকে বেরিয়ে আসার উপায়? দর্শক সৃষ্টির আন্দোলনে নামতে গেলে দৃষ্টিশুদ্ধির প্রয়োজন। নিজেরা আগে নোতুন করে আন্দোলনে নামুন। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে আমাদের দর্শক যা দেখছেন তা ভুলিয়ে নোতুন কিছু দেখানোর জন্যে আপনাকে নোতুন চিন্তাভাবনা, নোতুন পরীক্ষায় নামতে হবে। কিন্তু সেই পরীক্ষা কি টুকে না শিক্ষা গ্রহণ করে—দীর্ঘ সাধনার মধ্য দিয়ে? টুকে হয়তো সাধারণ পরীক্ষায় পাশ করা যায়—কিন্তু সেখানে পরীক্ষক এক বা একাধিক। আর অভিনেতার পরীক্ষা হয় হাজার হাজার মানুষের সামনে—সেখানে টোকাটুকি বা ফাঁকি দেবার কোন স্থান নেই, ফাঁকি দিলেই পরিপক্ক দর্শকরা ঠিক হাতে-নাতে ধরে ফেলবেন।

সুতরাং সিদ্ধান্ত—আবার নোতুন করে শিক্ষা—নোতুন যাত্রা—নোতুন আলোর সন্ধানে। যেখানে দর্শক, আপনি, আমি কেউ দূরের নয়—সবাই কাছের। অভিনয় শিল্পে অভিনেতা বা অভিনেত্রীরাই আবার নোতুন মূল্যবোধের পথ দেখান। শিল্পীরভূমিকা সেক্ষেত্রে শুধু হাততালি পাওয়া নয়—পুরস্কার সেখানে তুচ্ছ—মানবিক আর শৈল্পিক স্বার্থই সেখানে বড়। যে স্বার্থে আসবে মানবিক মূল্যবোধের নবতম প্রতিষ্ঠা। কাজেই কাজ শুরু হোক—অ-আ-ক-খ থেকে।

ভারতবর্ষ ঃ আমাদের গর্বিত নাট্যশাস্ত্র ৩

অভিনয় কত রকমের? এক কথায় উত্তর হলো যত রকমের নাটক তত রকমের অভিনয়। নাটক কত রকমের? অসংখ্য রকমের। কিন্তু সেই অসংখ্য রকমগুলো কি কি? কত বলবো—রাজনৈতিক, সামাজিক, পরিবারিক, মনোস্তাত্বিক—এগুলো সবাই বাস্তবিক বা রিয়েলিষ্টিক পর্যায়ে পড়তে পারে। আবার ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, কাব্যনাটক, সিমবলিক, এনটি থিয়েটার, এবসার্ড, সাররিয়েলিস্টিক, রূপক, নিওরিয়েলিস্টিক, ক্লাসিক, এপিক, এনভারমেন্টাল, ওপেন, টোটাল, কমিউন—আরো কত বলবো। কিন্তু এই সব নাটকের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য কি? আর বৈশিষ্ট্য জানার পর এইসব নাটকে অভিনয় করার জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন রীতিপ্রচলিত আছে সেগুলো বা কি? এই আলোচনায় বসলে আলোচনা মহাকাব্যে পরিণত হবে। আমরা গভীরে যাব যখন তখন গোড়াটা ভালভাবে বুঝতে পারবো। নইলে একতলা ভিতে দশতলা বাড়ী তুললে যে দশা হয় আমাদের দশা তার বাইরের একটা কিছু হবে বলে মনে হয় না।

নাটকের সংজ্ঞা আমরা জানি। দৃশ্যকাব্য, কিন্তু অভিনয় কি জিনিস তাকি আমরা জানি? কাজেই প্রথমে অভিনয় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলো উল্লেখ করা যাক। সম্ভব হলে একটা সংজ্ঞা নিরূপণ করে অভিনয় করতে গেলে কোন কোন দিক থেকে ভাবনা চিন্তা করে অনুশীলনে নামতে হবে তা ঠিক করা যেতে পারে। এবং অভিনয় শিল্পকে একটা বিজ্ঞানভিত্তিক সূত্রের

মধ্যে এনে অভিনয় সম্পর্কে গোটা ব্যাপারটার ব্যাপকতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে কিভাবে হাতেনাতে কাজ করা যায় তার একটা সুনিশ্চিত পথ বের করা যেতে পারে কিনা সে বিষয়ে চেষ্টা করা যেতে পারে। বিভিন্ন শাস্ত্রকার ও পণ্ডিতদের মতামত উদ্ধৃতি করা যাক।

১। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের পরিভাষায় :

অভিনয় হোচ্ছে —নাট্যান্তর্গত চরিত্রগুলির অবস্থার অনুকরণ

২। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের মতে—নিজ ব্যক্তিত্ব পরিহার করে নাট্য-চরিত্রের ব্যক্তিত্ব গ্রহণ করা—এক কথায়—নাট্যচরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হওয়া

৩। অভিনয় একদিকে যেমন নিরপেক্ষ তেমনি সাপেক্ষও বটে। অর্থাৎ শুধুমাত্র কোনও একটি ব্যক্তির বা অভিনেতার ক্রিয়াকৌশল প্রদর্শন নয়, বিশেষ পরিস্থিতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন চরিত্রের পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার অনুকরণ।

৪। রস ভিন্ন কোন বিষয় প্রবর্তিত হয় না। সেই নাট্যবিষয়ে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসের নিষ্পত্তি হয়।

স্থায়িভাবের যেটা কারণ তাকে বিভাব বলে। যেমন—একদল ছেলে বাগানের ঘাসে বসে ফুল দেখছে। এখানে একদল ছেলেকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বলে 'ছেলের দল' আলম্বন আর বাগান, ফুল ইত্যাদি উদ্দীপন বিভাব। তাহলে অনুভাব কাকে বলে ?

অনুভাব বলতে বুঝবো স্থায়ী ভাবের যা কাজ (action and expression) —যেমন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা—চোখ পাকানো, কটাক্ষ করা ইত্যাদি অনুভাব।

আর স্থায়ীভাবের যা সহযোগী ভাব তাকে ব্যভিচারী ভাব বলে। এদের সঞ্চারীভাব বলতে এখন কারো আপত্তি ওঠে না।

৫। নিরপেক্ষ শিক্ষা হিসাবে অভিনয়কে 'নাট্যশাস্ত্র' এবং 'অভিনয় দর্পণ' বইয়ে চাররকমের বলা হয়েছে। যেমন আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য।

আঙ্গিক = অঙ্গসঞ্চালন ও চালচলন

বাচিক = সংলাপ প্রয়োগ

সাত্ত্বিক = ভাবভঙ্গিমা

আহার্য = দৃশ্যপট রচনা, রঙের ব্যবহার, অঙ্গরচনা, আলোক সম্পাত, নেপথ্যে শব্দক্ষেপণ ইত্যাদি নেপথ্য বিধিকেই বোঝায়।

ওপরের সংজ্ঞাগুলো বা বিক্ষিপ্ত কথাগুলি দেশীয় পণ্ডিতদের কথা। ঠিক

এখানেই গর্ব। কিন্তু কথাগুলি বিক্ষিপ্ত বলে আমরা অভিনয় সম্পর্কে দেশীয় মেজাজ তথা বৈজ্ঞানিক নীতি সম্পর্কে সচেতন হতে পারি না। কাজেই আগের আলোচনাগুলো এখন সহজভাবে ভেবেচিন্তে মাপজোক করা যাক।

প্রথমেই বলি—আমরা গর্বিত। গর্বিত আমাদের শাস্ত্র সম্পর্কে। কিন্তু দুঃখীত কারণে যে আমাদের ঐতিহ্যপূর্ণ এই শাস্ত্র সম্পর্কে নোতুন করে কোন গবেষণা করা হয়নি। দুঃখীত এই কারণেও আমাদের শাস্ত্রের এই অমূল্য সম্পদকে সহজ সরলভাবে ভবিষ্যৎ শিল্পীদের নাট্যশিক্ষা উন্নয়ণের জন্যে কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ আমাদের আধুনিক পাণ্ডিতরা করেননি। আরো দুঃখ পাবার কারণ—পণ্ডিতরা অতীত পণ্ডিতের পণ্ডিত্য নিয়ে আরো বেশী পণ্ডিত হবার চেষ্টা করেছেন। নইলে অভিনয় শিল্পের এমন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে সামগ্রিক প্রয়োজনের স্বার্থে ব্যবহার করা হয়নি কেন? সে যাই হোক।

আমার দুঃখে কে হয় দুঃখীত!

উপরের বিক্ষিপ্ত উক্তিগুলির মধ্যে কি অন্তঃনিহিত নির্যাস আছে এবং তা কত ব্যাপক এবং জটিল তা এবার বলার চেষ্টা করি।

আমাদের ভরতমুনির সময়সীমা সম্পর্কে হয়তো অনেক বিতর্ক আছে। তা থাকুক—তবুও ভরতমুনি আমাদের আপনজন একথা ভেবে নিশ্চয়ই খানিকটা প্রশান্তি আসে। আরো প্রশান্তি আসে যখন জানতে পাই ভরতমুনির 'পূর্ব্বেও কিছু আলোচনা এবং তত্ত্ব নির্ধারণ হয়েছিল। নাট্যরসের আলোচনাকাল তাই ভরতমুনি অপেক্ষাও প্রচীন, পানিনি ব্যাকরণে নটসূত্র-কর্তার উল্লেখ থাকায় এই মত আরো দৃঢ় হয়।'

উল্লিখিত পাঁচ রকমের সূত্র থেকে প্রায় দুহাজার বছর পেরিয়ে আজকের যুগে বসে 'একাত্ম হওয়া' আর 'অনুকরণ' কথাগুলোকে বাদ দেব। তবে কোনো জিনিস হুট করে বাতিল করার আগে যেই বাতিল বস্তুটিকে নিয়ে একটু বিশেষভাবে ভেবে নিতে হয়।

চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হওয়ায় আপত্তি হবে। কারণ অভিনয় সচেতনভাবে না করলে অভিনয়-শিল্পীর পক্ষে অনেক দুর্যোগ দুর্বিপাকে পড়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু অনুশীলন পর্বে একাত্ম হওয়াকে যদি একাগ্রতা বা কনসেনট্রেশন বলা হয় তা হলে 'একাত্ম' হওয়ার তাৎপর্য থেকে যায়—নয় কি?

'অনুকরণ' সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। যদিও অভিনয়-শিল্পী একজন

স্রষ্টা। তিনি সৃষ্টিশীল ব্যক্তি। কাজেই 'অনুকরণ' কথাটা মানবো কেমন করে? কিন্তু অভিনয় শিক্ষার পর্বে—অনুকরণ করতে হয়। জন্মগত সূত্রেই আমরা অ-আ-ক-খ শিখি না। বোধের সঙ্গে সঙ্গে অপরে শেখায়—আমরা কথা শিখি—ক্রমান্বয়ে ভাষা—ভাষা থেকে সাহিত্যসৃষ্টি। আর সাহিত্যসৃষ্টি হলেই শিল্পীপদবাচ্য হই। তখন আর অনুকরণ নয়—তখন কেবল সৃষ্টি। প্লেটোও স্বীকার করেন—অনুকরণ প্রবৃত্তি থেকেই শিল্পীর জন্ম। সুতরাং 'অনুকরণ' কথাটি এখানে ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত।

এছাড়া আমাদের নাট্যশাস্ত্রে অভিনয়-শিল্পী এবং শিক্ষা সম্পর্কে এমন অনেক কথা বলা হয়েছে যা সুচিন্তিত বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানেরই ফলশ্রুতি। যুগ যখন পরিবর্তনশীল—এবং বস্তু যখন একই থাকে ঠিক সেই সময় বস্তুকে পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলে তা বুঝতে সহজ হয়। জানার আগ্রহ বাড়ে। ফলে সৃষ্টির মাহাত্ম্য আরো ব্যাপকতা লাভ করতে বাধ্য হয়। অতীতে বিজ্ঞান সম্পর্কে ঠিক কতখানি অগ্রগতি ছিল তা জেনে ওঠা সম্ভব নয় বলে বিক্ষিপ্ত উক্তি ভাষাগতভাবেও খানিকটা জটিল থেকে যায়। কাজেই আজকে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে মেনে নিয়ে যদি পারম্পরিকসূত্রে সেই বিক্ষিপ্ত জিনিসগুলোকে একত্রিত করা যায়—আমার মনে হয় এতে ভবিষ্যৎ শিল্পীদের এগিয়ে দেয়ার পক্ষে অনেকখানি প্রয়োজন মিটবে।

এখন দেখা যাক গর্বিত ভারতে অভিনয়-শিল্প সম্পর্কে শাস্ত্রকাররা আরো কতখানি এগিয়ে ছিলেন।

'প্র্যাকটিক্যাল কিছু বলুন না!'

বলবো—নিশ্চয়ই বলবো। একটু ধৈর্য ধরুন। ধৈর্য না ধরলে অভিনয় করবেন কি করে। নোতুন সৃষ্টি করার জন্যে অতীতকে একটু জানতে এত অনীহা কেন? সত্যি যদি মঞ্চে উঠে লম্ফঝম্ফ করার ইচ্ছা হয় তা হলে আমার লেখা সংগ্রহ করলেন কেন? নিজেকে, নিজেদের না জেনে ইনটেলেকচুয়াল হবার বাসনা? নাট্যমঞ্চ কি শুধু সখ মেটানোর জায়গা? নাকি সাধকের পীঠস্থান? সস্তা সুনাম(দুর্নাম?) কেনা যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় তা হলে শিল্পী সাজার জন্যে কিছু নিজস্ব ভক্ত খুঁজুন—অন্তত দাদা আখ্যা পাবার জন্যে—ঠিক সময়ে হাততালি পাওয়ার জন্যে। নয়তো দল গড়ে তুলুন—আর ভাঙুন—তা না হলে মোটা ফ্রেমের চশমা, শৈল্পিক পাঞ্জাবী কিছু তৈরি করুন—তা না হলেও বেশ

কিছু অভিনয় করে থাকলে বেশী করে মদ্যপান—অথবা অমুক শিল্পীদের দৃষ্টান্ত দেখে প্রয়োজনবোধে প্রকাশ্যে বেশী করে নারীজাতিতে আসক্ত হোন। এতো কিছু করেও যদি কিছু না হয় তা হলে তর্কবাগিশ হয়ে দলাদলিতে মেতে যান। ব্যস্! মঞ্চজগৎ যে ভবিষ্যৎ শিল্পীদের শিক্ষাপূর্ণ একটা সাধনার বেদীমূল তা না প্রমাণ করতে পারলে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা কেন এই শিল্পের জগতে আসবে। এই জগৎকে নির্ভয় এবং নির্ভরযোগ্য সাধনাসাপেক্ষ অতিরিক্ত শিক্ষার স্থান হিসেবে আজকের নাট্যকর্মীরা যদি না প্রতিপন্ন করতে পারেন তাহলে আমাদের দেশের থিয়েটারের ভবিষ্যৎ কি? কোথায় পাবেন ভালো নাটক প্রযোজনার জন্য ভালো শিল্পী? সুদূর অতীত ভালো শিক্ষা দিয়েছে—কিন্তু কাছের অতীতের কাছে আমরা কি শিখেছি? দলাদলি—ফ্রাসট্রেশন—শালীনতাবোধের অভাব ইত্যাদি। এরই ফাঁকে কিছু সংগঠিত প্রতিভা একক চেষ্টায়—একক বুদ্ধি প্রয়োগে দর্শকের মাথায় চাঁটি মেরে এবং কিছু সরলমতী ছেলেমেয়ে জুটিয়ে দুপয়সা করে নিচ্ছে। আর অন্যদিকে—এই সব বিষয়ে সচেতন ব্যবসায়িক মহল পয়সার লোভে অন্বেষণ করছেন চাহিদার পরিপূরক শিল্পীদের। পয়সার লোভ যখন এলো তখন চিত্তবৃত্তি নিষ্প্রভ—প্রতিভা হতাশায় উত্তীর্ণ হয়ে দর্শকের চাহিদা পূরণে সক্রিয় ভূমিকা নিল। সুতরাং দোষ কার? দোষ আমাদের। সৃষ্টির চেয়ে যুক্তি বড়—পণ্ডিতের চেয়ে পাণ্ডিত্যের আস্ফালন বড় বলে আমরা সকলেই মাতব্বর। এমনটি চলতে দেয়া কোনোমতেই উচিৎ নয়।

কেউ বলবেন—সরকারী সাহায্য নেই—পয়সা কোথায়? ভালো জিনিস কি করে করবো? আমি বলি—ভালো জিনিস করলেই কি সবাই ভালোভাবে নেবে? কাজেই অভিনয়-শিল্পের প্রথাগত নিয়ম থেকে বেরিয়ে এসে নোতুন কিছু দেয়ার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করলে প্রথমে একটু অসুবিধা হলেও পরে নিশ্চয়ই ভালোফল পাওয়া যাবে—এই রকম আশা করা সম্ভবতঃ নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হবে না। এর জন্যে—প্রথমেই প্রয়োজন হবে—গভীর অন্বেষণ, সহনশীলতা, শালীনতাবোধ, বিনম্রভাব। যুক্তিতর্ক তো আছে—কিন্তু আজকের এই সময়কে নিয়ে তো ইতিহাস নয়—আজকের এই সময়ের স্মরণীয় কাজকে নিয়েই ইতিহাস।

কাজেই আজ আবার নোতুন করে জানা—নিজেকে জানা—জানা কোথায়

কতটুকু ফাঁক—কোথায় কতটুকু কাজ করলে বিভেদ নয়। সব শিল্পকে নিয়ে যখন নাট্যশিল্পের কাজ তখন বিভেদহীন নীতির উর্ধ্বে সবাইকে নিয়ে কিভাবে কাজ করা যায়—নাট্যশিল্পের প্রয়োজনীয়তা এবং সার্থক রূপায়ণ সম্পর্কে কাছের মানুষদের সচেতন করতে পারলেই আগামী দিনে নির্ভরশীলতার অবগুণ্ঠন থেকে মুক্ত হয়ে নাট্যশিল্প এক মহাসম্মিলনের পথ ধরে আপন গতিতে এগিয়ে চলবে। তখন দলাদলি ইতিহাস হবে—নোতুন সৃষ্টির আনন্দে আমরা সকলে স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবো। এরজন্যে সরকারের কি দায়িত্ব—কি কর্তব্য এসব কথা এখন নাইবা ভাবলুম। অন্ততঃ অশিক্ষিত পটু ত্বর হাত থেকে অভিনয়-শিল্পকে রক্ষা করার জন্য সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। **Coordination, Understanding** আব **Balance** ছাড়া কি থিয়েটার হয়?

নিকট অতীত যা ভুল করেছে আমরা না হয় সেই ভুলের কথা ভুলে গিয়ে নোতুন কাজে প্রবৃত্ত হই।

আগে যে কথা হচ্ছিল, কথা হচ্ছিল 'অনুকবণ' আব 'একাত্ম হওয়া' নিয়ে। এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে বলতে হয়—'এককত্ব ও দলীয়তা—তন্ময়তা ও সচেতনতা নিয়েই হ'ল অভিনয়।' কিন্তু তা হবে অনুকরণেব মাধ্যমে নয়—অনুশীলনেব মাধ্যমে—সৃষ্টির নবতম আনন্দ ও সৌন্দয সৃষ্টিব মৌল শর্ত হিসাবে।

এবাবে প্রাচীন ভাবতীয় মঞ্চাভিনয়েব প্রসঙ্গে কয়েকটি টুকিটাকি কথা বলি।

অভিনেতা সংলাপেব সাহায্যে চরিত্রচিত্রণ করেন। কিন্তু শুধু সংলাপেই চবিত্রচিত্রণ সম্ভব নয়। সংলাপকে চবিত্রানুগ করতে হলে তার বিশিষ্ট বাস্তবিক এবং যুক্তিপূর্ণ আবেগ প্রকাশেব সহায়ক হতে হবে। নইলে চবিত্রসৃষ্টিতে ছন্দপতন ঘটবে—সৌন্দয সৃষ্টি হবে না। দর্শকেব মনও ভরবে না। কাজেই অভিনয়েব ক্ষেত্রে চরিত্রগত রসনিষ্পত্তির একটা ব্যাপাব আছে। সেই রসনিষ্পত্তিকে আমরা চূড়ান্ত প্রকাশ (**Extreme Expression**) বলতে পারি—যার দ্বারা চরিত্র আপন রূপে প্রতিভাত হবে। কিন্তু কোন ভাব বা **emotion**-এর সাহায্য নিলে সেই চবিত্রগত রসনিষ্পত্তি ঘটানো সম্ভব?

মানুষের মনের ভেতর অনাদিকাল থেকে আটটি স্থায়ীভাবের কথা ভরতমুনি উল্লেখ করেছেন। তার সঙ্গে বিশ্বনাথ সাহিত্য দপর্ণে আরো দু'টি ভাব

যোগ করেছেন। এই মোট আটটি স্থায়ীভাবকে এবং পাশাপাশি তাদের প্রকাশ বা রসকে সাজিয়ে রাখা যাক।

স্থায়ীভাব (Emotion)	রস (Expression)	
১। রতি	শৃঙ্গার	
২। হাস	হাস্য	
৩। শোক	করুণ	
৪। ক্রোধ	রৌদ্র	
৫। উৎসাহ	বীর	
৬। ভয়	ভয়ানক	
৭। জুগুপ্সা	বীভৎস	
৮। বিস্ময়	অদ্ভুত	
৯। শম	শান্ত	সাহিত্য দর্পণে স্বীকৃত।
। স্নেহ	বাৎসল্য	

অভিনয়-শিল্পীকে উল্লিখিত ১০টি ভাবের প্রকাশ সম্পর্কে নিয়মিত অভ্যাস করতে হবে। তাছাড়া একটি স্থায়ীভাবের সঙ্গে অন্যান্য স্থায়ীভাব মিশ্রণ করে গভীর মনোযোগ এবং অধ্যবসায় সহকারে অভ্যাস করতে হবে। যেমন—ভয়জনিত উৎসাহ। বিস্ময় জনিত ক্রোধ ইত্যাদি।

এরপরে আসবে স্থায়ীভাবের পরিপূরক বা সহযোগীভাব হিসেবে 'সঞ্চারী বা ব্যভিচারীভাব।' এর সংখ্যা তেত্রিশটি যেমন—নির্বেদ, দৈন্য, শ্রম, জড়তা, নিদ্রা, ঔৎসুক্য, লজ্জা, গ্লানি, চিন্তা, বিতর্ক, স্বপ্ন, সন্ত্রাস, উন্মাদ, গর্ব, চপলতা ইত্যাদি। এখানেই শেষ নয়। এর পরেও আটটি সাত্ত্বিকভাব আছে। যদিও এই আটটি সাত্ত্বিকভাব চরিত্রের স্বভাবগত—কিন্তু স্বভাব emotion বা feeling-এর বাইরের কোনো জিনিস নয়। এই স্বভাবজ ভাবের নাম যথাক্রমে—ঘাম, স্থির, কম্পন, অশ্রু, ক্ষীণবর্ণহীন, শিহরণ, স্বরপরিবর্তন এবং অজ্ঞানতা।

তা হলে ভাব সংক্রান্ত বিষয়গুলির যোগফল দাঁড়ালো :

স্থায়ীভাব ১০ + সঞ্চারী ৩৩ + সাত্ত্বিক ৮=৫১

প্রতিটি ক্ষেত্রে আবার বর্ণ বিভাজন আছে। মঞ্চে রঙের ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ঠিক তেমনি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আরোপের জন্যে নানা

রঙের ব্যবহার করার নির্দেশ আছে, মনের রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। কলার সাইকোলজি আজকের জিনিস নয়—এদেশের মাটিতে অনেককাল আগেই ছিল। যেমন—

ভাব (Emotion)		বর্ণ (Colour)
১।	রতি	শ্যামল
২।	হাস	শ্বেত
৩।	শোক	কপোত
৪।	ক্রোধ	রক্ত
৫।	উৎসাহ	গৌর
৬।	ভয়	নীলাভ
৭।	জুগুপ্সা	গাঢ়নীল
৮।	বিস্ময়	পীত
৯।	শম	শাদা
১০।	স্নেহ	পীতাভ-শ্বেত

মুখাভিব্যক্তি সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রে ছ'রকমের উপাঙ্গের কথা বলা হয়েছে। যেমন—কপালের ওপর ভাগ, চোখ, ভ্রূ, নাক, অধর এবং চিবুক।

অভিনয় দর্পণে আরো বেশী—মোট ১২ রকমের, যেমন—না থাক। মাথার বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রে তের রকমের অভ্যাসের কথা বলা আছে। দৃষ্টি সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রে আট রকমের কথা বলা হয়েছে। পুটকর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে নয় রকমের। ভ্রূ'র কাজ সাত রকমের। নাকের কাজ ছ' রকমের। গাল ও ঠোঁটের কাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে ছ' রকমের। চিবুকের কথা বলা হয়েছে সাত রকমের। মুখ সম্পর্কে ছ' রকমের ক্রিয়া—গ্রীবা ন' রকমের।

এছাড়াও আঙ্গিক অভিনয়কেও মোট কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। হাতের অভিব্যক্তি সম্পর্কে ছ' রকমের কথার উল্লেখ আছে। পরে আরো চব্বিশ রকমের হাতের কাজের কথা বলা হয়েছে। বক্ষ লক্ষণ সম্পর্কে ভরত পাঁচ প্রকারের ক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন। এই সম্পর্কে আগ্রহীরা বিশেষভাবে জ্ঞাত হবার জন্যে 'নাট্যশাস্ত্র' বা ডঃ অজিত কুমার ঘোষের 'নাট্যতত্ত্ব পরিচয়' পুস্তক দু'টি দেখতে পারেন।

আমার আসল উদ্দেশ্য—অভিনয়টা আমরা যতটা সহজ ভাবি আসলে ততটা যে সহজ নয় তার সম্পর্কে অল্প কথায় বলার জন্যেই এতো কথা বলা।

এতোক্ষণ যা বলা হলো তা অবিশ্যি অতীত ঐতিহ্যকে স্মরণ করার জন্যেই। সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা সিদ্ধান্ত করা খুব একটা অযৌক্তিক হবে না যে ভাব—বিভাব—অনুভাব এবং সংলাপ সার্থকভাবে সম্মিলিত হলে তবেই আঙ্গিক বাচিক সাত্ত্বিক এবং আহার্য অভিনয় সার্থক হয়।

মনে হতে পারে—এতো গেল পুরোনো কথা—নোতুন যুগের কথা কৈ? সত্যি তো! এবারে তা হলে আসা যাক নোতুন যুগে। তবে পুরোনোকে অস্বীকার করে নয়। কারণ আমাদের যা পুরোনো সারা দুনিয়ার অভিনয় শিক্ষার আসরে তা আজো নোতুন—অনেক লজিক্যাল—অনেক সুচিন্তিত। যদিও এ পর্যন্ত অভিনয়ের সার্বিক সংজ্ঞা এখনো পর্যন্ত দিতে পারিনি। একটু অপেক্ষা করুন—ধৈর্য ধরুন—দেখবেন অভিনয়ের সংজ্ঞা আপনা হতেই সৃষ্টি হয়ে গেছে—ব্যবহারিক জ্ঞানার্জনের জন্যে একটা সুনির্দিষ্ট পথও আমরা আবিষ্কার করতে পারবো।

তবে দোহাই—আমার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত নয়—আমি পণ্ডিত নই—আমার ভুল ত্রুটী যে হবে না তাও হলপ করে বলা যাবে না। আমার ভুল থাকলে অন্যেরা নিশ্চয়ই সাবধান হয়ে আমার ভুল ধরিয়ে দিয়ে আরো নোতুন কোনো পথ আবিষ্কার করবেন—এইটুকুই আমার আশা। আমারটা আসলে শুরু—একে আরো মহত্তম এবং বৃহত্তম স্বার্থে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব আমার নয়—আপনাদের মধ্যে আমার কাজ নিয়ে যদি বিতর্ক হয় তাতেও আপত্তি নেই—আমার কাজ নিয়ে কেউ অপপ্রচার করলে আমার এতটুকু দুঃখ হবে না—আমার কাজে কেউ সম্মান জানালে আমি গর্বিতও হবো না। যদি কিছু আনন্দ কারো হয়—তবে আমি যেন সেই আনন্দের ভাগীদার হতে ᠄ রি।

কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশী আনন্দ হবে—যদি কেউ আরো বেশী কাজ করেন। আমার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্যে নয়—ভবিষ্যৎ নাট্যশিল্পীদের ফ্যাকাশে মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে।

আসুন—এবারে আমরা ব্যবহারিক কাজের দিকে আসি। আজকের যুগের কথা—হাজার হাজার উপেক্ষিত দূর-দূরান্তের—প্রবাসে পড়ে রয়েছেন এমন নাটক-পাগল মানুষের কথা ভেবে।

মঞ্চাভিনয় ঃ ব্যবহারিক প্রসঙ্গ ৪

শূন্যতার মধ্যে কোনো সৃষ্টি কখনোই সম্ভব নয়।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে অভিনয়-শিল্পীর দেহ যেমন আগে বিচার্য বস্তু—প্রয়োগের দিক থেকে মঞ্চকে বাদ দেয়া চলে না কোনমতে। একথা ঠিক—নাটক লেখা, প্রযোজনা নিয়ে যতবেশী জল্পনাকল্পনা করা হয়, আমার মনে হয় অভিনয় বিষয়টা নিয়ে ঠিক ততটা জল্পনাকল্পনা করার প্রচেষ্টা এখনো পর্যন্ত এদেশের মাটিতে খুব একটা দৃঢ় হয়নি। ইদানীং কালের নাটকে অভিনয়ের আত্মিক চেষ্টা ক্রমশঃ যেন বিলীন হতে বসেছে। তাই আমার অভিমত—আসুন না কেন অভিনয় বিষয়টা নিয়ে আরো কিছু চিন্তা ভাবনা করা যাক।

প্রথমে আমার নিজের চিন্তার কথা বলি। আমি অভিনয় নিয়ে থিসিস্ আওড়াবো না—নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করবো না।

বেশ ক'বছর এ লাইনে থেকে, পণ্ডিতদের সংগে মিশে, বিদেশে ঘুরে এবং কিছু পড়াশোনা করে যা অর্জন করেছি তাকেই যতটা সম্ভব গুছিয়ে বলার চেষ্টা করবো। আমার নিজস্ব কোনো মতামত ব্যক্ত করবো না—যদিও করি, তা আপনাদের মতের সংগে যে হুবহু মিলে যাবে তারও কোনো মানে নেই। তথাপি আপনাদের এবং আমার চিন্তা-ভাবনার যোগ-বিয়োগের মাধ্যমে আরো কিছু যে চিন্তা-ভাবনার আদান-প্রদান ঘটবে, আমার মনে হয়—সেইটুকুই বা কম কিসের!

ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনই অভিনয়ের মূল কথা। একজন অভিনেতা কিছুক্ষণের

জন্যে তাঁর ব্যক্তিজীবনের ব্যক্তিত্বের পোশাকটা খুলে রেখে অল্প সময়ের জন্যে অন্য এক ব্যক্তিত্বে উপনীত হন। আর যিনি যত তাড়াতাড়ি নিজের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটাতে পারেন তিনি হ'ন তত বড় অভিনেতা। তা তো হলো—কিন্তু অভিনয় জিনিসটা কি? অভিনয় হচ্ছে একটা বিশেষ প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার দ্বারা একজন অভিনেতা—নাট্যকার রূপায়িত এবং পরিচালক নির্দেশিত চরিত্রকে একটি মঞ্চের ওপর কিছু দর্শকের সামনে বিশ্বাসযোগ্যভাবে ব্যাখ্যা করেন। সে বাঁশের খুঁটি পুঁতে কাঠের পাটাতন কেলে অস্থায়ী মঞ্চ হোক, কিংবা হোক বাঁধা কোনো মঞ্চ অথবা রাস্তার কোনো বিশেষ স্থান। মোটকথা একদল দর্শকের সামনে আপনার ব্যক্তি জীবনের ব্যক্তিত্বকে কিছুক্ষণের জন্যে ধামাচাপা রেখে সক্রিয়ভাবে অন্য ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হতে হবে।

এছাড়া অভিনয়-প্রসংগে অনেক কথা প্রচলিত আছে। যেমন ধরুন—অভিনয় করতে গেলে নাট্যকার যে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন এবং নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন—প্রতিবেশ সৃষ্টি করেছেন—একজন অভিনেতাকে সেই চরিত্র ঘটনা এবং প্রতিবেশের সংগে মিশে যেতে হবে। আমি বলি, না—পুরোপুরি মিশলে চলবে না—মিশতে হবে বাস্তবের মতো—বাস্তবের কাছাকাছি—অর্থাৎ অভিনয় হবে বাস্তবসম্মত, ঠিক বাস্তব নয়। কারণ, অভিনয় একটা শিল্প, এতে আছে যুক্তি এবং বাস্তবতা। কাজেই অভিনেতাকে সজ্ঞানেই অভিনয় করতে হয়। মঞ্চ যখন মিথ্যার নামান্তর মাত্র সেক্ষেত্রে অভিনয় ঠিক বাস্তব এবং চরিত্রের সংগে মিলে মিশে একাকার হওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

একটি চরিত্রকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্যে যতটুকু আবেগ প্রক্ষেপণের প্রয়োজন সজ্ঞানচিত্তেই ঠিক ততটুকু আবেগের গ্রহণবর্জন সম্পর্কে রীতিমতো সজাগ থাকতে হবে। নচেৎ খুনের দৃশ্যে হয়তো সত্যকারের খুন করে বসবেন অথবা প্রচণ্ড কান্নার সময় আপনার আবেগ অনিয়ন্ত্রিত থাকার ফলে পরের সংলাপ আর বলতে পারবেন না—পরিস্থিতি রচনা করতে পারবেন না—অর্থাৎ কিনা সমস্ত ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে ফেলবেন। দর্শকরাও হতাশ হবে। তাই অভিনয়-শিল্পী প্রতিভা-জাত সম্পদ হয়েও শিক্ষা এবং অনুশীলন-সাপেক্ষ। তাহলে মোটামুটিভাবে বলা চলে একটা চরিত্রকে, স্বাভাবিকভাবে রূপ দেওয়ার জন্যে এবং দর্শককে আনন্দ পরিবেশনের জন্যেই আপনি অভিনয়-শিল্পে অংশ

নেন—আপনি সচেতন হয়েই একটা চরিত্রকে যতটা সম্ভব বাস্তবভাবেই রূপ দেন। এখানে আরো একটা প্রসংগ এসে পড়বে—একটা চরিত্রকে রূপ দেওয়াই কি অভিনেতার কাজ—অভিনয় কি শুধু চরিত্রের রূপারোপের ওপর নির্ভর করে? না, মঞ্চের ওপর একটা চরিত্রকে যথাযথভাবে রূপ দিতে পারলেই অভিনয় হলো না। অভিনয় হচ্ছে, চরিত্রটি পড়ে, ভেবে এবং পরিচালকের কাছ থেকে ব্যাখ্যা পেয়ে আপনি চরিত্রটি সম্পর্কে যা বুঝতে পেরেছেন এবং বোঝাতে চাইছেন— দর্শককে সেই বোঝানো অর্থাৎ আপনি যা বুঝেছেন একটি চরিত্রের মাধ্যমে তা বোঝানোই হচ্ছে অভিনয়।

পুনরায় ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন প্রসংগে আসছি। ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন আপনি কি উপায়ে ঘটাবেন? যেভাবে ঘটাবেন সেটাই হচ্ছে অভিনয়ের প্রক্রিয়া এবং বারবার বলছি সেই প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনাকে গভীর অনুসন্ধান এবং অনুশীলন করতে হবে। একটা ঘটনার কথা বলি—ধরুন আপনার বয়েস ৩০ বছর। আপনি সদাগরি অপিসের কনিষ্ঠ কেরাণী—থাকেন দত্তপুকুরের একটা বস্তিতে —লেখাপড়া করার অত্যন্ত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আপনি বি-এ পাশ করতে পারেননি। সংসারে বাবা, মা, দুজন অবিবাহিতা বোন আছেন—তার মধ্যে একজন চাকরী করেন। রাজনীতি করেন না। কোনো রকমে জীবনকে টিকিয়ে রেখেছেন। .এরই মধ্যে অবিরাম সংগ্রাম করার ফাঁকে ফাঁকে নাটক করে চলেছেন। নাটক আপনার পেশা নয়, নেশা। ধরা যাক আপনার নাম রতন। আপনি একটি নাট্যগোষ্ঠীর সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সেই গোষ্ঠীর সাংগঠনিক কাজেও আপনাকে মাঝে মধ্যে অংশ নিতে হয়। আমি যখন বলি অমুক গোষ্ঠীর রতনবাবু। সংগে সংগে আপনাকে চেনেন এমন একজন বলে বসবেন—ও বুঝেছি। 'ও বুঝেছি' ব্যাপারটা কি? ও বুঝেছি ব্যাপারটা হচ্ছে চলমান জীবনে আপনি যেভাবে কথাবার্তা বলেন—আচার-আচরণ করেন—আপনাকে দেখতে—আপনার হাবভাব ইত্যাদি মিলিয়ে রতন নামক চেনা মানুষটির একটি গোটা ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্ব প্রচলিত এবং রোজের দেখা ব্যক্তিত্ব। মনোবিজ্ঞানে এই ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মাথা ঠোকাঠুকির অনেক অবকাশ আছে। আমরা সেই সব পণ্ডিতদের বক্তব্য সম্পর্কে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যাব না। অভিনয়ের সংগে ব্যক্তিত্ব নিয়ে যতটুকু আলোচনার অবকাশ এখানে কেবল সেইটুকুই সংক্ষিপ্তভাবে গ্রহণ করবো। তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো গিয়ে—বাস্তব জীবনে আপনাকে

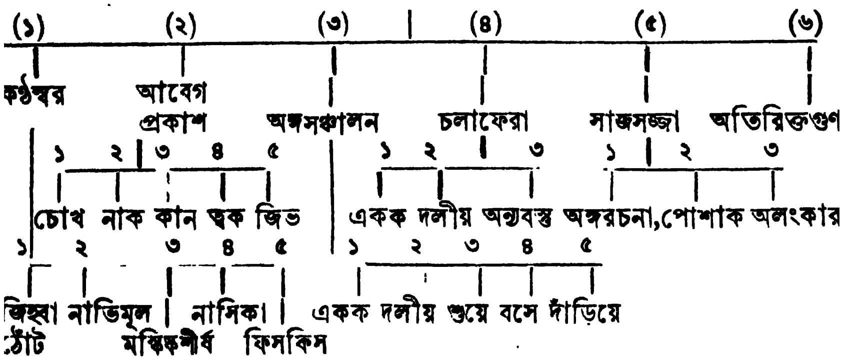
দেখে আপনার সম্পর্কে যে অনুভূতি আমার মনে আছে—আপনার সম্পর্কে আমি এক নিমেষে যে ছবি আমার মনে আঁকতে পারি সেটাই হচ্ছে প্রচলিত জীবনে আপনার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব। এখন রতনবাবুকে বলা হলো, আপনি শাজাহানের অভিনয়ের অংশ নিন। এইবারে আপনি অনুশীলন পর্বে অনুসন্ধান করবেন শাজাহানের ব্যক্তিত্বটি কি হবে এবং লক্ষ্য রাখবেন কোন্ কোন্ বিষয়ে আপনাকে আপনার ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। শাজাহানের চরিত্র রূপ দিতে গেলে—আপনি নিশ্চয়ই ৩০ বছর বয়সে আপনার যে কণ্ঠস্বর তাকে প্রকাশ করতে পারবেন না। আপনার আবেগ, প্রকাশ, আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি অনেক বিষয়ে পরিবর্তন ঘটাতে হবে। নচেৎ শাজাহানের ব্যক্তিত্বে আপনার চলমান জীবনের ব্যক্তিত্বেব প্রভাব রয়ে যাবে। বর্তমান সময়ে সিনেমার তথাকথিত বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়ে যা হামেশাই দেখা যায়। অমুক বড় অভিনেতার চরিত্র চিত্রণের চেয়ে অমুক অভিনেতার অভিনয়কেই যেন বড় করে দেখি। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ছবিতে একঘেয়েমি অভিনয় দেখতে দেখতে চোখ-কান ঝালাপালা হয়ে ওঠার যোগাড।

এখন দেখা যাক—আপনার ব্যক্তি-জীবনের ব্যক্তিত্বকে যখন মঞ্চের ওপর আনবেন অন্য ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে তখন সেই পরিবর্তিত ব্যক্তিত্বের মধ্যে মূল কোন কোন বিষয়ে পরিবর্তন ঘটে? কারণ যে যে বিষয়ে পরিবর্তন ঘটবে সেই সেই বিষয় সম্পর্কে আপনি সজাগ হলে অভিনয় সম্পর্কে অনুশীলনের পথটা আপনি নিজে নিজেই আবিষ্কার করে নিতে পারবেন। এছাড়া অভিনেতা জন্মায়, তাকে কোনো প্রকারে সৃষ্টি করা যায় না। আমি ধরে নেব আপনি অবিদেবতার কারখানা থেকে সহজাত প্রবৃত্তি নিয়েই এই মাটির পৃথিবীতে এসেছেন। এখানে এসে সমাজ, পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে আপনি পূর্ণতা প্রাপ্ত হবেন। কিন্তু সেই পূর্ণতা প্রাপ্তির সঠিক রাস্তাটা কোথায়? ঠিক রাস্তাটা এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি বলেই আজকের এই চিন্তা ভাবনা। সে যাই হোক—অভিনয়টি কিছু নয়, স্টেজে মেরে দেব—ম্যানেজ করে নেব—এসব কথাও ঠিক নয়।

অভিনয় শিল্প—এবং বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্প। অভিনয়ের কলাকৃতি নিয়ে বিশেষ এবং বিশদভাবে আলোচনা হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। সুতরাং আমার ইচ্ছা অভিনয়ের ব্যবহারিক দিক নিয়ে কিছু আলোচনা করি। তবে আমার

আলোচনায় জ্ঞানীগুণীরা কতটা উপকৃত হবেন বলতে পারি না। আমার আলোচনায় নবীনরা উপকৃত হলেই আমি নিজে খুশী। এবারে নিচের ছকটার দিকে একটু চোখ বুলিয়ে নিন।

অভিনয় : ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন



মঞ্চের ওপরে ব্যক্তিজীবনের ব্যক্তিত্বের অন্য এক পরিবর্তিত ব্যক্তিত্ব রূপায়িত করতে হয়। এরজন্যে মঞ্চে উপস্থাপ্য ব্যক্তিত্বের পার্থক্য ধরা পড়ে মূলতঃ ওপরে উল্লিখিত কয়েকটি বিষয়ে। আলাদা ভাবে প্রত্যেকটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে যথা সময়ে।

তত্ত্বের দিক থেকে একটা খুব প্রচলিত কথা আছে—কথা হলো—অনেক সময় বলা হয়ে থাকে—**পৃথিবীর সব শিল্পীই (অভিনেতা) মানুষ, কিন্তু সব মানুষই শিল্পী নয়।** কিন্তু কেন? কোনো গুণের জন্যে শিল্পী মানুষ হওয়া সত্বেও মানুষের সংগে শিল্পীর আপাতদৃষ্টিতে একটা পাঁচিল সৃষ্টি করা হয়। একজন যা বোঝাবেন বাস্তবে হয়তো একজন সাধারণ মানুষ তাকে হুবহু কিংবা তার চেয়ে সার্থকভাবে রূপ দিতে পারেন। কিন্তু সেই সাধারণ মানুষটিকে মঞ্চে তুললে তিনি হয়তো অভিনয় করতে পারেন না। এভাবে বাস্তবে বহু চোর-ছ্যাঁচোড় বাস্তবের রঙ্গমঞ্চে প্রতিনিয়ত রীতিমতো অভিনয় করে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা কি অভিনেতার মর্যাদা পাবেন?—চিটিংবাজী যদি একটা শিল্প হয় তাহলে নিশ্চয়ই তিনি শিল্পীর মর্যাদা পাবেন। কারণ, চিটিংবাজকেও সাধনা করতে হয়—অনুশীলন করে সহজাত প্রতিভাকে প্রকাশ করতে হয়। তফাত হচ্ছে তাঁরা করেন নেহাত জীবন-জীবিকার প্রয়োজনের তাগিদে আর প্রকৃত রঙ্গমঞ্চের শিল্পীরা অভিনয় করেন সৃষ্টির প্রয়োজনে—মানুষের মনে আনন্দ বিতরণের জন্যে। অভিনেতার কাজ-কারবার

মানুষের মন আর বুদ্ধি নিয়ে—সেখানে শিল্পীর একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। শুধু এই কারণেই মানুষের সংগে শিল্পীর পার্থক্য আছে একথা বলা চলে না। একজন শিল্পীর থাকবে দু'টি সাদা চোখ ছাড়া অতিরিক্ত একটি অদৃশ্য তৃতীয় চোখ, এছাড়া দেহের পাঁচটা ইন্দ্রিয় বাদে অদৃশ্য একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। তৃতীয় নেত্র দ্বারা শিল্পী-জগৎ এবং জীবনকে নোতুন এক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন। যেমন সাধারণ একজন মানুষ পূর্ণিমার চাঁদকে চাঁদ দেখে কিন্তু শিল্পী সেই চাঁদকেই হয়তো ঝলসানো রুটি দেখবে। এই যে জগৎ, বস্তু এবং জীবনকে আলাদা একটা দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা এখানেই সাধারণ মানুষের সংগে একজন শিল্পীর পার্থক্য। শুধু দেখাতেই শেষ নয়—দেখার পর নোতুন করে অনুভবের একটা বিষয় আছে—যার জন্যে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। দেখা, শোনা এবং জানা —তার পরে সঠিক প্রয়োগ—এই সঠিক প্রয়োগ এবং প্রকাশের ওপর অভিনয়ের সার্থকতা নির্ভর করে।

তাহলে পর্যায়ক্রমে ব্যাপারটা দাঁড়ালো গিয়ে—অভিনয়-শিল্পে অংশ গ্রহণ করতে গেলে আপনাকে দেখার মতো চোখ—শোনার মতো কান—অনুভব করার মতো মন প্রস্তুত করতে হবে। কারণ অভিনেতার কাছে কোনো বস্তু ফেলে দেবার নয়। সর্ববস্তুকে জানা ও কাছে টানার জন্য সংবেদনশীল একটি মন থাকবে। কেননা, অভিনেতাকে অভিনয়ের যাবতীয় মাল-মশলা সংগ্রহ করতে হবে এই পৃথিবী, এই সমাজ, এই জীবন থেকেই। পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে সজাগ রাখতে হবে। তারপরে অনুশীলন পর্ব—এই অনুশীলন পর্বে কণ্ঠস্বর, আবেগ ও প্রকাশ, অঙ্গ সঞ্চালন, চলাফেরা এবং অঙ্গ রচনা, সাজসজ্জা সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশোনা—অনুশীলন করতে হবে। আর এই অনুশীলন পর্বে চাই চিত্তের একাগ্রতা এবং গভীর অধ্যবসায়—তারপরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা—শেষে আত্ম-প্রকাশ—মঞ্চের ওপর মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য।

কিন্তু অভিনেতা কে হবেন—সে সম্পর্কে এখনো পাকা সিদ্ধান্ত আসেনি। এছাড়া সিদ্ধান্ত দেয়া সম্ভবও নয়—কারণ আজকের সিদ্ধান্ত কাল বদলাতে পারে। তবুও পারম্পরিক একটা সূত্র সামনে রাখা যেতে পারে।

প্রথমত যিনি অভিনয় করবেন তাঁকে সুস্থ শরীর নিয়ে জন্মাতে হবে অর্থাৎ রোগ যুক্ত দেহ বা শারীরিক অচল কাঠামো দিয়ে অভিনয় চলে না —বিশেষক্ষেত্রে হয়তো চলতে পারে, কিন্তু তা নিতান্ত সাময়িক।

দ্বিতীয়ত স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর নিয়ে জন্মাবেন তিনি। তৃতীয়তঃ সুস্থ এবং

ত্রুটিহীন পঞ্চ ইন্দ্রিয় নিয়ে অভিনেতাকে জন্মাতে হবে—একথা আগেই বলেছি কেননা, কোনো বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ, পর্যবেক্ষণ, আবেগ, অঙ্গ-সঞ্চালন ও অভিব্যক্তি এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই ঘটে থাকে।

চতুর্থত অতিরিক্ত একটি নেত্র এবং ইন্দ্রিয় নিয়ে অভিনেতাকে জন্মাতে হবে—যার ফলে শিশির ভাদুড়ী কখনো নরেশ মিত্রের সংগে মিশে এক হয়ে যাবেন না। অহীন্দ্র চৌধুরী এবং দানীবাবু ব্যক্তিজীবনে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তিত্ব হয়েও মঞ্চের ওপর একই চরিত্রে রূপ দিতে গিয়ে দেখা যায় দুটি সম্পূর্ণ পৃথক প্রতিভা মঞ্চে দীপ্যমান। কেউ কারোর চেয়ে কম নয়। এখানে কারোর সংগে কোনো তুলনাও চলে না। কারণ শিল্প সব সময় স্বরূপে স্বতন্ত্র। অহীন্দ্র চৌধুরী মশাইয়ের শাজাহান এক রকম—শিশির ভাদুড়ীর শাজাহান আর এক রকম। কিন্তু শাজাহানের চরিত্র চিত্রণ একই আছে—পার্থক্য শুধু ব্যাখ্যায় এবং চরিত্রের উপস্থাপনা রীতিতে। একই চরিত্রের রূপকার দু'জনে—চরিত্র কিন্তু একটা—আবার অন্যদিক থেকে একই চরিত্রে রূপকার হয়েও প্রতিভা কিন্তু দুইটি এবং একেবারে পৃথক দুইটি সত্তা নিয়ে যেন মঞ্চে উপস্থিত—আর ঠিক এইখানেই অভিনেতার নিজস্বতা।

এরপর জানতে হবে মঞ্চ কি—আপনার সঙ্গে অন্যান্য শিল্পের কতটা সংযোগ আছে—অভিনয়ের রীতি কি, চরিত্রের ব্যাখ্যা কেমন ভাবে করতে হয়—কারিগরী জ্ঞান আপনাকে আয়ত্ব করতে হবে, অর্জন করতে হবে মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, শরীর বিজ্ঞান এবং অন্যান্য শিল্প বিষয়ে সবরকমের জ্ঞান।

মোট কথা অভিনয় যতটা সহজ জিনিস বলে মনে হয় বা মনে করি আসলে অভিনয় সত্যি অতটা সহজ জিনিস বলে মনে হচ্ছে কি? নাটক অনেকটা আগুনের মতো। তাকে নিয়ে ছেলেখেলা করা নৈতিক অপরাধ এবং তাকে নিয়ে শুধু খেলা করলে অভিনয় হয় না—আর এই খেলার জন্যে প্রতিভা এবং কৌশল সম্পর্কে সজাগ না হয়ে শুধু ছেলেখেলা করলে অনেকের পুড়ে মরার সম্ভাবনা আছে। তাই আমার অনুরোধ আর যাই করুন—আগুন নিয়ে ছেলেখেলা করবেন না দয়া করে।

অভিনয় করতে গেলে শিল্পীর নিজস্বতা প্রকাশের যেমন একটা আত্মগত দিক আছে—ঠিক তেমনি আর একটা দিক আছে। তা হলো তার কারিগরি দিক ইংরিজিতে যাকে **craftmanship** বলে। কারিগরি দিকটা পর্যাপ্ত ব্যবহারিক জ্ঞানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। একবার ভেবে দেখুন—জন্ম-

গতসূত্রে অভিনয়-শিল্পী প্রতিভা নিয়ে তবেই এই পৃথিবীতে আসে কিন্তু বাস্তবে চলতে চলতে, বুঝতে বুঝতে, জানতে জানতে—এমন কি পরের জিনিসকে নিজের মধ্যে আপন করে নেওয়ার ওপরে প্রতিভার সার্থক আত্মপ্রকাশ ঘটে। অনুশীলন করবেন—জীবন জগৎকে নোতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখবেন—এই সব দেখাশোনা ও জানার মধ্য দিয়ে আপনার জ্ঞানপ্রকোষ্ঠে সঞ্চিত হবে অমূল্য সব পরম সম্পদ—আর সেই অমূল্য সম্পদ যখন ভেতর থেকে রূপের মাঝে অপরূপ হয়ে প্রকাশ পাবে তখন আপনি হবেন সার্থক অভিনয়-শিল্পী।

এখন অভিনয়-শিল্পীর দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু কথা বলা যাক। অভিনয়-শিল্পীর অনেক দায়িত্ব। যে দায়িত্বগুলো নানা পর্যায়ে বিভক্ত। ব্যক্তিগত দায়িত্ব—সমষ্টিগত দায়িত্ব—শৈল্পিক দায়িত্ব ইত্যাদি অনেক দায়িত্ব। মঞ্চে উঠে একরকম দায়িত্ব—মহলা গৃহে একরকম দায়িত্ব—প্রস্তুতি পর্বে আর একরকম দায়িত্ব—অভিনয় জীবন শুরুর দিন থেকে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত আপনি কত যে অসংখ্য দায়িত্ব পালন করেন সেই নিয়েই তো একটা বিরাট বই হতে পারে।

অভিনয়-শিল্পীর দায়িত্ব নিয়ে যখন আলোচনায় বসবো তখন একথা ভাবলে চলবে না যে দায়িত্বগুলি ব্যবহারিক জ্ঞানের বিপরীতমুখী কোনো জিনিস।

আমরা কতজন সমস্ত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন শিল্পী? তা হলে মঞ্চে উঠে এত লম্ফঝম্ফ হয় কেন—কেনই বা চেঁচামেচি—দলাদলি আর মনভাঙাভাঙি। দায়িত্ব সচেতন শিল্পীরা নিশ্চয়ই সার্থকতার দিকে এগিয়ে যাবেন এটাই ঠিক। আবার দায়িত্ব সম্পর্কে নিষ্ঠাবান একজন একটি দলে থাকলে অপেক্ষাকৃত কম দায়িত্ব সচেতন শিল্পীরা কাজ করতে এসে ঝগড়া পাকাবেন—নয়তো হাতাহাতি করবেন। কাজেই আনাড়ি মানুষ বা দায়িত্বহীনদের জন্য রঙ্গমঞ্চ নয়।

কিন্তু দায়িত্বগুলি কেমন?

প্রথমত শিল্পীর নিজের প্রতি নিজের দায়িত্ব
দ্বিতীয়ত শিল্পীর অন্য শিল্পীর প্রতি দায়িত্ব
তৃতীয়ত শিল্পীর নাট্যকারের প্রতি দায়িত্ব
চতুর্থত পরিচালকের প্রতি দায়িত্ব
পঞ্চমত শিল্পীর নেপথ্য শিল্পীর প্রতি দায়িত্ব

ষষ্ঠত শিল্পীর দলগতস্বার্থের প্রতি দায়িত্ব

সপ্তমত শিল্পীর দর্শকদের প্রতি দায়িত্ব

অষ্টমত শিল্পীর সমাজের প্রতি দায়িত্ব

দায়িত্ব ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত বলে এবিষয়ে 'দায়িত্ব' ও 'কর্তব্য' শব্দ দু'টি আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করে আলোচনার ওপর আর অতিরিক্ত ওজন চাপাতে চাই না।

এদেশে অধিকাংশ অভিনয়-শিল্পী একটু জেনে অনেক বেশী কথা বলতে চায়। ফলে সৃষ্টির চেয়ে তার্কিক হবার দিকে ঝোঁকটা অনেকের মধ্যে পরিমাণে যেন কিঞ্চিৎ বেশী। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে নাট্যশিক্ষার যে মূল ফারাক আছে আমরা সেইটুকু উপলব্ধি করতে পারি না বলে অন্যান্য জ্ঞান আর শিক্ষার সঙ্গে নাট্য-শিক্ষার সম্পর্কটা গুলিয়ে ফেলি। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার জন্যে আমি যা জানি তার চেয়ে বেশী জানা, পড়াশোনা করা কোনো মানুষের সান্নিধ্যে এলেই চলে—কিন্তু নাট্যশিক্ষায় ঠিক তেমনটি চলে না। এই শিক্ষার কোনো বাছ-বিচার নেই। অল্প জ্ঞানীর কাছে যেমন শিক্ষা পাওয়া যায়—আবার জ্ঞানীর কাছেও শিক্ষা নেওয়া যায়—অনেক দিক থেকে অনেক রকমের। অভিনয়-শিল্পীর পক্ষে জগতের সব কিছুই সুন্দর, যেমন ডাস্টবিন, খাটাপায়খানা তেমনি আবার রাজপ্রাসাদ। যেমন হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায় যে শিশুটি তেমন আবার জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়ানো পককেশ বৃদ্ধটি পর্যন্ত। অভিনয়-শিল্পীকে সবটাই সহানুভূতির সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়। অভিনয় শিক্ষার পরীক্ষা খাতায় লিখে হয় না—পরীক্ষক নেপথ্যে থাকে না—একজনও নয়। এখানে পরীক্ষক হাজার হাজার দর্শক—হাজার হাজার দর্শক আবার হাজার হাজার মনের মানুষ।

তা হলে অভিনয়-শিল্পী শিক্ষা নেবেন কোথায়? জীবনে—জগতে—বাস্তবে—স্বপ্নে—হাটে-ঘাটে-বাজারে—অধ্যয়নে—ভাব বিনিময়ে—এক কথায় কোথাও নয়। তা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান? তার কি কোনো প্রয়োজন নেই? আছে বৈকি। প্রতিভাকে সংযত করার জন্যে—অভিজ্ঞ মানুষদের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের জন্যে—অনেক দিনের সাধনালব্ধ জ্ঞানকে অল্প দিনের মধ্যে জানার জন্যে—অনুশীলন করার সূত্র পাওয়ার জন্যে—এস্‌থেটিক সেনস্‌কে জাগাবার জন্যে নাট্য-শিক্ষানিকেতনের প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই। আর কেউ না মানলেও আমি মানি—মানি ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে। অভিনয় জীবনে আমার খ্যাতি নেই—বিড়ম্বনাও নেই—আমি প্রচলিত নামীদামী শিল্পী নই। কিন্তু

আমি অভিনয় করি—খুব কম। তবে আমার জীবনের শুরু কিন্তু নাট্যশিক্ষা গ্রহণ করে—শিক্ষা ছাড়া নয়।

পশ্চিমের প্রায় সব দেশে—এদেশের সব জায়গায় ঘুরে নাটক দেখেছি—পৃথিবীখ্যাত মানুষের সান্নিধ্যে এসেছি। এসব সম্ভব হয়েছে নিয়মমাফিক ট্রেনিং আর কাজের মধ্য দিয়ে। গতানুগতিকতাকে মানি না বলেই মঞ্চে নিয়মিত অভিনয়ের আমন্ত্রণ পেয়েও তা উপেক্ষা করেছি। নিজের কাছে সান্ত্বনা—পয়সার মোহ আমাকে এখনো পর্যন্ত বিভ্রান্ত করতে পারেনি। আর পারেনি বলেই আজ আপনাকে নিয়ে, আপনাদের কাছে কিছু আলোচনায় বসার সুযোগ পেয়েছি। আমার এই সুযোগ—আর্থিক দুর্যোগে ফেললেও—আমি কিন্তু নাট্যভাবনা নিয়ে আমার নিজের জগতে খুবই খুশী। খুশী কারণ—হাজার হাজার দর্শক আর হাততালি থেকে মুক্তি পেয়ে আমি আপনাদের কাছাকাছি থাকতে পারি বলে।

যাক সে সব কথা। এবারে অভিনয়-শিল্পীর দায়িত্বের কথায় আসা যাক। না মশাই—আমি যে দায়িত্বের কথা ছক বেঁধে সাজাবো তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো বইয়ে পাবেন না। কারণ—বিশ্বের বাজারে আজকের এ পর্যন্ত ইংরিজি ভাষায় প্রকাশিত (অভিনয়-শিল্পের ওপর) প্রায় সব কটি বই আমার দেখা আছে। দায়িত্ব বিভাজন করতে চাই একটা মৌল ধারণা নিয়ে—যাতে করে আমাদের দেশের অসংখ্য অবহেলিত শিল্পীরা অন্ততঃ খানিকটা চিন্তা করার অবকাশ পায় এবং অভিনয় করার আগে, হুট করে কিছু করার আগে একটু ভাবনা চিন্তা করতে পারেন।

একথা আগেই মনে রাখলে ভালো হয় যে—মানুষের পৃথিবীর বাইরের কোনো বস্তু নিয়ে অভিনয়-শিল্পীর কাজ নয়। কাজেই যা কিছু মালমশলা তা এই বস্তু-জগতকে নিয়েই।

১। অভিনয় জীবনের প্রস্তুতিপর্বে শিল্পীর নিজের প্রতি দায়িত্ব

১। নিয়মিত শিক্ষাগ্রহণ

২। নিয়মিত অনুশীলন

৩। সৃষ্টি সচেতন মনকে তৈরি করা

৪। জগতের সকলবস্তু ও ব্যক্তির প্রতি সহমর্মিতা

৫। সমস্ত রকমের বিষয়ে পাঠ্যাভ্যাস

৬। লোকচরিত্র সম্পর্কে অন্বেষণ ও জ্ঞানার্জন

৭। নিজস্ব অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ

৮। নিজস্ব বোধশক্তি জাগ্রত করার মতো ক্ষমতা আয়ত্ব করা

৯। নিয়ম-নিষ্ঠা-ধৈর্য-অধ্যবসায়

১০। সৌন্দর্যচেতনা বাড়ানো

১১। বস্তু বা ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি নিয়ে গভীর অন্বেষণ এবং সচেতনভাবে তাকে লিপিবদ্ধ করে রাখা

১২। যে-কোন বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা আয়ত্ত করা। একমাত্র প্রতিভা থাকলেই তা সম্ভব

১৩। কথা বলার চেয়ে কথা শোনা, দেখানোর চেয়ে বেশী দেখা, জটিল জিনিসকে জটিলতর করার চেয়ে সহজভাবে আত্মস্থ করা

১৪। জগত ও জীবনকে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখা এবং উপলব্ধি করা।

১৫। গভীর মনোযোগ

১৬। কল্পনা শক্তির সম্প্রসারণ ঘটানো

১৭। হৃদয়বৃত্তি আর চিত্তবৃত্তির সম্মেলন (Balance) ঘটানো

১৮। অভিনয় শেখার নিজস্ব শক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়া

১৯। অভিনয় শিক্ষা গ্রহণে ভক্তি ও বিনম্রভাব

২০। কল্পনা শক্তির সম্প্রসারণ

২১। অহংবোধ নয়—আত্মপ্রত্যয় সম্পর্কে অভিজ্ঞান

২২। হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতিবাদের চেয়ে নিজস্ব প্রযুক্তির আড়ালে নিজের সক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে সচেষ্ট হওয়া

২৩। সমাজনীতি, রাজনীতি, চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি সর্বশাস্ত্রে জ্ঞান

২৪। নিয়মিত অভিনয় দেখা

২। সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্য শিল্পীর প্রতি একজন অভিনয়-শিল্পীর দায়িত্ব

১। অন্য শিল্পীকে জানা—দেহ, মন, মস্তিষ্ক অর্থাৎ গোটা মানুষটিকে জানা

২। শিল্পকর্ম বা প্রতিভা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা

৩। অন্য শিল্পীর সঙ্গে কাজ করার জন্যে তাকে আপন করে নেয়ার প্রক্রিয়া জানা

৪। ভাব-বিনিময়

৫। কাজের মধ্য দিয়ে সংবিদ রচনা

৬। কাজে ভুল হলে নিজস্ব সহনশীল ক্ষমতা দিয়ে—বিনম্রভাবে তাকে বুঝিয়ে ভুল শুধরে দেওয়া (অবিশ্যি অবুঝকে বোঝানো যায় না—তবুও চেষ্টা করা)

৭। নিজের সম্পর্কে অন্য শিল্পীকে বুঝতে দেওয়া

৮। মতান্তর না ঘটানো—মতান্তর ঘটলে যুক্তি দিয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করা

৯। উভয় ক্ষেত্রে সৃষ্টি সম্পর্কে অগ্রিম সচেতন হওয়া এবং সৃষ্টির আনন্দ উপলব্ধি করা

১০। কি করতে যাচ্ছি সে সম্পর্কে একমত হয়ে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা

১১। কার কতোটুকু কাজ সে সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করা

৩। নাট্যকারের প্রতি একজন অভিনয়-শিল্পীর দায়িত্ব

১। নাটকটি ভালোভাবে পড়া

২। নাট্যকারকে জানা

৩। প্রতিপাদ্য বিষয় জানা এবং নাট্যকার কোন্ সত্যে উপনীত হতে চেয়েছেন তা জানা

৪। চরিত্র উপলব্ধি করা

৫। একটি চরিত্রের সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রের সম্পর্ক সম্পর্কে অবহিত হওয়া

৬। শিল্পী যে চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন—তার ডাইমেনশন কি অর্থাৎ স্বরূপ এবং প্রকাশভঙ্গি কি হবে সে সম্পর্কে উপলব্ধি করা

৭। নাট্যকারের বক্তব্যের প্রতি কর্তব্য রক্ষায় নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া

৮। নিজের চরিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য চরিত্রের সংলাপ মনে রাখা—ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সজাগ হওয়া

৯। নাট্যকারের নাটকের মধ্যে জীবনদর্শন সম্পর্কে উপলব্ধি করা ও প্রয়োগ সচেতন হওয়া

৪। পরিচালকের প্রতি অভিনয়-শিল্পীর দায়িত্ব

১। পরিচালক এবং অভিনেতা দু'জনেই স্রষ্টা। কাজেই পরিচালকের সৃষ্টির প্রতি বিশ্বাসভাজন হওয়া

২। পরিচালকের ব্যাখ্যাকে অনুধাবন করা

৩। মতান্তর দেখা দিলে বিষয়টি সম্পর্কে সরাসরি জানা—আর এই জানার জন্যে উত্তেজনা নয়—সংবেদনশীল মনের প্রকাশ যেন হয়

৪। পরিচালকের কাজের প্রতি আস্থা রেখে পরিচালকের নির্দেশ মানা

৫। পরিচালক চরিত্রচিত্রন নাট্যউপস্থাপনা সম্পর্কে কি বোঝাতে চাইছেন তা ধৈর্য ধরে বুঝে নেয়া

৬। অনেক সময় মতের অমিল হলে বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে সহনশীলতার সঙ্গে তা মেনে নেয়া

৭। উগ্র মেজাজ বা উচ্চশিক্ষার আস্ফালন সর্বদাই পরিত্যজ্য

৮। আগে না ভেবে—ভাবলেও—তা না প্রকাশ করে সহানুভূতির সঙ্গে পরিচালকের বক্তব্য অনুধাবন করা

৯। পরিচালক, নিয়মশৃঙ্খলা সম্পর্কে যে নীতি নির্ধারণ করবেন তাকে মেনে চলা

১০। পরিচালকের বক্তব্য বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে নিজের কিছু বক্তব্য বা ব্যাখ্যা থাকলে তা ধীর চিত্তে এবং সহজ ভাষায় পরিচালকের সামনে তুলে ধরা

১১। অপমান করার স্পর্ধা থেকে নিজের নৈতিক মান উন্নয়ন করা

১২। পরিচালক মঞ্চে যা দৃশ্যমান ছবি সৃষ্টি করতে চাইবেন তাতে সহযোগিতা করা

৫। নেপথ্য-শিল্পীর প্রতি অভিনয়-শিল্পীর দায়িত্ব

১। যদিও গোটা প্রযোজনাই পরিচালকের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে—তবুও নেপথ্য-শিল্পী—যেমন মেকআপ ম্যান—আলোকশিল্পী ইত্যাদির সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ঘটলে—পরিচালকের প্ল্যানিং-এর সঙ্গে নেপথ্য-শিল্পীদের কতখানি সাযুজ্য রক্ষা হচ্ছে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া

২। পরিচালক গোটা বিষয়টা মাথায় রাখেন বলে পরিচালককে সহযোগিতা করার জন্যে নেপথ্য-শিল্পীদের ক্রিয়াকর্মের প্রতি গভীর দৃষ্টি রেখে শিল্পকর্ম যাতে সার্থক হয় তার জন্যে পরিচালককে সহযোগিতা করা

৩। ঔচিত্যবোধ আর শালীনতা রক্ষার মাধ্যমেই সর্ব শিল্পের সমন্বয়ে নাট্য

শিল্প বাস্তবায়িত হবে। কাজেই সহনশীলতা এবং সহমর্মিতা রক্ষা করা একজন শিল্পীর অন্যতম দায়িত্ব

৪। উৎকট মেজাজ আর স্বভাবের নেপথ্য-শিল্পী সম্পর্কে সজাগ হওয়া যদি বিপরীতমুখী কোনো কার্যকলাপ ঘটে তখন গভীর মনীষার সঙ্গে বিষয়টা উপলব্ধি করে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করা

৬। দলগত স্বার্থের প্রতি অভিনয়-শিল্পীর দায়িত্ব

১। একটি দলে ভিন্ন মানুষ—ভিন্ন মনের—কাজেই সবাইকে নিজের কাছে এনে সকলের চারিত্রিক—মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে জানা

২। দলগত নীতি ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া

৩। হুজুগে না মেতে দলের প্রধান এবং আদর্শের প্রতি আস্থা রাখা

৪। ভুল বোঝাবুঝি হলে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে একটা সুচিন্তিত মীমাংসায় আসা

৫। দলের স্বার্থই শিল্পের স্বার্থ—দলের আদর্শই শিল্পীর আদর্শ—কাজেই দলের কেউ অবুঝ হলে দলনেতার ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে তার কোনো মানে নেই। আপনি যেহেতু ঐ দলের একজন সতীর্থ এবং শিল্পী, কাজেই কেউ হঠকারিতা করলে তাকে কাছে টেনে দলের আদর্শ এবং স্বার্থের কথা বোঝানোই হবে আপনার অন্যতম দায়িত্ব

৬। দু'একরাত্রি অভিনয় করে বা একটু প্রশংসা পেয়ে দলত্যাগ করার মোহ ত্যাগ করাও আপনার দায়িত্ব। তার মানে এই নয় যে আপনি অন্য দলে অভিনয় করবেন না—আপনার দল... হারিয়ে দিয়ে অন্য দলে নয়—আপনার দলকে জেদের বশে হোক—মোহের বশে হোক—ত্যাগ করে কোনো উপদল সৃষ্টি নয়

৭। এটাও তো ঠিক—দল বড় হলে আপনিও বড় হবেন। আপনি নিজে বড় হবার জন্যে দল নয়। আর সেই চেষ্টায় প্রমত্ত হলে এতদিন যা চলছিল—যা চলে আসছে—তাই হবে

৭। দর্শকের প্রতি অভিনয়-শিল্পীর দায়িত্ব

১। ভালোভাবে ভালো কিছু শোনানো

২। ভালো কিছু দেখানো

৩। ভালো কিছু ভাবানো

৪। ভালোভাবে আপনার অভিলষিত অভিনয় প্রতিভাবকে নোতুন করে ব্যাখ্যা করা।

৫। নাট্যকার যা দিয়েছেন—পরিচালক যা ব্যাখ্যা করেছেন তা বুঝে নিয়ে দর্শককে সেই বোঝা সম্পর্কে বোঝানো।

৬। অতিরঞ্জন কিছু নয়—বাস্তবসম্মত করে নিজেকে ব্যক্ত করা।

৭। যা করছেন তা বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতিভাত করা।

৮। প্যাচপোচ বা ল্যাঙমারা থেকে বিরত হয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং শ্রুতি-গ্রাহ্য করে নাটকের বক্তব্যকে সামনে রেখে নিজের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটিয়ে দর্শককে অনির্বচনীয় আনন্দ দান করা।

৯। দর্শকবৃন্দকে একটি নির্দিষ্ট সত্যে—একটি নির্দিষ্ট এবং সুচিন্তিত চিন্তার জগতে আনার জন্যে নিজেকে একটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে সুচারুভাবে ব্যক্ত করা।

১০। দলগত স্বার্থের মধ্যে থেকে নিজের প্রতিভাকে পরিব্যক্ত করা—এবং সত্য-সুন্দর-শিবের আরাধনার মধ্য দিয়ে দর্শককে একটি অকল্পনীয় আনন্দের জগতে উপনীত করা।

১১। অন্তর্মুখীন উপলব্ধিকে বাস্তবায়িত করা—একটি চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে

৮। সমাজের প্রতি একজন অভিনয়-শিল্পীর দায়িত্ব

১। নোতুন শিল্প সৃষ্টির ভূমিকা গ্রহণ

২। দর্শককে সমাজ-সচেতন করা (পরিচালকের ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করে)

৩। নোতুন ভাবনা আনয়ণ

৪। সমাজ-সচেতন জীবননির্ভর নাটক হলে—চরিত্রের গুণগত বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে সমাজনীতি এবং ত্রুটি বিশ্লেষণ করা।

৫। জাতীয় গৌরব বা ঐতিহ্য বা মূল্যবোধের অবক্ষয় সম্পর্কে সচেতনভাবে দর্শককে অবহিত করা।

৬। সংস্কৃতির বিকাশ বা বিপ্লব ছাড়া সামাজিক দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন হওয়া কতখানি সম্ভব তা আমার জানা নেই। ধ্বংস নয়—নোতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার ইংগিতবাহী রূপারোপ শিল্পীরাই করেন। সে

ক্ষেত্রে একজন শিল্পীর দায়িত্ব বা ভূমিকা শুধু শিল্পীর মতো নয়—
সৈনিকের চেয়েও বড়

দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে অনেক বুলি আওড়ানো হলো—জানি না এতে কার কতোটুকু কাজে লাগবে।

এখন মঞ্চে অভিনয় সম্পর্কে অর্থাৎ মঞ্চে উঠে একজন শিল্পীর দায়িত্ব বা কাজ কি হওয়া উচিৎ তার সম্পর্কে একটা ছক এঁকে এ পর্যায়ের আলোচনা থেকে সরে যাব।

মঞ্চে অভিনয়-শিল্পীর কাজ

|

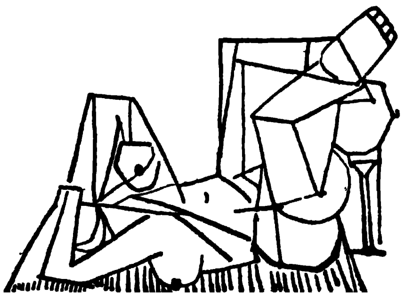
যুক্তিগ্রাহ্য ও বিশ্বাসযোগ্য একটি চরিত্রের প্রয়োগ

সংলাপ	চরিত্রচিত্রণ	কার্যাবলী (Action)	ব্যঞ্জনা	নোতুন সৃষ্টি

কার্যাবলী (Action):

নিজে	আনুসঙ্গিক বস্তুসহযোগে	দলীয়তা রক্ষা করে

এক্ষণে আমার কোনো কাজ নেই। আপনাদের ভাবনা। যদি ভাবনা সহজে শেষ হয়—বা আরো ভাবতে চান তা হলে আসুন আরো একটু এগিয়ে যাওয়া যাক।



COPY FROM THE PAINTINGS OF PICASSO

অভিনয়-শিল্পের জটিলতা: আংকিক হিসাব ৫

নাট্যশিক্ষার বিস্তার না হয়েই এদেশে নাটকের বিস্তৃতিলাভ ঘটেছে। বিশেষ করে ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর—সামাজিক চাহিদা সম্পূরণের জন্য। আজ নাট্যশিল্পের উন্নয়ণ নিয়ে ভাবতে যতটা সহজ বলে মনে হয় আসলে ব্যাপারটা ততটা সহজ হলে নাট্যশিল্প এভাবে দুযুগ পর মুখ থুবড়ে পড়তো না। মোদ্দা কথা—গোড়ায় গলদ। নাটক সখের জিনিস—অবসর বিনোদনের একটা প্রকৃষ্টপন্থা হিসেবে ভাবতে গিয়ে কাজ শুরু হলো—তারপর দেখা দিলো জটিলতা। প্রথমে যেটা ছিল সখ—আজ সেটা শিক্ষা। যে শিক্ষা নিয়মহীন কোনো জিনিস নয়—সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক। আমরা কূপমণ্ডূকতায় বিশ্বাসী—তাই দৃষ্টিভঙ্গিকে সুদূর প্রসারিত করতে পারি না। আজকে এই মুহূর্তে পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে নাটক নিয়ে কতোটা কি হচ্ছে সে বিষয়ে কিছুটা ধারণা করতে পারলে এদেশে চেকভ, রবীন্দ্রনাথ, ব্রেশ্‌টেই শেষ হতো না। আরো নোতুন ভাবনা-চিন্তা আসতো। একথাতো ঠিক—একটা দেশের রাজনৈতিক প্রতিবেশের কার্যকলাপ না মানতে পেরে সেই দেশের সামগ্রিক অস্তিত্বকে ঘৃণা করার প্রশ্রয় পাই। এমনকি এই রকম কথাও বলি—অমুক লোক তো অমুক দেশের মানুষ—ব্যাটা বুর্জুয়া। কিন্তু একটি জাতির একটি দেশের একটি ব্যক্তিত্ব কি দলীয় বা দেশজ রাজনীতির উর্ধ্বে মানবিক স্বার্থে কিছু বলতে বা করতে পারেন না? শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো স্থান কাল-পাত্র বা ভৌগোলিক সীমারেখা আছে নাকি? একটা দেশে—একটা সামাজিক

পরিবেশে একজন ব্যক্তিত্ব জন্মায় বলে তাকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করে নিজের ঢাক নিজে পিটিয়ে পাণ্ডিত্য জাহির করতে হবে এর কি মানে আছে। শিল্প সাধনা করতে গেলে মানবিক স্বার্থে—যিনি বৃহত্তম স্বার্থের কথা—দেশকালের উর্ধ্বে কিছু বলেছেন তাকেই আমরা পরম বন্ধু হিসেবে মেনে নেব।

দেশজনীতি নির্ধারিত হয় রাজনীতি কর্মীদের দিয়েই—কিন্তু প্রকৃত শিল্পী কোনো রাজনীতির শিকার হন না। তাই ঘৃণা নয়—বিদ্বেষ নয়—যাঁরা শিল্প সম্পর্কে—থিয়েটার সম্পর্কে—নাট্যশিক্ষা সম্পর্কে কাজের কথা বলেছেন আমরা সবাইকেই অভিনয়-শিল্পের আসরে আমন্ত্রণ জানাবো। শিল্পী রাজনীতিবিদ নয়—কিন্তু শিল্পী রাজনীতি সচেতন।

কথা প্রসংগে অনেক কথাই আসবে—কারণ এ-বিষয় নিয়ে খুব একটা বিশেষ আলোচনা—বিশেষ করে থিয়েটারের স্বার্থে কোনো বিশেষ আলোচনা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। এবারে আংগিক হিসাব অর্থাৎ বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় আসা যায় কি না সেই চেষ্টা করা যাক।

যাঁরা অভিনয়-জগতে অতি পণ্ডিত হয়ে পড়েছেন তাঁরা একটু তফাতে থাকুন—কারণ জটিলতা দেখতে গিয়ে এতোদিনের সহজলভ্য বস্তু সম্বন্ধে তাঁদের অনীহা আসতে পারে। যাঁরা প্রকৃত অনুসন্ধিৎসু তাঁরা যে দয়া করে আমাকে বাতিল করবেন না এ বিশ্বাস আমি রাখতে পারি।

মূলতঃ বর্তমান আলোচনা—যাঁরা গোড়া থেকে শুরু করতে চান তাঁদের জন্যেই। যাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাঁদের জন্য নয়।

শিল্প কত রকমের? দু'রকমের। ১। কারু শিল্প ২। চারু শিল্প।

কারু শিল্পের সঙ্গে মানুষের প্রয়োজন অন্তর্হিত আছে। যেমন—বাড়ী, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি। এগুলি প্রকৃতি থেকে নেয়া বস্তুর সমন্বয়ে সৃষ্টি হলেও মানুষ জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে ব্যবহার করে এবং তা করে সৌন্দর্য্য বজায় রেখে। কিন্তু চারু শিল্প মানুষের ব্যবহারিক জীবনের কোনো চাহিদা বা প্রয়োজন মেটায় না। কারু শিল্পকে আর্ট বলা হয় আর চারু শিল্পকে ফাইন আর্ট বলা হয়। নাট্যশিল্প চারু শিল্পের অন্তর্গত একটি শিল্প। কারণ জীবনের সরাসরি চাহিদা পূরণের চেয়ে শৈল্পিক আনন্দ দানই এই শিল্পের উদ্দেশ্য। কিন্তু নাট্যশিল্প কি শুধুমাত্র চারু শিল্পের অন্তর্গত একটি শিল্প? এ-বিষয়ে আরো ভাবনা চিন্তা হওয়া প্রয়োজন। সে কাজ আমার নয়। পণ্ডিতদের-গবেষকদের এবং আগামী দিনের নিষ্ঠাবান শিল্পীদের।

সাহিত্যও শিল্প। চিত্রকলাও শিল্প। নাটকও শিল্প। কিন্তু তফাৎ কোন্খানে? তফাৎ হচ্ছে প্রতিটি শিল্পের ক্ষেত্রে নিজস্বতা প্রকাশের মাধ্যমে।

১। সাহিত্যের মাধ্যম (medium)=ভাষা

২। চিত্রকলার মাধ্যম=রঙ, তুলি, কাগজ ইত্যাদি

৩। নাটক যখন সাহিত্য থাকে তখন তার মাধ্যম=ভাষা

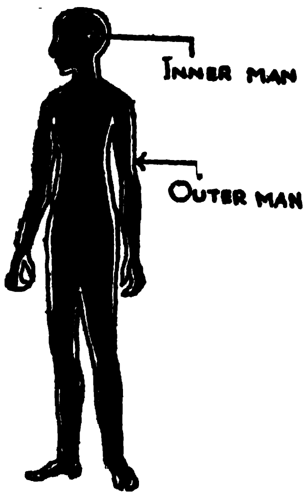
কিন্তু অভিনয়-শিল্প?

৪। অভিনয়-শিল্পের মাধ্যম হচ্ছে শিল্পী নিজে অর্থাৎ তার শরীর বা দেহ।

বিঃ দ্রঃ এখানে বলে রাখা ভালো, চূড়ান্ত অভিনয়ের সময় শিল্পীর 'দেহ' মিডিয়াম হলেও অন্যান্য শিল্পকে এবং শিল্প মাধ্যমকে উপেক্ষা করা যাবে না।

এবার শরীর বা দেহ নিয়ে একটু অংক কষা যাক। অংক করার ইচ্ছে এই কারণে এই শিল্পের জটিলতা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা দেয়া এবং কতোদিন বা দিনে কতো ঘণ্টা অনুশীলন করলে সার্থক অভিনয়-শিল্পী হওয়া যায় তার সম্পর্কে একটা সুচিন্তিত সূত্র নির্ণয় করা। তাহলে প্রথমে আমার পরিকল্পিত ছবিটার দিকে একটু লক্ষ্য করুন। তারপর একে একে সংখ্যাগুলো তুলে ধরবো।

একটা গোটা মানুষ—যা সম্পূর্ণ পরিকল্পিত কিন্তু বাস্তবসম্মত। ছবিটা দেখুন।

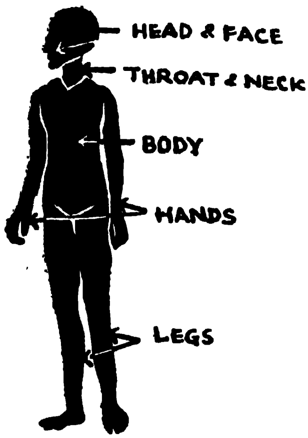


মস্তিষ্ক বা অনুভূতিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অথচ—দেহের প্রত্যক্ষ

আচার-আচরণে এই দুইয়ের সক্রিয় ভূমিকা আছে। কি শিল্পী বা কি জীবন—সব ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক এবং অনুভূতির সমতা (Balance) না থাকলে প্রকৃত মানুষ এবং শিল্পী হিসেবে প্রতিবাচ্য হওয়া খুবই কঠিন কাজ।

১। তাহলে ভেতরের মানুষের মোট সংখ্যা বা Point হলো=২

২। এবারে বাইরের মানুষকে অভিনয়-শিল্পে উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে হিসেবটা বিবেচনা করে এবং অনুশীলন করার সুবিধার জন্যে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যাক। বাইরের অংশটি মোট পাঁচ ভাগে ভাগ করা হলো। নিচের ছবিটা লক্ষ্য করুন।



এখন দেহের ভেতর-বাইরের মোট সংখ্যা দাঁড়ালো ৫+২=৭

এবারে শুধু হাতকে তিনভাগে ভাগ করা হয়।

হাত

বাহু	হাত	আঙ্গুলসহ হাতের পাতা বা তালু

পা-কেও তিনভাগে ভাগ করা হয়।

পা

থাই বা উরু	পা	আঙ্গুলসহপাতা বা চেটো

এখানে আমরা অতিরিক্ত চার সংখ্যা বা Point পেলুম। তাহলে মোট সংখ্যা এ পর্যন্ত দাঁড়ালো ৭+৪=১১

এখন মুখের অভিব্যক্তি সম্পর্কে বলা যায়—যা গোটা দেহের

অভিব্যক্তির সঙ্গে সমতা, সৌন্দর্য্য এবং ছন্দ বজায় রাখবে, তার সংখ্যা মোট ৫১টি (স্থায়ীভাব = ৮ + সঞ্চারীভাব=৩৩ + সাত্ত্বিকভাব=৮+অতিরিক্ত স্থায়ীভাব=২)

যা প্রত্যক্ষদৃষ্ট দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার বিভাজন হচ্ছে ৫ আর দেহের অন্তরালের সংখ্যা ২ যা আবেগ বা অভিব্যক্তি প্রকাশের সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। অভিনয়ে শিল্পীকে দেহের আচরণ তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে অভিব্যক্তি প্রয়োগের জন্যে অনুশীলন করতে হবে—

৫+৪=৯×৫১=৪৫৯

ব্যবহারিক দিকে অনুশীলনের ধাপ হচ্ছে কম করে ৪৫৯ সংখ্যা।

এতক্ষণ দৃশ্যমান অর্থাৎ Visual দিক গেল। এখন শ্রবণীয় অর্থাৎ Audio প্রসংগ।

কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন=৫১ রকমের। কারণ যতরকমের ভাব তত রকমের পরিবর্তন দেহে-কণ্ঠে এবং মুখের অভিব্যক্তিতে। আমি চোখ, নাক, মুখ ইত্যাদির expression-এর কথা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র Total Face অর্থাৎ গোটা মুখের অভিব্যক্তিকে এক করলুম।

এখন সামগ্রিক সংখ্যা দাঁড়ালো ৪৫৯+৫১=৫১০

এরপর বেশভূষা, অঙ্গরচনা, অলংকরণ ধরলে আরো জটিল হবে। তবে যদিও চরিত্র একটি তথাপি বিভিন্ন দৃশ্যে চরিত্রের রূপ, সাজসজ্জাও বদলাবে। সুতরাং সেই বদলের সংখ্যা নিম্নতম ১০ আর সবচেয়ে বেশী হলে ৫১ বেশী নয়। এখন সমস্যা হলো কোন্ সংখ্যাকে ব্যবহারিক দিক থেকে বিবেচনা করবো—১০ না ৫১? আমার মনে হয় শিক্ষার শুরুতে ৫১ ধরাই ভালো। তাতে আবেগ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বেশভূষা এবং অঙ্গ রচনার কতোটা হেরফের হতে পারে তার সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

এখন মোট সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৫১০+৫১=৫৬১। তবে চরিত্রের বেশভূষা এবং দৃশ্যসজ্জার অদল বদল না হলে এই সংখ্যা ৫১০+১০=৫২০-এ দাঁড় করানো যেতে পারে। শিশিক্ষু ব্যক্তিগণ এই সংখ্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারবেন আসল সংখ্যাটি কতো হলে সুবিধা হয়।

আমি জটিলতাকে ভুলে ধরার জন্যে ৫৬১ Points বা সংখ্যাকেই ধরে নিলুম।

এতোক্ষণ যা হিসেব হলো তা হচ্ছে একটি চরিত্রের একটি বয়েসকে

নির্ধারিত করে। কিন্তু ২৪ বছরের যুবক আর ৫৫ বছরেব বৃদ্ধ এক নয়। কাজেই বয়েস সম্পর্কে মোটামুটি একটা যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে আসা যাক। ২০ বছর থেকে ২৫ বছরকে অনায়াসে বোঝা যায়। কিন্তু ২৫ বছরের পর ব্যক্তিত্বের ওপর অনেক অদল বদল হয়। কাজেই বয়সের ভিন্নতার দিকে তাকিয়ে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের হিসেব সম্পর্কে একটা মোটামুটি ছক তৈরি করা যাক।

১। ১৮—২৫ বছর　　৪। ৪৬—৫৫
২। ২৬—৩৫　　৫। ৫৬—৬৫
৩। ৩৬—৪৫　　৬। ৬৬—৭৫
৭। ৭৬—৮৫
৮। ৮৬?—ব্যস আর নয়। কিন্তু যদি ১০০বছরের একজন নাটকের চরিত্র হয়? তা হলে আর একটা Point বাড়ানো যাবে।

এখন ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের মোট সংখ্যা দাঁড়ালো: ৬৬১ × ৯ = ৫৯৪৯

আংকিক বিচারে মোট সংখ্যা দাঁড়ালো গিয়ে—৫৯৪৯ অর্থাৎ ৫৯৪৯ রকমের অভ্যাস সম্পর্কে সচেতন না হয়ে শিল্পী মঞ্চে এসে দাঁড়ালে নিজে ফাঁকি পড়বেন এবং দর্শকদের ফাঁকি দেবেন।

এর পরেও আছে বিভিন্ন টেকনিক্যাল দিক। যেমন মঞ্চ সচেনতা, আলোক সম্পাত, নেপথ্যে সংগীত বা শব্দ প্রয়োগ, দৃশ্যপটের সঙ্গে সাদৃশ্য রক্ষা—দলগত অভিনয় বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান—দৃশ্যমান বা দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয়কে আয়ত্ব করার জন্যে ব্যবহারিক ঔচিত্যবোধক জ্ঞানার্জন।

এর পরেও স্বর প্রক্ষেপণের (Voice Production) পাঁচ রকমের রীতি আছে। ভাব, বয়েস অনুযায়ী সেই হিসেবটা কষলে যা দাঁড়াবে তা হলো—

৫১ × ৯ = ৪৫৯ × ৫ = ২২৯৫

নাট্যশিক্ষাগ্রহণের প্রাথমিক স্টেপ দাঁড়াচ্ছে গিয়ে—

৫৯৪৯ + ২২৯৫ = ৮২৪৪

তাহলে বুঝুন এতো রকমের জিনিস কি একদিনে আয়ত্ত করা সম্ভব? কিংবা দু'একদিন মহলা দিয়ে মঞ্চে বাজিমাৎ করা কি উচিত হবে?

এরপর ভাবুন—অভিনয় কি সহজ? সহজ ভাবলে—সত্যি আপনি বিশ্বজগতের বিশ্বকর্মা নয়তো নটগুরু ব্রহ্মার বরপুত্র। সেক্ষেত্রে আমি সাধারণ মনুষ্য প্রজাতির একটি সামান্য জীবমাত্র। অতএব হার মানলুম।

কথা : চলা : করা ৬

এখন প্রসংগটা একটু পাল্টানো যাক। আগেই বলেছি—

ইংরিজিতে যাকে বলে 'ট্যালেণ্ট'—তা প্রকৃতি থেকে নিয়েই আপনাকে পৃথিবীতে জন্মাতে হবে। লোকে যে যাই বলুক। কেউ বলবে প্রতিভা, কেউ বলবে ঐশীশক্তি। কেউ বলবে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা। এক একটি কথার অর্থ এক এক রকম হতে পারে। কিন্তু মোদ্দা কথা—পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্যে একজন মানুষ যা করবে, যা ভাববে এবং যা বলবে তা দিয়েই একজন মানুষ কখনোই অভিনয়-শিল্পী হতে পারে না। একজন শিল্পীর পক্ষে আলাদা কিছু ক্ষমতা প্রয়োজন। কেননা—অভিনয় বিষয়টা একজন শিল্পী প্রকাশ করে। প্রকাশ করে নিজেকে নয়—অপরকে নিজের মধ্য দিয়ে। নিজের মধ্যে, ব্যাপারটা বিরাট·· ব্যাপক। তা হলে প্রথমে নিজের মধ্যে বিষয়টা নিয়ে কিছু বলা যাক।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে চলে, বসে বা শুয়ে যখন অভিনয় করা হয় তখন শিল্পী তাঁর নিজের শরীরের মধ্য দিয়ে অপরের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করেন। আর অপরের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে গিয়ে অপটু বা অক্ষম শিল্পীরা নিজেদের ব্যক্তি-জীবনের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটিয়ে বসেন। ফলে যা দাঁড়ায় তা হলো—সব রকমের চরিত্র-সৃষ্টিতে শিল্পী ব্যক্তি জীবনের কিছু-না-কিছু আচার-আচরণ, কথা বলার ভঙ্গিমা প্রকাশ করে ফেলেন। কিন্তু তা হবে কেন? হবে, কারণ—অনুশীলনের অভাব অনুসন্ধিৎসার অভাব—নিজের মধ্যে চরিত্রকে এনে চরিত্রের ব্যক্তিত্বকে বুঝে তাকে প্রকাশ করার শক্তির অভাব।

এমনও অনেককে বলতে শোনা গেছে—এই ধরনের চরিত্র আমাকে স্যুট করছে না—অমুক চরিত্রটা আমাকে দিয়ে হবে না—এই চরিত্রটা আমার উপযুক্ত নয়—আমি কখনো করিনি—পার্টটা বড্ড ছোট—এতে দেখানোর কিছু নেই! এই সমস্ত কথাবার্তায় গা জ্বলে—চরিত্র চরিত্রই—তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যক্ত করাই শিল্পী হিসেবে আপনার দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। শিল্পী হিসেবে আপনি নিজেকে যতটা জাহির করছেন বা অর্জিত কেরামতিকে রূপ দিতে চাইছেন সেকথা ভাবার আগে চরিত্রটি সঠিক রূপ দেওয়ার জন্য মানসিক এবং শারীরিকভাবে কোনো কোনো বিষয়ে প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন তা ভাবা উচিত সবার আগে।

আপনি নাটকের কথা—নাট্যকারের কথা—চরিত্রের কথা—পরিবেশের কথা এমন কি নিজের কথাও রূপ দেন অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। আর অভিনয়ের সার্বিক প্রকাশ ঘটে আপনাদের দেহযন্ত্রের মধ্য দিয়েই। তাহলে অভিনয়ের মিডিয়াম হচ্ছে শিল্পীর সম্পূর্ণ দেহ। শুধু দেহতেই সব বোঝা গেল না বা বলা হলো না। দেহ বলতে তার কাঠামোকে শুধু বুঝলে চলে না—বুঝতে হয় দেহের মধ্যে অন্তর্নিহিত সাজানো মন ও মেজাজকেও। মন বলতে অনুভূতি অর্থাৎ ফিলিংসকেই বোঝাতে চাইছি। আর মেজাজ বলতে ব্রেণ বা মাথার ভেতরে সুরক্ষিত মস্তিষ্ককেই বলতে চাইছি। এই মন এবং মেজাজের নিয়ন্ত্রণ ক'রেই আপনাকে শরীর-যন্ত্র খাটিয়ে, কাজে লাগিয়ে অভিনয়-শিল্পী হতে হবে। সুতরাং অভিনয় করতে যাবার আগে অনুশীলন পর্বে মন এবং মেজাজকে সংহত, নিয়ন্ত্রণ এবং সুরক্ষার কাজে আপনাকে নিয়োজিত হতে হবে। কথায় বলে না—যার মন-মেজাজের ঠিক নেই, তার বন্ধুত্বেও বিশ্বাস নেই। ব্যক্তি জীবনে আনাড়িপনায় আপনার একান্ত ব্যক্তিগত প্রিয়জন ছাড়া অন্য কারো কিছু যায় আসে না। কিন্তু শিল্প সৃষ্টি করার পথে শিল্পীর অস্তিত্ব অনেক মহৎ—অনেক বিশুদ্ধ। একটিতে সার্থক-অসার্থক বিচার-অবিচারের কোনো প্রশ্ন ওঠে না—অপরটি যেহেতু সবার জন্যে, সুতরাং সেখানে সব আচার-বিচারের প্রশ্ন আসবে নির্ধারিত পথ ধরেই। সুতরাং শিল্পীকে সহনশীল বন্ধুত্বে উত্তীর্ণ হতে হয়।

অভিনয়-শিল্পীর মিডিয়াম তার শরীর হলে অনুশীলনের সুবিধার জন্য একটি শরীরকে কয়েকটি ভাগে ভাগ ক'রে নেওয়া উচিত। আগেই এবিষয়ে অংক কষে কিছু তথ্য দেয়া হয়েছে।

আগে ভাগে ব'লে রাখি—শিল্পী যা করে স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষও তাই করে। কিন্তু শিল্পীর করা বা বলা একজন সাধারণ মানুষের চেয়ে আলাদা

হয় তার কারণ—শিল্প সৃষ্টির জন্যে করা—বাস্তব প্রয়োজনে নয়। অথচ বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই শিল্পের শর্ত মেটাতে হয়। বাস্তব সেখানে চড়া, কমা, নীরব, সরব শিল্পে দেখা যায়, কখনো একই গতিতে চলে কখনো উল্টে পাল্টে যায়। একটার মধ্যে স্বাভাবিকতা অন্যটায় অস্বাভাবিকতা। একটার প্রকাশ একেবারেই শেষ, খুবই ক্ষণিক—অন্যটার প্রকাশ প্রয়োজন সাপেক্ষে বহুবার এবং অসংখ্য—বিশেষ ক'রে অভিনয়-শিল্পের ক্ষেত্রে।

শিল্পী মূলতঃ নিজেকে প্রকাশ করে তার ভাবভঙ্গি (Expression), আচার-আচরণ (Gesture Posture), কণ্ঠস্বর (Voice) এবং চলাফেরা (Movement) দিয়ে। নাটকের ভাষা প্রকাশিত হবে কথায় এবং ভাবভঙ্গিমাতে আর সবকিছু প্রকাশিত হবে গোটা শরীর যন্ত্রের মধ্য দিয়ে। এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আর একটা ছক রাখা যাক।

[১] কথা + ভাবভঙ্গিমা = অভিনেতার ভাষা

[২] কথা + ভাবভঙ্গিমা + আবেগ + আচার আচরণ + চলাফেরা = অভিনেতার প্রকাশ

[৩] বোঝা + অনুভব + ভাবভঙ্গি + আবেগ + আচার আচরণ + কণ্ঠস্বর + চলাফেরা + অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা = সার্থক অভিনয়

[৪] মাথা + কাঁধ ও গলা + মুখ + কণ্ঠস্বর + হাত + দেহ + পা + মন + মস্তিষ্ক = গোটা দেহ = শিল্পীর মিডিয়াম

অভিনয়ের আগে অনুশীলন পর্বে ওপরের প্রতিটি বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষাক্রমে সম্পৃক্ত হতে হ'বে। আমাদের এখনকার আলোচনা মূলতঃ বলা, চলা, করা নিয়ে।

'বলা' বলতে সংলাপকে সুন্দরভাবে বলা নয়—চরিত্রের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নিজে বুঝে নিয়ে অপরকে বোঝানোর জন্য যা বলা কেবল ততটুকুই। কণ্ঠস্বর এবং স্বরসাধনা নিয়ে আমার নাটক পরিচালনা গ্রন্থে কিছু বলা হয়েছে। আগ্রহীরা দেখে নিতে পারেন। এখানে সেইটুকু আলোচনা হবে যা ঐ গ্রন্থে উল্লেখ নেই।

বাস্তবে যেভাবে কথা বলেন, মঞ্চে এসে সেইভাবে কথা বলা চলে না। মঞ্চে কথা বলার জন্যে দু'দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় বিশেষভাবে (১) যা বলছেন তা বুঝিয়ে বলার জন্যে যতটা সম্ভব বিশুদ্ধ করে এবং সবাইকে শোনানোর মতো ক'রে বলা। (২) সামগ্রিক অভিনয়কে সার্থকরূপে ব্যক্ত করার জন্য অন্যের স্বরক্ষেপণে আপনার সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দেয়া। অন্য কথায় সামগ্রিক অভিনয়ে . থ স্বরক্ষেপণ রীতির মধ্যে একটা ছন্দ সৃষ্টি করা এবং সেই ছন্দ যাতে নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য, ভাবরসকে বজায় রাখতে সক্ষম হয় তার দিকে দৃষ্টি রাখা। তাহলে স্বরসাধনা এবং কণ্ঠকে আপনার মন-মেজাজের নিয়ন্ত্রণে অবশ্যই রাখতে হবে। এরপর স্বরক্ষেপণে আরো কতো অসুবিধা সৃষ্টি হয় দেখুন।

আপনি মহলাগৃহে যেভাবে কথা বলায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন বা তালিম নিয়েছেন কিংবা যেভাবে কথা বলবেন ঠিক করেছেন মঞ্চে গিয়ে ঠিক সেই ভাবে স্বরক্ষেপণ করে হয়তো ব্যর্থ হতে পারেন। কারণ, আমাদের দেশে যত রকমের প্রেক্ষাগৃহ তত রকমের অসুবিধা। সুতরাং মহলার সময় স্বর-সাধনকে বিভিন্নমুখী পথে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। কোথায় কি অসুবিধা আছে এবং সেই

অসুবিধা দূর করার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পর্কে আগে থেকেই তৈরি হতে হবে। কোন্ হল শব্দ-নিয়ন্ত্রণে সহায়ক, কোন্ হলে তিন সারির পরের লোক কণ্ঠস্বর শুনতে পান না, এসম্পর্কে ধ্যান-ধারণা রাখতে হবে। হলে যদি গুঞ্জন শোনা যায় বা আপনার দ্বিগুণ পর্দায় স্বরক্ষেপণ শুনতে না পেয়ে দর্শক যদি এইভাবে চিৎকার করে ওঠেন—'জোরে বলুন দাদা,' ঠিক সেই মুহূর্তে হয়তো আপনি নাটক জমিয়ে ফেলার চেষ্টা করছেন—কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে কিংবা ঘটতে চলেছে এমন অবস্থায় আপনি কি করবেন? আপনি কি চিৎকার করে কথা বলবেন? না। তাহলে গলা ফেটে যাবে—গলা জখম হবে, মন ভাঙবে—হতাশ হবেন। তাহলে উপায় কি? উপায় চেঁচানো নয়—কণ্ঠে ভলিউম সৃষ্টি করতে হবে। কণ্ঠে সুর আনতে হবে এবং দেহের মধ্যে অফুরন্ত বায়ু ধারণের ক্ষমতা রাখতে হবে। এ ছাড়া কিছু কৌশলও আয়ত্ত করতে হবে—'বিরতি', 'শব্দে জোর' দেয়া ইত্যাদি বিষয়ে। এছাড়াও বিরতি ব্যবহার করে সঠিক আবেগ প্রয়োগ দ্বারা সংলাপ প্রকাশে বৈচিত্র্য আনতে হবে। একঘেয়েমি থেকে উত্তীর্ণ না হতে পারলে মঞ্চে দাঁড়িয়ে চরিত্র যেন শুধু না দেখে কিছু পড়ে যাচ্ছে বলে মনে হবে। আসলে পড়ার চেয়ে বলাটাই বড় কথা—বলার চেয়ে বলার মতো বলা আরো বড় কথা। এ বিষয়ে অসংখ্য রীতিনীতি আছে। তার সম্পর্কে পরিচিত হওয়া এবং পরিচিত হবার পর প্রত্যহ সেই রীতিনিয়ে অনুশীলন করা অবশ্যই প্রতিটি শিল্পীর কর্তব্য। এ দেশে এই সব বিষয় নিয়ে এখন খুব একটা কাজ হচ্ছে না। মাথাও ঘামাচ্ছেন না কেউ। পথ নেই। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও নেই। যোগ্য গবেষকের সংখ্যা খুবই কম। কাজেই—আমরা এবং ভবিষ্যতের শিল্পীরা কি শুধু হতাশার ক্ষয় রোগে ভুগবো? মনে হয়—না। আমরা চেষ্টা করছি। দেখা যাক কি হয়। আর একটা কথা ব'লে 'বলা' পর্যায়ে বক্তব্য শেষ করবো।

মঞ্চে অনেক অভিনেতাকে দেখা গেছে, কথা বলার সময় সংলাপের শেষ অংশ শোনা যায় না। জোর দিয়ে শুরু ক'রে শেষ পর্যন্ত নিজের কথা নিজের কাছেই রেখে দেন। এতে দর্শকরা হতাশ হন। সংলাপ প্রয়োগ চরিত্রানুগ হবে। তবুও চেষ্টা ক'রে সংলাপের শেষ অংশে জোর দিতে হবে পূর্ণচ্ছেদের আগে এবং একাধিক সংলাপ থাকলে অন্য চরিত্র সংলাপ ধরার আগে। এবিষয়ে সংলাপ আদান-প্রদানের দায়িত্ব উভয় শিল্পীর পক্ষেই থেকে যায়। সেখানে গলার বেজ (Base) অনুযায়ী স্বরক্ষেপণে সমতা রেখে অভিনয় করতে হবে। অর্থাৎ এক-জন অভিনেতা স্বাভাবিকের চেয়ে উচ্চ পর্দায় সংলাপ শেষ করলে পরবর্তী

অভিনেতাকে সেই সমপর্দায় বা আরো একটু উঁচুপর্দায় সংলাপ ধরলে দর্শকদের কাছে নাটকের সম্পূর্ণ ভাষাটা পরিষ্কার হবে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে একজন সংলাপ শেষ করার পর যদি দীর্ঘ বিরতি থাকে এবং সেই দীর্ঘ বিরতির পর যখন অন্য অভিনেতা সংলাপ শুরু করবেন তখন সেই অন্য অভিনেতা কি আগের অভিনেতার মতো এক পর্দা বা আগের উঁচু পর্দায় সংলাপ ধরবেন ? আমি বলি—বিরতি ঘটবে প্রম্পট ভুলে নয়—তা ঘটবে কার্য-কারণসূত্রে। সুতরাং সেক্ষেত্রে উভয় অভিনেতার সংলাপহীন সংলাপ অর্থাৎ expression-ই সামগ্রিক ছন্দ রক্ষার সহায়ক হবে। কণ্ঠের মাধ্যমে সংলাপ প্রকাশিত না হয়ে সংলাপ প্রকাশিত হবে ভাবভঙ্গির সাহায্যে। যেখানে কোনো ভাবভঙ্গির কাজ-কারবার নেই—শুধু নীরবতাই যে পরিবেশের অপরিহার্য অঙ্গ সেখানে সেই নীরবতার মুহূর্তে প্রচণ্ড সংলাপ উচ্চারিত হয়। সেই সংলাপ অনুচ্চারিত সংলাপ। আর এই অনুচ্চারিত সংলাপ অনেক সময় সরব সংলাপের চেয়েও সাংঘাতিক হয়। সার্থক অভিনয়ের দৃষ্টান্ত ভালো সংলাপ বলার সঙ্গে ভালো ভাবভঙ্গি প্রকাশের সমন্বয়েই থাকে। শুধু ভালোভাবে কথা বললে ভালো বক্তা হওয়া যায়—কিন্তু ভালো অভিনেতা হতে গেলে কথার সঙ্গে ভাবের সংযোগ ঘটাতে হবে।

ভালো অভিনয় শুধু কথা বা ভাবভঙ্গিমায় হয় না। ভালোভাবে 'চলা' সম্পর্কে সতর্ক হতে হয়। কেউ ভালো বলতে পারেন, ভালো expression দিতে পারেন কিন্তু মঞ্চে একটু চলাফেরার অংশ থাকলে সব গুলিয়ে ফেলেন। আবার দেখা গেছে একদল নবীন শিল্পী মঞ্চে যেমন কথা বলেন তেমন আবার চলাফেরা করেন রীতিমতো। চলা থামাতে বললে আর ভালোভাবে কথা বলতে পারেন না। প্রয়োজনমতো যেখানে যতটুকু চলা দরকার ঠিক ততটুকুই চলতে হবে। অন্য দিক থেকে—এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অভিনয় করলে যেমন একঘেঁয়ে হয়ে যাবে ঠিক তেমন সামনে পেছনে যত্রতত্র যাতায়াত করলে সামগ্রিক অভিনয় দৃষ্টিকটু হতে পারে। 'চলাফেরা' সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বপ্রস্তুতি নেয়াই ভালো এবং গোটা নাটকটাকে আগাগোড়া ছক বেঁধে চলাফেরার বিষয়গুলি সাজিয়ে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

অনেক সময় দেখা গেছে একজন অভিনয় করছেন মঞ্চের মধ্যভাগে দাঁড়িয়ে—অন্য অভিনেতা যেহেতু চলাফেরা করতে হয়, সেই কারণে সেই অভিনেতা সামনে দিয়েই হেঁটে গেলেন। ফলে নাটকের গুরুত্বপূর্ণ অংশ একটু চলার জন্যে মাটি হয়ে গেল। সামগ্রিকভাবে একটি প্রযোজনাকে জীবন্ত করে তোলার জন্য

অভিনেতাকে এককভাবে এবং অভিনেতাদের সামগ্রিকভাবে 'চলাফেরা' করানোর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কিন্তু তা বেহিসেবী হলেই অপসৃষ্টি হবে। অনেকে আবার চলতে চলতে কথা বলেন—চলতে চলতে অভিনয় করতে যাওয়ার জন্যে অভিনেতার প্রচণ্ড পরিমাণ দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। ভাব প্রকাশ, কথা বলায় এবং চলাফেরার মধ্যে সামগ্রিক ছন্দ না থাকলে—ভালো অভিনয় করা কখনো সম্ভব হয় না। আর সেই সামগ্রিক ছন্দ আসবে লজিক এবং রিয়েলিটিকে ঘিরেই—কারোর কোনো ইচ্ছামতো নয়। চলাফেরা নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। তবে এ বিষয়ে আলোচনার চেয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনই বড় কথা। এবিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে গেলে স্বাভাবিক শরীর চর্চার এবং চলাফেরা করার অভ্যাস যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনি প্রয়োজন 'মাইম' এবং 'ইমপ্রোভাইজেশন' শাস্ত্রকে জানা। এই দুটি শাস্ত্র মূলতঃ ব্যবহারিক জ্ঞানের শাস্ত্র। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত সহযোগে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ আছে এবং সেই আলোচনা যেমন লোভনীয় তেমনি প্রয়োজনীয়। সে আলোচনা অন্যত্র এবং অন্য ভাবে।

চলাফেরার সঙ্গে 'করা'র এক ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র আছে। 'করা' ইংরিজিতে যাকে বলে action, প্রকৃত প্রস্তাবে একটা গোটা নাটকে আমরা তো পর পর action সৃষ্টি করেই চলি। ভালো Action সৃষ্টি না করতে পারলে প্রযোজনা কখনো সার্থক হয় না। আর এর জন্যে অভিনেতার একক দায়িত্ব যেমন আছে ঠিক তেমন একটা গোটা দলকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্বও ন্যস্ত হয় একজন অভিনেতার ওপর। সার্থক অভিনয় এবং সার্থক সামগ্রিক প্রযোজনার দিকে দৃষ্টি রেখে কোথায় কেমনভাবে action সৃষ্টি করা যেতে পারে তার কিছু সূত্র খুঁজে বের করলে ভালো হয়—নয় কি ?

১। একক ভাবে—সংলাপ প্রয়োগের মাধ্যমে। কোন শ্লথগতির নাটক কিংবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর নাটক—যেখানে কোনো বাহ্যিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নেই সেখানে অভিনেতাকে সংলাপ বলার বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে Action সৃষ্টি করতে হবে। ফলে গতিহীন নাটক গতি পেতে পারে—গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নাটক মনোজ্ঞ হয়ে উপস্থাপিত হতে পারে।

২। একক ভাবে—সংলাপ বলার পর বা সঙ্গে কিংবা আগে অঙ্গ-সঞ্চালন ঘটিয়ে চলাফেরা করে।

৩। একক ভাবে—Expression-এর সাহায্যে। সম্ভব হলে প্রয়োজনকে

স্বীকার ক'রে নিয়ে Emotion বা আবেগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয়ে Expression-কে কাজে লাগানোর মধ্য দিয়ে।

৪। যুগ্মভাবে—সংলাপ বিনিময়ের মাধ্যমে ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করে।

৫। যুগ্মভাবে—move করে Gesture Posture-কে কাজে লাগিয়ে।

৬। যুগ্মভাবে—শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে এবং সচেতনভাবে নিজেদের আবেগকে ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে।

৭। একক এবং যুগ্মভাবে বিরতির সদ্ব্যবহার ক'রে।

৮। একক এবং যুগ্মভাবে Emotion এবং Expression-কে কাজে লাগিয়ে।

৯। একক এবং যুগ্মভাবে নিজের কাজের সঙ্গে মঞ্চে আসবার এবং নিজের জিনিস ব্যবহার করে এবং সেই জিনিসের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ক'রে।

১০। সামগ্রিকভাবে—মঞ্চে দলগত ছবি সৃষ্টি ক'রে।

১১। সামগ্রিকভাবে—মঞ্চে Composition রচনা ক'রে (সজীব ও নির্জীব দুই প্রকারেই)।

১২। সামগ্রিকভাবে—মঞ্চে ফ্রিজ করিয়ে।

১৩। একক, যুগ্ম এবং সামগ্রিকভাবে নোতুনভাবে কথা বলে বা গানের সাহায্য নিয়ে।

১৪। একক, যুগ্ম এবং সামগ্রিকভাবে আলো, সংগীত বা শব্দের সাহায্য নিয়ে।

চলমান নাটকে সাধারণভাবে নাট্য মুহূর্ত লিপিবদ্ধ থাকে। অনেক নাটকে সেই নির্ধারিত মুহূর্ত আসতে দেরী হয় এবং সাময়িক ভাবে নাটক দানা বাঁধে না। যেখানে দানা বাঁধে না সেখানকার জন্যেই এতো কথা বলা। যেখানে নির্ধারিত নাট্য-মুহূর্ত কার্য বা পরিস্থিতির পরিবর্তনে বাধা আছে সে সব জায়গায় ভালো অভিনেতার হাতে পড়লে ভালোভাবেই উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু শিল্পী অপটু হলে সতর্ক হবার জন্যেই অনুশীলন করার স্বপক্ষে কিছু কথা বলা গেল। তবে সার্থক অভিনেতা হিসেবে উত্তীর্ণ হতে গেলে এর প্রতিটি বিষয়ে সচেতন হতে হবে। দেখতে হবে Action সৃষ্টি করার বিষয়ে অভিনয়ের পক্ষে শিল্পী হিসেবে আপনি নৈতিক দায়িত্ব কতোখানি পালন করতে সক্ষম হবেন। কারণ, আপনার শরীরের মধ্য দিয়ে সার্থক পরিস্থিতি, নাট্য-মুহূর্ত সৃষ্টির ওপর নির্ভর করবে একটি সার্থক প্রযোজনা। আপনি নিজেকে যতটুকু যে ভাবে প্রকাশ করতে

পারেন অভিনয়ের খাতিরে আপনার সহশিল্পী হয়তো ততখানি নিজস্বতা প্রকাশে অক্ষম। সেখানে আপনার বিবেচনা—আপনার করণীয় দায়িত্ব—আপনার নিষ্ঠাই অপরের দায়িত্বকে নিজের কাছে টেনে নেবে দলগত স্বার্থে। Action সৃষ্টি করতে গেলে কণ্ঠস্বরকে মঞ্চের উপযোগী ক'রে যেমন গড়ে তুলবেন ঠিক তেমনি নিজের দেহটাকে নিজের অধিকারে রাখার জন্য নমনীয় ভাবে তৈরি করে নেবেন। বস্তু, জগত, জীবন সম্পর্কে অনুভূতি বাড়াবেন। পর্যবেক্ষণ শক্তিকে প্রসারিত করবেন। এছাড়া গভীর মনোনিবেশ সহকারে নিজে পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে active করার চেষ্টা করবেন নিয়মিত অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। কারণ, এ সব জিনিস আয়ত্তে না থাকলে মঞ্চে কখনোই ভালোভাবে 'বলা, চলা, করা' কেন—কোনো কিছুই করা যায় না—আবোল-তাবোল কিছু ছাড়া। আবার কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন এই ভাবে 'বলা, চলা, আর করা'র মধ্যে কোনটা আগের? কেউ বলেন আগে কণ্ঠস্বর। আবার কেউ বলেন—শরীর সৌষ্ঠব আগে। এই বিষয় আমার মনে হয় কেবল তর্কেরই বিষয়। এই সব নিয়ে আলোচনায় বসলে কাজের চেয়ে সমস্যা বাড়ে বেশী। আসলে অভিনয় একটা গোটা জিনিস ব'লে আলোচ্য বিষয়ের কোনো একটা বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিলে অন্যান্য বিষয়গুলির ওপর অবিচার করাই হবে। মোট কথা, একটা অন্যের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে যুক্ত যে-কোনো একটি বিষয়কে আগে পিছনে নিয়ে যাবার আপেক্ষিক গুরুত্ব উত্থাপন ক'রে সেই বিষয়কে আপাতত গুরুত্বহীন না করাই ভালো।

মোট কথা মঞ্চে উঠে আপনি কিছু-না-কিছু করেন। শুধু মঞ্চে কেন যে-কোনো জাতীয় অভিনয়ের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

বেতারে অভিনয়ের সঙ্গে 'করা' প্রসংগটি 'বলা'র ওপর নির্ভর করে—নয় কি? বেতার-নাটক শুধু verbel communication. কথা বলে আপনাকে action সৃষ্টি করতে হয়। যেখানে দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে না বলে বিশেষভাবে সতর্কতা পালন করতে হয়, সেখানে বস্তু বা ব্যক্তিকে যেমন কথা দিয়ে বা ধ্বনি দিয়ে বোঝাতে হয় ঠিক সেইরকম ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টির ক্ষেত্রেও সংলাপ আদান-প্রদানের ওপর কোনো সংলাপে কতোটা জোর দেব—কোথায় কতোটা থামবো অথবা পর্দা ঠিকমতো কতোখানি ওঠালে বা নামালে আমার চরিত্রটি কিভাবে সঠিক পরিস্ফুট হবে ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি বিষয়-বিশেষের দিকে তাকাতে হবে। বেতার-নাটকে

action সৃষ্টির কাজে মুখ্য ভূমিকা শুধু সংলাপ আর ধ্বনি ক্ষেপণের। কারণ সেখানে যা কিছু গতিময়তা এবং শ্রুতিগ্রাহ্য বৈশিষ্ট্য তা কেবল সংলাপ এবং ধ্বনি প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল।

ফ্লিমে বা ছায়াছবিতে অভিনয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক সুযোগের অবকাশ আছে। যদি অভিনয়-শিল্পীর সামগ্রিক আত্মগত উপলব্ধিকে স্টেজে অভিনয় করার সময় যতটা গভীর এবং বিশিষ্টভাবে রূপদান করা যায় ফ্লিমে অভিনয়ের বেলায় তা সম্ভব হয় না। এখানে যান্ত্রিক কুশলতার ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়। আমি নিজে উপস্থিত না হয়ে আমার অভিনয়ের অংশ অন্যে করতে পারেন অথবা দীর্ঘ অবকাশের পর একই চরিত্রের বিভিন্ন অংশে রূপ দিতে পারেন। যন্ত্রের প্রভাব যেমন জটিল তেমনি ছায়াচিত্রে অভিনয়ের বিষয়টা আরো জটিল। অভিনয়-শিল্প এখানে নিজের ওপর যতটা না নির্ভর করে তার চেয়ে বেশী নির্ভর করতে হয় অন্যদের ওপর। তাছাড়া আপনার সাফল্য বা অসাফল্য সম্পর্কে আপনি সজ্ঞান বা সরাসরি কোনো ধারণা ফ্লিমের অভিনয়ের ক্ষেত্রে পাবেন না। যদিও আপনার সবকিছু একইভাবে সেলিউলয়েডের ছোট্ট ছোট্ট ফ্রেমে ধরা থাকে। আজকের জীবনকে আগামী তিরিশ বছর পরেও একইভাবে দেখতে পাবেন। কিন্তু মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রে—তা সম্ভব নয়। তাই মঞ্চাভিনয় তাৎক্ষণিকতা দোষে দুষ্ট শিল্প। এখানে কাট্ নেই—এখানে কনটিনিউটি দীর্ঘমেয়াদী—সবসময় লঙ শর্ট।

সে যাই হোক ফ্লিমে গতিশীল বস্তু কিন্তু চারটি (১) শিল্পী নিজে (২) আলোক সম্পাত (৩) ক্যামেরা নিজে চলে বা ঘোরে (৪) নানা ধরনের শর্ট নেয়ার কৌশল। কাজেই বুঝুন action সৃষ্টির ক্ষেত্রে ফ্লিমে অভিনয় যতটা সহজ বা ব্যাপকতা যতটা বেশী—মঞ্চের ক্ষেত্রে ঠিক ততটা নয়। ফ্লিমে আবহসংগীত গতি এবং action সৃষ্টির কাজে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা বিশেষ ভূমিকা নেয়।

মঞ্চে এ পর্যন্ত গতিশীল বস্তু হিসেবে শিল্পী এবং আলোকেই পেয়েছি। action সৃষ্টির ক্ষেত্রে নেপথ্য ধ্বনি ক্ষেপণকে আমরা এখন কাজে লাগাই নানাভাবে।

তবে ইদানিং শহরে বেশ কিছু মঞ্চ নিজেরা ঘুরছে। এই ঘোরাতে action সৃষ্টির চেয়ে দৃশ্যপটের পরিবর্তনের দ্রুততার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য দেওয়া হয়। মঞ্চাভিনয়ের গতিশীলতার দিকে লক্ষ্য রাখলে শিল্পীর চলাফেরা

এবং আলোর চলাফেরাকেও চলমান অস্তিত্ব হিসেবে এখন স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে।

কাজেই মঞ্চে action সৃষ্টির বিষয়ে শুধু যে কথা বলার মধ্যেই সীমিত তা নয়। অন্যান্য বিষয়ে আগে যা উল্লেখ করেছি—তারপরেও যুক্ত করতে হয় আরো কয়েকটি বিষয়। যেমন—গতিশীলতার মধ্যে action সৃষ্টি করা—এখানে ইদানিং যে চমক সৃষ্টির রেয়াজ দেখা গেছে তার সম্পর্কে কিছু বলতে চাইছি না। নাটক চলতে চলতে—যদি দুম করে একটি বোমা সজোরে মঞ্চের ওপর ফাটে তাহলে রীতিমতো চমক সৃষ্টি হয়। কিন্তু ঐ বোমা ফাটার সঙ্গে নাটকের অগ্রগতি, বিষয়বস্তুর কি সম্পর্ক আছে তা আগে ভেবে দেখতে হবে। অর্থাৎ চমকসৃষ্টি বলুন আর action সৃষ্টি বলুন যা কিছু করতে যাবেন তা করতে হবে শিল্পের শর্ত মেনে। তাহলে এখন প্রশ্ন শিল্পের শর্ত কি? এ নিয়ে অনেক তর্ক। বাস্তবে আমরা যা দেখি অভিনয় দেখতে গিয়ে ঠিক তেমনটি দেখতে চাই না—দেখতে চাই এমনটি যা ঘটে না অথচ ঘটলে ভালো হয়—ভালো হতো—ঠিক এমন কিছু ঘটাতে পারলে এবং সেই ঘটানোর কাজটা যদি বাস্তবসম্মত হয় এবং সেই বাস্তব-সম্মত ঘটনা দেখে যদি আমি আনন্দ পাই এবং যদি সঙ্গে সঙ্গে কিছু ভাবার সুযোগ পাই—সেটাই হবে শিল্পের শর্ত।

অল্প মহলা দিয়ে কিংবা কম্‌বিনেশন নাইট করতে গিয়ে নামজাদা কিছু কৌশল-সচেতন অভিনয়-শিল্পীদের নিয়ে এসে অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ শিল্পীদের দিয়ে অভিনয় করতে গেলে—সেখানে দেখা যায়—দামী শিল্পী ঠিকমতো হাততালি এবং দর্শক মনোরঞ্জন করে বেরিয়ে গেল। অন্যান্য অদক্ষ শিল্পীরা দর্শকের মনে দাগই কাটতে পারলো না। এর কারণ কি, একক অনুশীলন। একক অনুশীলনে অন্য কোন শিল্প হতে পারে—কিন্তু নাট্যশিল্প হয় না। তাই তো প্রতিভাধর দক্ষ পরিচালকের প্রয়োজন হয়।

এক একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে দেখুন—কোনো কান্নার দৃশ্যে—'মাটির ঘরে' যেমন কাঁদছে 'শাজাহানে' ঠিক তেমনি ভাবেই কাঁদছে। হাত পা একটি নাটকে যেমন ভাবে সঞ্চালিত হয়েছে অন্যান্য নাটকেও ঠিক তেমনিভাবে সঞ্চালিত হচ্ছে। আসলে—এসব ব্যাপারে সাময়িক হাততালি ও যশ পাওয়া যায় ঠিক—ইংরিজিতে একে গ্যালারী একটিং বলে। কিন্তু চরিত্র বুঝে চরিত্রের মতো আচার-আচরণ কতোজন করে?

যাক সে সব কথা—এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করা হবে। আসল কথা—

নোতুন ঘটনা—নোতুন action সৃষ্টির বিষয়ে সচেতন হতে গেলে শুধু কণ্ঠকে অবলম্বন করলেই চলবে না—শুধু অঙ্গ-সঞ্চালন বা চলাফেরার মধ্যে দিয়ে action করার কথা ভাবলে চলবে না। আবহসংগীত, আলোকসম্পাত এবং গোটা দলকে নিয়ে দীর্ঘ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে কিভাবে নোতুন নোতুন action সৃষ্টি করা যায় সে কথাও ভাবতে হবে।

তাহলে 'কথা-চলা-করা' এই ত্রয়ী বিষয়কে ঠিকভাবে প্রয়োগের কাজে লাগানোর জন্য কি করা উচিৎ—অর্থাৎ কোন্ কোন্ দিক থেকে সচেতন হয়ে আমরা এই ত্রয়ীর সার্থক রূপায়ণের দিকে এগিয়ে যাব?

১। নেপথ্য-শিল্পী থেকে শুরু করে সবাইকে নির্ধারিত বই পড়তে হবে—উপলব্ধি করতে হবে ঘটনা, চরিত্র এবং নিজের করণীয় কর্তব্যকে।

২। পরিচালক মাস্টার প্রম্পট্ কপি তৈরি করলেও প্রতিটি শিল্পীকে নিজেদের জন্যে নিজেদের কপি তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে পরিচালকের সঙ্গে আলোচনা ও ভাব বিনিময় ঘটিয়ে।

৩। নিয়মিত—সুনির্দিষ্ট সময়ে মহলাগৃহে এসে অনুশীলন করা। প্রয়োজনে গোটা বই নয়—এক একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বেছে নিয়ে অনুশীলন করুন।

৪। আলোক-শিল্পী বা নেপথ্য-শিল্পীদের সঙ্গে নেবেন নিজেদের মধ্যে চরিত্রটি বসে গেলে অর্থাৎ চরিত্রটি যখন আপনি নিশ্চিন্তভাবে নিজের আয়ত্তে আনতে পারবেন তখনই অন্যান্য টেকনিক্যাল বিষয়ের ওপর একে একে নজর দেওয়া ভালো। নইলে তাড়াহুড়ো করতে গেলে—আলো যেখানে—মুখে পড়ার কথা, সেখানে পেটে পড়বে—মৃত্যুর অনেক পর নেপথ্যে আবহসংগীত পরিলক্ষিত হবে।

৫। প্রচুর নাটক দেখুন—ছোট, বড়, নামি-দামি সব জায়গায় নাটক দেখে action রচনার ক্ষেত্রে কার কোথায় কি ত্রুটি দেখা যাচ্ছে তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন—তারপর নিজে কাজ করার সময় অবশ্যই অনেকটা হালকা হতে পারবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কনসাস হবারও সুযোগ থাকবে।

৬। নিজের চরিত্র এবং অপর চরিত্র কোথায় কিভাবে আচরণ করছে তা একাগ্রচিত্তে অনুধাবন করুন। পরদিন মহলায় গিয়ে আপনার অনুধাবিত বিষয়টির মতো যদি প্রয়োগ বিষয়টি না ঘটে

তাহলে পরিচালকের পরামর্শ নিন। তবে মনে রাখবেন একটি সৃষ্টিকে সার্থকতর পথে উত্তীর্ণ হবার জন্যে আপনি পরিচালকের পরামর্শ চাইছেন। এখানে আপনার বিনম্রভাব পরিচালককে ভাবনার কাজে অনেকখানি সহযোগিতা করবে। যদি তা না করে—আপনি তর্ক জোড়েন, একগুঁয়ে হন বা পরিচালককে পরীক্ষা করতে বসেন তাহলে পরিচালকের কোনো ক্ষতি হবে না—মহলাগৃহে পরিচালক হয়তো একটু অপদস্থ হবেন এবং সেই সঙ্গে আপনি আপনার প্রিয়বন্ধুদের কাছে জ্ঞানী প্রতিবাচ্য হবেন—কিন্তু শিল্পী-জীবনে এতে অনেক পিছিয়ে গেল। তর্ক আপনার জীবন নয়—আপনি স্রষ্টা। পরিচালক একটি চরিত্র রূপায়ণ বা action সৃষ্টির স্বপক্ষে আপনার মনোমতো যুক্তি দিতে পারলো না বলে তাকে হেয় করে নিজেকে ছোট করার কোনো মানে হয় না। আপনি সেই ক্ষণিক সময়ের জন্যে খ্যাতি পেলেও মনে রাখতে হবে অভিনয় রজনীর দিন আপনাকে হাজার হাজার দর্শকের সামনে পরীক্ষা দিতে হবে। তখন পরিচালক নেপথ্যে থাকবেন কিংবা অন্য চরিত্রের আড়ালে থাকবেন। কাজেই আত্মসমীক্ষাই মহলকক্ষে আপনার পক্ষে আগামী দিনে পরীক্ষায় উত্তরণের একমাত্র মূলধন। জটিল জিনিসকে সহজ করাই আপনার ধর্ম—সহজ জিনিসকে জটিল করা আপাত দৃষ্টিতে বাহাদুরের কাজ বলে মনে হলেও প্রকৃত শিল্পী কিন্তু তা থেকে অনেক দূরে—অনেক নির্লিপ্ত জগতে নিজেকে অপর চরিত্রের পরিমণ্ডলে নিয়ে গিয়ে নোতুনভাবে আত্মসমীক্ষায় মগ্ন হবেন।



কণ্ঠস্বর ও সাধনা ৭

অভিনয় করতে গিয়ে আপনি অনেক রকমের দায়িত্ব পালন করেন। সেই মূল দায়িত্বের অনেক দিকগুলোকে সংক্ষিপ্তভাবে সাজালে দায়িত্বগুলো চারটে পর্যায়ে পড়বে, যদিও দায়িত্ব বিষয়ে আগেই বলা হয়েছে।

যেমন প্রথমত মঞ্চে দাঁড়িয়ে আপনি দর্শকদের ভালো কিছু শোনাবেন। তারপরের দায়িত্ব ভালো কিছু দেখাবেন। তারপর ভালোকিছু ভাববেন এবং শেষে ভালোভাবে সম্পূর্ণ নোতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে আপনার অভিপ্সীত অভিনয় প্রতিভাকে নোতুন করে ব্যাখ্যা করবেন। কাজেই প্রথম দায়িত্ব যেখানে শোনানো—সেখানে কণ্ঠস্বর প্রসঙ্গে আলোচনা এসে পড়ে। সুতরাং এখনকার আলোচনা মূলতঃ কণ্ঠস্বর, স্বরক্ষেপণ রীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে।

আপনি মঞ্চে এসে নিজেকে (নিজেকে বলতে আপনার প্রতিভা এবং চরিত্রকে ব্যাখ্যা করার কথা বলতে চাইছি) যতটুকু প্রকাশ করতে চান তা প্রকাশ করেন বেশীর ভাগ সংলাপের মধ্য দিয়ে। সংলাপ কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। আবার কণ্ঠের মাধ্যমে বলতে তার উচ্চারণ ভঙ্গি আবেগ মিশ্রণ প্রণালী—ইত্যাদিকেও বোঝাবে। কাজেই মঞ্চের জন্যে কণ্ঠকে তৈরি করতে হবে। কণ্ঠকে সুরেলা করতে হবে। কণ্ঠস্বর অনেক সময় ভালো হলে শরীরের গঠন ভালো না হলেও—অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বাড়ায়। যে লোকটার আপাতঃ দৃষ্টিতে তেমন একটা চোখে লাগার মতো চেহারা নেই, সেই রকম অনেক ব্যক্তির ভালো কণ্ঠস্বরের জন্যে অনেক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যেমন, বেতার-নাটকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় তার কণ্ঠের মধ্য দিয়েই—বিশিষ্ট উচ্চারণ ভঙ্গিমার মাধ্যমেই।

এখন প্রশ্ন—অভিনয় করার জন্যে কি অনুশীলন বা তালিমের মধ্য দিয়ে ভালো কণ্ঠস্বর তৈরি করা যায়? এক কথায় তার উত্তর—না মোটেই না, কক্ষনো নয়। তা হলে কণ্ঠস্বরের সাধনা নিয়ে এতো লেখালেখির মামলা মোকদ্দমা কেন? উত্তর—কণ্ঠস্বরের জন্যে নিয়ম বা ব্যবহারিক জ্ঞানের তালিম নিলে ভালো কণ্ঠস্বর তৈরি করা যায় না বটে কিন্তু ভালো কণ্ঠে ভালো স্বর প্রকৃতি থেকে নিয়ে জন্মালে তাকে কি করে আরো ভালো করা যায় এই শিল্প তার নির্দেশ দেয়। বিশেষ করে মঞ্চের এবং অভিনয়ের উপযুক্ত কণ্ঠস্বর সৃষ্টির কাজে স্বরশিল্পের ব্যবহারিক জ্ঞানের অবশ্যই প্রয়োজন আছে।

বাস্তব থেকে উদাহরণ নিন না কেন। আপনি রোজ যত রকমের মানুষ দেখেন—সে পথে হোক, আপনার কাজের জায়গায় হোক কিংবা আপনার আত্মীয় হোক—তার মধ্যে কাউকে না কাউকে অন্ততঃ একজনকে দেখতে পাবেন কণ্ঠস্বর কী সুন্দর—শ্রুতিমধুর—গাঢ়। কিন্তু তিনি অভিনয় করতে পারেন না—প্রকৃতি তাকে ভালো কণ্ঠস্বর দিয়েছেন কিন্তু ভালোভাবে বলতে পারেন না। ভালো বলতে পারেন না তার কারণ তিনি ভালোভাবে কথা বলার বিষয়ে অভ্যাস করেননি—প্রয়োজনও হয়নি। কিন্তু তিনি যদি আপনার মতো শিখে জেনে ভালোভাবে নিয়ম মেনে কথা বলার অভ্যাস করেন তাহলে নিশ্চয়ই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। অভিনয়ের প্রথম কথাই তো ভালোভাবে কথা বলা। তা বলে এটা কি বলা যায়—ভালোভাবে কথা বলতে পারলেই অভিনেতা হওয়া যায়? না, ভালোভাবে কথা বলাটা অভিনেতার অভিনয়ের একটা গুণ—একটা পর্যায়—এর সঙ্গে আরও অনেক দিক আছে। সে সব বিষয়ে একে একে আলোচনা হবে।

বাস্তবে দেখবেন অনেকে ভালো বলছে। ভালো কণ্ঠস্বরের অধিকারী কিন্তু মঞ্চের ওপর তুলে দেখুন কথা আটকে যাচ্ছে—মোটা থেকে সরু হয়ে যাচ্ছে—কাঁপছে। সুতরাং মঞ্চের জগৎ বাস্তব থেকে বেশ কয়েক হাত দূরে। আর উল্টোদিক থেকে দেখুন—ভালো কণ্ঠস্বর নেই, প্রকৃতি হয়তো ঠকিয়েছে—কিন্তু ভালোভাবে কথা বলার ভঙ্গিমা আয়ত্ত করে খারাপ কণ্ঠ নিয়ে তিনি অনেক ভালোভাবে সব কিছু ব্যাখ্যা করতে পারছেন। অভিনয়ের বিশিষ্টতা ঠিক

সেইখানেই। তবু খুব ভালো ফল হবে যদি ভালো গলা প্রকৃতি থেকে এনে তাকে অভ্যাসের মাধ্যমে আরো ভালো করে তোলার চেষ্টা করেন।

ভালোভাবে গুছিয়ে আবেগ দিয়ে কথা বলাটাও এক ধরনের শিল্প। রাজনীতি, অধ্যাপনা, ভাববিনিময় এসবের মধ্যে সবার আগে কথা বলাটাই আসল বিদ্যে—ভালোকণ্ঠ না হলেও বুদ্ধি দিয়ে কথার পিঠে কথা সাজিয়ে থেমে নামিয়ে নানা ভঙ্গিতে কথা বলে অনেকেই বাজার মাত্ করেন যে যার লাইনে। অভিনয়ের আসরে আপনাকে বাজার মাত করতে গেলে ভালোভাবে কথা বলার অভ্যাস করতেই হবে—এটা প্রাথমিক শর্ত।

ভয়েস প্রোডাকশন বা শব্দ প্রক্ষেপণ শিল্পের গোড়ার কথা কিন্তু ব্রিদিং এক্সারসাইজ অর্থাৎ নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম। শব্দ কি নিশ্বাসের মাধ্যমে যে বায়ু আপনি শরীরে ধারণ করলেন তাকে ছাড়ার সময় স্বরনালীর সাহায্যে যখন জিভ, ঠোঁট এবং মুখের বিভিন্ন প্রান্তে ধাক্কাদিয়ে যখন বিভিন্ন ইংগিত সৃষ্টি করে সেই ইংগিতই হচ্ছে শব্দ—আমি সাধারণ জ্ঞান থেকে বলছি, ব্যাকরণ ইত্যাদি পাণ্ডিত্যের অহমিকা থেকে বলছি না—সেখানে হয়তো তার অন্য কোনো সংজ্ঞা হতে পারে। এই ইংগিত সৃষ্টির মূল প্রবক্তা কিন্তু বায়ু বা বাতাস—বাতাস গ্রহণ ও বর্জন। যিনি যত বেশী বায়ু ধারণ করতে পারেন আমার বিশ্বাস তিনি তত বেশী স্বরক্ষেপণ করতে পারেন। যাঁর দম কম অর্থাৎ যিনি কম বায়ু ধারণ করতে পারেন তিনি একদমে বেশী কথা বলতে পারেন না—একটু বলেই হাঁপিয়ে পড়েন—কণ্ঠে সুর সৃষ্টি করতে পারেন না। কাজেই অভিনেতা প্রথম থেকেই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়মিত ব্যায়ামে অংশ নেবেন তালিম নেয়ার শুরু থেকে।

এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যার কণ্ঠস্বর জন্ম থেকেই খারাপ বা রোগগ্রস্ত তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আগে থেকে জেনে নেবেন সেই বিকল কণ্ঠস্বর ভবিষ্যতে ভালো হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না। যদি না থাকে তা হলে আমার মনে হয় অভিনয় জগতে তালিম নেয়া থেকে তাঁর বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

তবে অভিনয় অনুশীলনে অংশ নেয়া থেকে বাদ গেলেও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম থেকে বাদ না নিলেও চলে। কারণ নিশ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়মিত অভ্যাস দু'টি কারণে করা প্রয়োজন। এক, নিজের ব্যক্তিজীবনকে দীর্ঘস্থায়ী এবং সুস্থ রাখার জন্যে। দুই, অভিনয়-শিল্পের জন্যে।

বাস্তবিক, যার নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঠিক চলছে তাঁর রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়াও ঠিক

চলছে এবং নিয়মিত রক্ত পরিশুদ্ধ থাকছে। আবার যাঁর রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া ঠিক চলছে তাঁর শরীরটাও সুস্থ আছে মনে করাটাই স্বাভাবিক। কাজেই কমপক্ষে নিজের শরীরটা সুস্থ রাখার জন্যে প্রত্যেক মানুষকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিৎ। শুধু উচিৎ নয়—জীবনে যতদিন বেঁচে থাকা যায় ততদিন রোগহীন দেহ নিয়ে বেঁচে থাকতে আপত্তি কিসের?

আবার অভিনয়ের প্রয়োজনে দেখা যাবে আপনি যত বেশী বায়ু নিজের শরীরে আত্মস্থ করতে পারবেন তত বেশী শব্দ বা কথা একদমে সুন্দর, সুরেলা-ভাবে প্রকাশ করতে পারবেন। আয়তনে দীর্ঘ সংলাপ প্রকাশের জন্যে ঘন ঘন দম নেয়ার প্রয়োজন হবে না।

কোনো জিনিস অভ্যাস করতে করতে মানুষ অভ্যাসের দাস হয়ে ওঠে। আর সেই অভ্যাসের ফলশ্রুতি—যা আয়ত্ত করতে করতে আপনার মনে গেঁথে গেল তা অদূর ভবিষ্যতে হয়তো দেখা যাবে আপনার নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ালো। জীবনের যে কোনো অভ্যাসের ক্ষেত্রে এ কথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাপারটা কিন্তু প্রকৃতিগত—ওটা আপনি হতেই চলে—আপন নিয়মে চলে—আপনি পৃথিবীতে আসার ছাড়পত্র পাওয়ার দিন থেকে পৃথিবী থেকে যাত্রার শেষ দিন পর্যন্ত। এটা স্বাভাবিক, জন্মগত। নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া চলে আপনার অজান্তে অথচ একটা নিয়মের মধ্যে। সেই নিয়মে গোলমাল দেখা দিলে আপনার শরীর যন্ত্রও বিকল হবে। তা হলে এখন প্রশ্ন আসতে পারে—যে নিয়ম প্রকৃতিদত্ত—যে নিয়মে আপনার জন্মগত অধিকার সেই নিয়মের ওপর আরো নিয়ম কলানোর কি দরকার?

সাধারণতঃ প্রকৃতিগত যে প্রক্রিয়া—যা নিয়ম তা এক রকম—অভিনয়ের সময় যে প্রক্রিয়া বা নিয়ম প্রয়োগের প্রয়োজন হয় তা আবার আর একরকমের। প্রথমটা ঈশ্বরপ্রদত্ত একান্ত ব্যক্তিগত। দ্বিতীয়টা নিজের অর্জিত, সার্বিক—অর্থাৎ অনেকের জন্যে। প্রথমটা স্বতঃস্ফূর্ত এবং অনেকটা নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে—অন্যটা সংযত, সুসংহত—শিল্পের প্রয়োজনে—সৌন্দর্য প্রকাশের জন্যে। প্রথমটি জীবনধারণের জন্যে—দ্বিতীয়টি অভিনয়ের জন্যে—স্বাভাবিক জীবন নিয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার জন্যে। অভিনয় করার সময় যা বলতে হবে তা গুছিয়ে, স্বাভাবিক এবং সুন্দর করে বলতে হবে। স্বাভাবিক জীবনে যে স্বাভাবিকত্ব থাকে মঞ্চের ওপর উঠে সেই স্বাভাবিকত্ব হয়তো একটু উচ্চ পর্দায় ওঠাতে হবে—সেই

উচ্চ পর্দায় ওঠানোর বিষয়টা যেন অবাস্তব হয়ে না ওঠে তা আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে বিবেচকের দৃষ্টি দিয়ে।

বাস্তবে যা কুৎসিৎ মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে সেই কুৎসিৎ কথা বললেও তা বলতে হবে সুন্দরের মতো করে—যার ফলে কুৎসিৎ কথাও সুন্দরভাবে শোনা যাবে (সুন্দর হয়ে নয়) এবং সুন্দর কথা সুন্দরের মতো শোনাবে। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে আপনার কণ্ঠের মূল স্বর প্রকৃতি থেকে নিয়ে জন্মাতে হবে আর শব্দ অভ্যাস এবং শিক্ষার মাধ্যমেই আয়ত্ত করতে হবে। এছাড়া শব্দকে ভালোভাবে প্রয়োগের জন্যে আপনাকে তালিমও নিতে হবে। কেউ যদি বলেন—আমি অনুশীলন ছাড়াই ভালোভাবে শব্দ ক্ষেপণ করতে পারি, আমি তা বিশ্বাস করবো না। কারণ জেনে হোক, না জেনে হোক আপনি চর্চা করেন—অভ্যাস করেন পরিচালকের কাছ থেকে জেনে—বা বাস্তবের মানুষের বিশিষ্ট স্বরক্ষেপণ রীতিতে লক্ষ্য করে। ক্রমে অনুকরণ করার চেষ্টা করেন তারপব দীর্ঘ অভ্যাসের মধ্য দিয়ে আপনার একটা স্থায়ী নিজস্ব রীতি আপনি গড়ে তোলেন। সুতরাং অনুশীলন ছাড়া, তালিম ছাড়া ভালোভাবে শব্দক্ষেপণ করেন তা আমি বিশ্বাস করি না।

এখন কিভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামে অংশ নেবেন তার সম্পর্কে—কিছু বলা যাক।

প্রথমত, এই ব্যায়াম নিয়মিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সকালে করাই ভালো। তৃতীয়ত, কমপক্ষে প্রত্যেকদিন সকালে এক ঘণ্টা সময় দেয়া প্রয়োজন। চতুর্থত, কোনো বিশেষ কারণে একদিন ব্যায়াম না করলে তারপর দিন যেন ফাঁকা সময়টুকু যথাসম্ভব পূর্ণ করে দেয়া হয়।

১। নিশ্বাস নিন নাক দিয়ে যথাসম্ভব ধীর গতিতে। তারপর শরীরের বিশেষ করে পেটের মধ্যে সেই বায়ু যথাসম্ভব দীর্ঘ সময় ধরে রাখুন। তারপর যে গতিতে নিশ্বাস নিয়েছেন ঠিক সেই গতিতে নিশ্বাস ছাড়ুন মুখ দিয়ে। দেখবেন যে গতিতে বাতাস গ্রহণ করেছেন ছাড়ার সময় তা দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। আপনাকে সময়সীমা ঠিক রেখে ঘড়ি দেখে গ্রহণ-বর্জনের সময় যাতে একই হয় তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। তিন মাস কমপক্ষে অভ্যাস করলে তবেই ফল ভালো পাওয়া যেতে পারে।

২। একই নিয়ম। মধ্যম গতিতে। নিশ্বাস-প্রশ্বাস যতক্ষণ সম্ভব থামিয়ে এবং ঘড়ির দিকে লক্ষ্য রেখে—সজাগ দৃষ্টিতে।

৩। একই নিয়ম, দ্রুত গতিতে।

৪। নিশ্বাস নাক মুখ দিয়ে প্রথমে ধীরে, পরে মধ্যম এবং শেষে দ্রুতগতিতে গ্রহণ করুন যে পর্যন্ত না পেটটি বাতাসে ভর্তি হয়ে যায়। তারপর থামা এবং পরে বায়ুপ্রক্ষেপণ একই নিয়মে।

৫। এরপর মনে মনে প্রথমে দুবার গুণে নিশ্বাস নিন—থামুন—তারপর যে পর্যন্ত শ্বাস নিলেন তারপর আরো পাঁচ এবং যথাক্রমে দশ থেকে ষাট —আশি সেকেণ্ড পর্যন্ত থেমে থেমে নিন।

এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এই অভ্যাসের সময় তাড়াতাড়ি কোনো কিছু করার চেষ্টা করবেন না। এতে ক্ষতি হতে পারে। ধীরে ধীরে একাগ্রতার সঙ্গে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিন ব্যায়াম করে যেতে হবে।

৬। বিভিন্ন গতিতে নাক দিয়ে নিশ্বাস নিয়ে নাক দিয়ে প্রশ্বাস ছাড়ুন।

৭। বিভিন্ন গতিতে শ্বাস মুখ দিয়ে নিয়ে নাক দিয়ে ছাড়ুন।

৮। মুখ দিয়ে শ্বাস নিয়ে নাক দিয়ে ছাড়ুন।

এখানে মনে রাখতে হবে, ব্যায়াম করার সময় প্রথমে নিশ্বাস নেয়ার পরে আপনি বেশী সময় হোলড করতে অর্থাৎ নিশ্বাস-প্রশ্বাসহীন অবস্থায় থাকতে পারবেন না—সে ক্ষেত্রে প্রথমে পাঁচ সেকেণ্ড পরে আর একটু বাড়িয়ে এইভাবে ধরে রাখার সময়টা বাড়াবেন।

৯। খুব মনোযোগ সহকারে যতটা সম্ভব নিশ্বাস নিন নাক দিয়ে। হাত রাখুন পাঁজর এবং পেটে। অনুভব করুন নিশ্বাস নেবার সময় পাঁজর এবং পেট কতটা উঠছে ঠিক তেমনি মুখ দিয়ে শ্বাস ছাড়ার সময় অনুভব করুন পাঁজর ও পেট কতটা নামছে। হোল্ড বা ধরে রাখার দীর্ঘ সময় মনে মনে গুনে নিন। এই ব্যায়ামের সময় হঠাৎ করে শ্বাস নেয়া ছাড়া কোনোটাই করবেন না বা জোর করে, তাড়াহুড়ো করে সময় সংক্ষেপ করার চেষ্টা করবেন না। এই ব্যায়ামের সময় বন্ধু কিংবা বাড়ীর লোকের সাহায্য নিতে পারেন সময়ের পরিমাপ করার জন্তে।

নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে শরীর সম্পর্কে দু-চার কথা বলতে হয়। এ বিষয়ে একটু পরে আলোকপাত করার চেষ্টা করছি। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামের শেষ কথা বলে কিছু নেই। নিশ্বাস-

প্রশ্বাসের ব্যায়াম করার সময় নিজের শরীরটা কোথায় কি ভাবে রাখতে হবে অর্থাৎ নিশ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ম জানার পর শরীরের অবস্থান সম্পর্কে কিছু নিয়মকানুন জানা দরকার।

১। প্রথমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে।

২। শিরদাঁড়া সোজা করে অনেকটা পদ্মাসন করে মাটিতে বসে।

৩। সোজা হয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে।

৪। চিৎ হয়ে কোমর থেকে কাঁধ পর্যন্ত বালিশ দিয়ে পিঠ খানিকটা উঁচু করে।

৫। দেহটা সোজা রেখে দাঁড়িয়ে কাঁধ মাথার বাঁ পাশ থেকে সরাসরি ডান পাশে এবং ডানপাশ থেকে বাঁ পাশে এনে।

৬। অনুরূপ কাঁধ মাথা বুক থেকে এগিয়ে এবং যথাসম্ভব কাঁধ মাথা দেহ সোজা রেখে যথাসম্ভব পিঠের দিকে সরাসরি নিয়ে যাওয়া।

৭। কাঁধ এবং দেহ সোজা রেখে মাথা ডান থেকে বাঁ দিকে এবং বাঁ থেকে ডান দিকে ঘোরানো।

৮। কাঁধ এবং মাথাকে দেহ ঠিক রেখে গোল করে ঘোরানো।

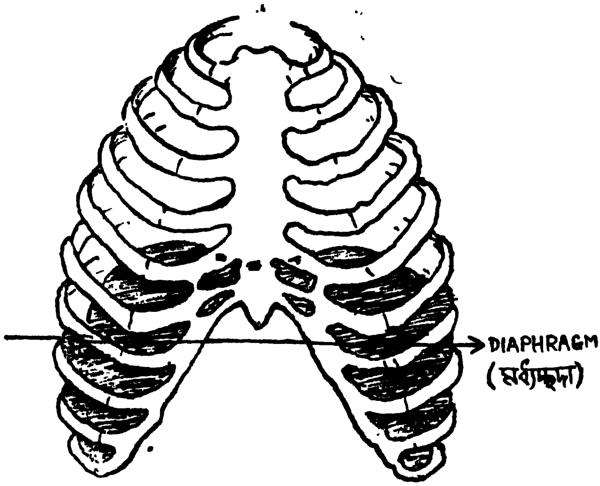
৯। সোজা হয়ে বসে পা জোড়া অবস্থায় পা ছড়িয়ে পা পর্যন্ত মুখ এনে এবং পা থেকে মুখ নিয়ে আবার সোজা হয়ে থাকা।

ওপরের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের যে নিয়মগুলো দেয়া হয়েছে ক্রমান্বয়ে তা অভ্যাস করতে হবে। অভ্যাসের শুরুতে হয়তো আপনি একদিনে সব অভ্যাসগুলো করতে পারবেন না—সময়ের অভাবে। এবং একসঙ্গে সব বিষয় অভ্যাস না করাই ভালো। আস্তে আস্তে ক্রমান্বয়ে অভ্যাস করতে হবে—চট করে অনেক কাজ করতে গেলে আপনার অজান্তে আপনি হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

এই অভ্যাসের আগে আপনার শারীরিক কাঠামোর কথা ভাবতে হবে। ব্যায়ামের সময় শরীরকে খুব নমণীয় রাখতে হবে। আড়ষ্টতা নয়—স্বাভাবিক হতে হবে। আপনাকে অনুভব করতে হবে—আপনি ভারী পদার্থ নন। আপনি যখন ব্যায়াম করবেন তখন মনের একাগ্রতাকে কাজে লাগাতে হবে। কোনো কারণে শরীরের মাংসপেশীকে শক্ত করার চেষ্টা করবেন না। শক্ত করলে সব বিষয়টা কঠিন হয়ে উঠবে। যখন ব্যায়ামে অংশ নেবেন তখন দেহের প্রতিটি মাংসপেশী যেন স্বাভাবিক থাকে আপনি যেন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন

পেশীতে যেন টান না পড়ে। দ্বিতীয়ত, কিছুক্ষণ ব্যায়াম করার পর প্রতি ক্ষেত্রে আপনাকে বিশ্রাম নিতে হবে। তারপর আবার শুরু করবেন। তৃতীয়ত, প্রতিটি ব্যায়ামের সময় শরীর এবং স্বর প্রয়োজনের গতিপ্রকৃতি অর্থাৎ প্রক্রিয়া ঠিকমতো হচ্ছে কি না তা গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রাথমিকভাবে স্বর-সাধনা সম্পর্কে কিছু বলা হলো। তবে এ বিষয়ে লিখে শেখার চেয়ে—পড়ে শেখার চেয়ে—চোখে দেখে শেখা খুবই প্রয়োজন। কিন্তু চোখে দেখে শেখার জায়গা এদেশে কোথায়? সুতরাং সংক্ষিপ্ত হলেও দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হচ্ছে। এর পরের পর্যায়ে স্বর ও শব্দ ক্ষেপণ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।



ওপরের ছবিটা দেখুন—আমাদের দেহের ভেতরে কল-কব্জাগুলি কেমন-ভাবে থাকে। স্বরসাধনায় 'ডায়াফ্রামের' কথা অবশ্যই মনে রাখবেন।

এবার দেহে বায়ু ধারণ বিষয়ে এবং তার সম্পর্কে আরো প্রচলিত কিছু অভ্যাসের কথা উল্লেখ করবো যেগুলি স্বর-সাধনার পক্ষে খুবই উল্লেখযোগ্য।

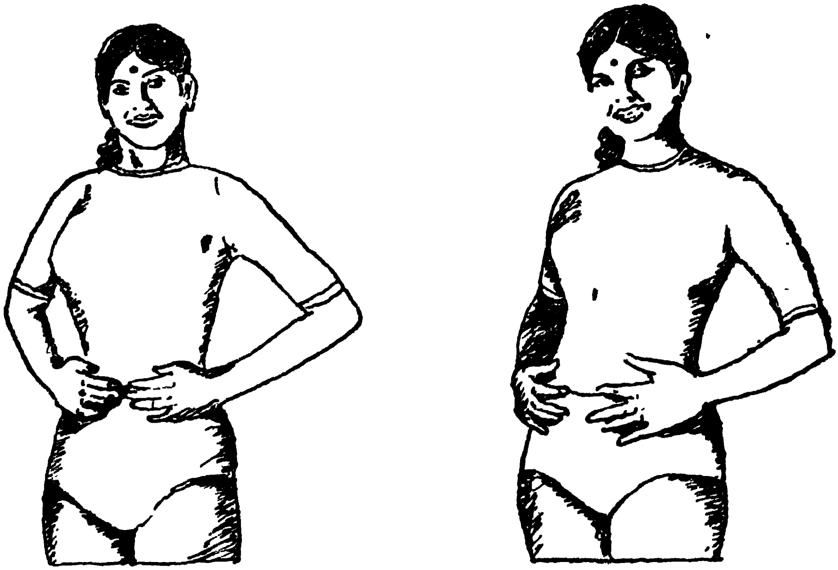
আমরা বায়ু বা বাতাস গ্রহণ করি সাধারণভাবে দু'দিক দিয়ে। মুখ আর নাক দিয়ে। ছাড়ার সময় সংখ্যাটা দাঁড়ায় তিনে। যেমন—১। নাক ২। মুখ ৩। গুহ্যদ্বার। অভিনয়-শিল্পীর পক্ষে নাক মুখ সচেতন হওয়াই ভালো।

প্রথমত, যদি বলা হয় তাড়াতাড়ি এক চোট দম নিন তো। নাক মুখ দিয়ে বাতাস নিতে গিয়ে কেউ কাঁধ উঁচু করেন। কাঁধ উঁচু করে বাতাস

নেয়াটাকে 'সোলডার ব্রিদিং' বলে। কেউ আবার বুক উঁচু করে বাতাস নেন —এই প্রক্রিয়াকে 'চেস্ট ব্রিদিং' বলে। কিন্তু এর কোনোটাই ঠিক নয়। বাতাস গ্রহণের ক্ষেত্রে এই দু'টি প্রক্রিয়া বাতিল করতে হবে।

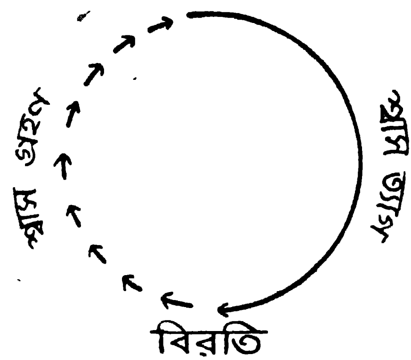
পেট ভর্তি দম নেয়াকে 'ডায়াফ্রাম ব্রিদিং' বলে। মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রে 'ডায়াফ্রাম ব্রিদিং' সবচেয়ে ভালো প্রক্রিয়া। ঐ যে আমরা অনেক সময় বলি —আরে নাভিমূল থেকে বল না! ওটা আর কিছুই নয়। ডায়াফ্রাম ব্রিদিং-এর একটা শৈল্পিক প্রকাশ।

এই প্রক্রিয়া নিজের আয়ত্তে আনতে গেলে গভীর মনোযোগের প্রয়োজন হবে। নাক বা মুখ দিয়ে বাতাস গ্রহণ করার সময় শরীরের অন্যান্য প্রত্যঙ্গগুলি অচল হয়ে থাকবে। বাতাস গ্রহণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে এবং মনোযোগসহ পেটের ভেতরে (মধ্যচ্ছদা) তা নিতে হবে ধীরে ধীরে। প্রথমবারে পেট দেখবেন চুপসে যাবে বেলুনের মতো। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। পেট ক্রমশঃ বাতাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ফুলবে। ছবির দিকে লক্ষ্য করুন—বিষয়টা পরিষ্কার হবে। ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ অভ্যাসের পর বাতাস নেয়া সম্পর্কে আপনি অভিজ্ঞ হয়ে উঠবেন।



এরপরে আর একটি বিষয় সম্পর্কে বলবো। পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার দিন থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষ বাতাস নিচ্ছে আর ছাড়ছে। যেইমাত্র শরীরে বাতাস নেয়া-ছাড়া শেষ হবে সঙ্গে সঙ্গে আপনার

জীবন-নাট্যও শেষ হলো। অধিদেবতার এ এক অদ্ভুত লীলা। এই বাতাস নেয়া-ছাড়াটা জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে চলে আসছে আপন নিয়মে। কিন্তু আপনি যখন মানুষ হয়েও অভিনয়-শিল্পের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করতে চাইছেন তখন এই অজ্ঞাত বস্তু সম্পর্কে সচেতন হয়ে এর বিজ্ঞান-সচেতন দিকটার কথা ভাবতে হবে। প্রকৃতি যা নিয়ম দিয়েছে তা অনেকটা এই রকম



অর্থাৎ আস্তে আস্তে শরীরে শ্বাস গ্রহণ করা এবং দ্রুত ছাড়া। কথা বলার সময় এবং নীরবতার সময়ও এটা আমাদের অজান্তে ঘটে আসছে। কিন্তু অভিনয়-শিল্পীরা বাতাসকে নিজের আয়ত্তে আনার জন্যে ঠিক উল্টো প্রক্রিয়া গ্রহণ করবেন। যেমন—দ্রুত শ্বাস নেয়া—আস্তে-আস্তে শ্বাস ছাড়া। আস্তে আস্তে কারণ—সংলাপ সৃষ্টির মধ্যে মাধুর্য আনার জন্য আপনি কোথাও বিরতি—কোথাও শব্দের ওপর আঘাত করবেন—কোথাও আবার দীর্ঘ বিরতি দিয়ে এক সঙ্গে অনেকগুলি শব্দ শ্রুতিগ্রাহ্য করে শব্দ ক্ষেপণে বৈচিত্র্য আনবেন। কাজেই দ্রুত দম নেয়ার ব্যাপার একটা আছে—তা অভিনয়ের সময়ে—নইলে দম যদি ধীরে ধীরে নেন তাহলে কথা দ্রুত বলতে হবে—শিল্পীর পক্ষে তা অমার্জনীয়। দ্রুত এবং অবকাশমতো শ্বাস নেয়ার অভ্যাস অভিনয়-শিল্পীর পক্ষে অপরিহার্য এক শিক্ষা।

শুধু দ্রুত শ্বাস নেয়া নয়—দম নেয়ার পর আপনাকে একটা বিরতি দিতে হয়। বিরতির শেষে আবার বাতাস ছাড়ার প্রশ্ন। তবে এই বিরতি যুক্তি বা বাস্তবতার সঙ্গে যেন সাযুজ্য রক্ষা করে।

এই বাতাস নেয়া-ছাড়ার অভ্যাস সম্পর্কে এই কথাটা মনে রাখুন।

পুকুরে

ভারতীয় যোগীরা 'পূ' অর্থে পূরক। 'কু' অর্থে কুম্ভক (Hold) বা ধরে রাখা। আর 'রে' অর্থে রেচক বা ছাড়াকে বোঝাতে চেয়েছেন। অভ্যাসের সময় সাগর নদী না ভেবে 'পুকুর'কে মনে রাখলেই চলবে।

বাতাস নেয়া-ছাড়া বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা বাড়লে শব্দ ক্ষেপণ বিষয়টা আপনার আয়ত্তের মধ্যে আসবে আপনা হতেই। আপনি অভিনয় করতে করতে হাঁপিয়ে পড়বেন না। গলা ভাঙবে না। শরীরটাও সুস্থ থাকবে। আপনি শেষ দর্শককেও আনন্দ দান করতে পারবেন সব সংলাপ সুন্দরভাবে প্রয়োগ করে। সবচেয়ে বড় কথা দমহীন মানুষ উচ্চ অভিনয়-শিল্পী হিসেবে কখনোই প্রতিবাচ্য হতে পারে না।

দম যখন বাড়াতেই হবে তখন নিজে নিজে পরীক্ষা করুন।

যে-কোনো একটি বাঁশি নিয়ে একই পর্দায় বাজান।

কিংবা,

একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে একপেট দম নিয়ে সেই বাতির শিখাকে একই দিকে ফুঁ দিয়ে তার মেজাজ এবং গতি ঠিক রাখুন।

অথবা,

দেয়ালে এক টুকরো পাতলা কাগজ রেখে ফুঁ দিয়ে সেই কাগজকে ধরে রাখুন—যতক্ষণ সম্ভব।

প্রথমে নিশ্বাস-প্রশ্বাস সচেতন না হয়ে প্রতিটি অভ্যাস করে সময় মেপে রাখুন। তারপর প্রতিদিন সাধনা এবং অনুশীলন করার পর আবার সময় মাপুন। এইভাবে তিন মাস অনুশীলনের পর আপনি এই সাধনার ব্যবহারিক দিকের উপযোগিতা সম্পর্কে নিজে নিজেই ফল প্রকাশ করতে পারবেন। তবে তিন মাস পর বাতির শিখা যদি গতি পরিবর্তন করে—বাঁশি যদি পর্দার বাইরে গিয়ে অন্য পর্দায় ওঠানামা করে—আর পাতলা কাগজের টুকরো যদি ছুট করে দেয়াল ছেড়ে মাটিতে পড়ে যায় তাহলে সাধনার ক্ষেত্রে—অনুশীলন ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কোথাও ফাঁক বা গলতি থেকে যাচ্ছে এ বিশ্বাস সম্পর্কে বিশ্বাসী হতে হবে নিজেকেই।

ভড়ং, লম্ফঝম্প, তর্ক দিয়ে এ শিক্ষা শুরু করা যায় না এবং এই শিক্ষার এক কথা, শেষ কথা এবং চূড়ান্ত কথা—'এ শিক্ষার শেষ নেই।'

এখন স্বরক্ষেপণের রীতি সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোচনায় বসা যাক। অনেক বিজ্ঞ মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাস কথা দু'টির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে তর্ক করেন। আমি শ্বাস-প্রশ্বাস বলতে ইংরেজী 'ব্রিদ-ইন' আর 'ব্রিদ-আউট' শব্দটিকে ব্যবহার করতে চাই তর্ক এড়ানোর জন্য।

সরলকথা বায়ু স্বরযন্ত্রের (vocal cord) সংস্পর্শে এসে শব্দের সৃষ্টি করে। এই শব্দের প্রকাশ ঘটে মুখ এবং নাক দিয়ে এবং কখনো একসঙ্গে মুখ এবং নাকের মধ্য দিয়ে। মূলতঃ ঠোঁট, জিভ মুখের নরম অংশের সাহায্যে। ছন্দসৃষ্টির কাজ এই ঠোঁট ও জিভের সংকোচন, সংঘর্ষণের ফলে ঘটে থাকে। নাসিকা গহ্বরও ছন্দসৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করে। এছাড়া তালু, দাঁত এবং তালুর শেষে অর্থাৎ মুখের ভেতর ওপর ভাগের পেছন দিকে নরম অংশও শব্দসুষমা এবং ধ্বনি মাধুর্যে বাড়াতে সহায়কের ভূমিকা নেয়।

জিভ এবং ঠোঁটের ব্যায়ামের সাহায্যে তাদেরকে নমনীয় করতে হবে। দাঁত, তালু শক্ত। কাজেই তাদেরকে নমনীয় করার প্রশ্নই উঠছে না। তবে শক্ত হলেও দাঁতের পাটিকে ওপরে, নিচে এবং পাশে সরিয়ে কিছু ব্যায়াম করা যেতে পারে।

যে-কোনো অভিনেতার পক্ষে তার মুখ, নাক থেকে শুরু করে ঠোঁট, জিহ্বা, চিবুক পর্যন্ত সমস্ত জায়গাটিকে নমনীয় রাখতে হবে। নমনীয় করার সহজ রীতি এই রকম।—

১। ধরুন 'অ' বর্ণটা যথাসম্ভব মুখ সংকোচন করে তারপর ছড়িয়ে উচ্চারণ করুন। শব্দের পর্দাও সরু থেকে মোটা করতে হবে ক্রমান্বয়ে।

২। এরপর ক্রমান্বয়ে বড় করে—স্থির হয়ে বসে, দাঁড়িয়ে, শুয়ে উচ্চারণ করুন।

অ—আ—ই—ও

৩। ক্রমান্বয়ে ওপরের শব্দগুলি নিম্ন থেকে উচ্চ পর্দায় ওঠান একপেট দম নিয়ে। যেমন—

অ > অ > অ > অ

৪। একই ভাবে উচ্চ থেকে নিম্ন পর্দায় নামান। যেমন—

ই < ই < ই < ই

মনে রাখবেন, কোনো কারণে দম থামাবেন না—নিজের কানকে বিশ্বাস

করবেন—স্বর ক্ষেপণের সময় স্বর ওঠা-নামা করছে কিনা লক্ষ্য রাখবেন। একই স্বরের সঙ্গে অন্য ধরনের স্বর এসে যুক্ত হচ্ছে কিনা তাও লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫। যে-কোনো একটি স্বর কণ্ঠে একই পর্দায় ধরে রাখুন। উঁচু নিচু যেন না হয় তার দিকে লক্ষ্য বিশেষভাবে রাখবেন।

৬। একই পর্দায় স্বরক্ষেপণ করার সময় আলাদাভাবে শ্বাস না নিয়ে ধ্বনি ও শব্দের ওপর শ্বাসাঘাত করুন।

৭। সরু থেকে শুরু করে একই দমে উচ্চ পর্দায় স্বর তুলে আবার সরুতে মিলিয়ে দিন।

৮। বিভিন্ন শব্দকে ঠোঁটের (মুখ) বিভিন্ন অংশ দিয়ে প্রক্ষেপ করার চেষ্টা করুন। এখানে মুখের তিন অংশের কথা বলতে চাইছি। যেমন—

মুখ

ডান দিক	সামনের অংশ	বাম দিক

৯। এরপর একটু আত্মস্থ হয়ে মুখের ওপরে ঠোঁটের অংশ বিভিন্ন দিকে সংকোচন, ওঠা-নামা অর্থাৎ বিকৃত করার অভ্যাস করুন—মুখের ওপরের নিচের অংশকে নমনীয় করার জন্যে। সঙ্গে নাককেও সংগী করতে পারেন। অবিশ্যি না করলেও আপনার অজান্তে নাকও আপনার ব্যায়ামের সংগে অংশ নেবে।

১০। বিভিন্ন ধরনের মানুষের কথাবার্তা, গভীর মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করুন। লক্ষ্য করুন এবং মনে রাখুন কোন্ মানুষটি কিভাবে কথা বলছে, কোথায় জোর দিচ্ছে—উঁচু-নিচু পর্দায় শব্দকে ওঠাচ্ছে-নামাচ্ছে এবং কোথায় কতোটুকু থামছে। আপনার অনুশীলনের সময় কান আপনার পরম বন্ধুর মতো কাজ করবে। যার কণ্ঠস্বর ভালো নয় তার কথাও শুনুন। বিচার করুন কোথায় তার ঘাটতি আছে বা বাচনভঙ্গি কি কারণে কোথায় নিষ্প্রাণ হয়ে উঠেছে।

১১। দুই নাক দিয়ে মুখ বন্ধ রেখে স্বর ক'রে শব্দক্ষেপণ করুন। কখনো এক নাক বন্ধ ক'রে অপর নাক দিয়ে এবং অপর নাক বন্ধ ক'রে অন্য নাক দিয়ে শব্দক্ষেপণ করুন।

১২। শব্দ বা স্বর শাসনের জন্তে খোলা মুখের সাহায্যে প্রাণায়ামকে আশ্রয় করতে পারেন। নিচের ছবিটা দেখুন।



মোটামুটিভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামের জন্তে যে রীতিনীতির কথা উল্লেখ করেছি, স্বরক্ষেপণের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম প্রযুক্ত করতে পারেন শুধু স্বরক্ষেপণের সময় স্বরযুক্ত হবে শ্বাস ছাড়ার সময়।

কণ্ঠস্বরের দিক থেকে শিল্পীর ছাড়পত্র পেতে গেলে অনুশীলন পর্বে যাবার সময় আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে আপনি অন্য অভিনেতা বা বিশেষ মানুষের দ্বারা প্রভাবিত কিনা। কথা বলার সময় ই, এ্যা, হুঁ, আচ্ছা ইত্যাদি জাতীয় কোনো মুদ্রাদোষ আছে কি না। কথা বলার সময় কোনো কৃত্রিম অনুকরণে প্রবৃত্ত না হয়ে স্বাভাবিকভাবেই স্বরসাধনা করলে ভালো—তাতে মৌলিকতা থাকবে। অনেক সময়. অনেকে প্রখ্যাত অভিনেতাদের কণ্ঠস্বর নকল এমনকি বাচনভঙ্গি পর্যন্ত নকল করার চেষ্টা করেন অনেক পরিশ্রম ক'রে। তাতে আপনার পরিশ্রম পণ্ড হবে—আপনার নিজস্বতা খুইয়ে আপনি তখন অপরের মুখোস পরে চলবেন।

এর আগে অভিনয়-শিল্পীর কণ্ঠস্বর ও স্বর-সাধনা নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে। এখন কণ্ঠস্বর সম্পর্কে আরো দু-একটা কথা বলবো তারপর ধারাবাহিকভাবে অভিনয়-শিল্পের অনুশীলনের বিষয় আলোচনা করবো।

এদেশে স্বরক্ষেপণের রীতি নিয়ে এপর্যন্ত তেমন আলোচনা হয়নি। এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার চেয়ে ব্যবহারিক ও শরীর নিয়ে দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা হলে উপকার হয় বেশী।

মোটামুটিভাবে শব্দক্ষেপণের রীতিকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

১। **ঠোঁট ও জিভের সহযোগে**

২। **নাভিমূল থেকে**

৩। **নাক দিয়ে**

৪। **মস্তিষ্ক ছুঁয়ে নাক, জিভ, ঠোঁট সহযোগে**

৫। **ফিসফিস করে**

শুধু ঠোঁট ও জিভ অর্থাৎ লিপটাং সচেতন শিল্পীরা বেতার-নাটক, ছায়াছবির অভিনয়ের উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন। কিন্তু সার্থক মঞ্চাভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের পক্ষে উল্লিখিত পাঁচ রীতির সার্থক সম্মিলন না ঘটলে চলবে না। প্রত্যক্ষভাবে শিল্পীদের গোটা দেহটাকে দর্শকদের সামনে হাজির করে নির্দিষ্ট দূর পর্যন্ত দর্শককে শিল্পসম্মতভাবে আকৃষ্ট করতে হবে—আর এই আকৃষ্ট করার কাজকে ত্বরান্বিত করতে গেলে প্রত্যেক রীতি সম্পর্কে সজাগ অভ্যাসে অভ্যস্থ হয়ে পাদপ্রদীপের আলোকে এসে দাঁড়াতে হবে। আর প্রতিটি রীতির সম্মিলন ঘটলে ছায়াছবি থেকে শুরু করে যাত্রাদলেও আপনাকে কেউ আটকাতে পারবে না। তাই বাস্তবে দেখা গেছে খুব কম সংখ্যায় শিল্পী আছেন যাঁরা মঞ্চজগৎ থেকে চিত্রজগতে গিয়ে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন।

উল্লিখিত বিষয়ের প্রতিটি বিষয়ের গভীরে যাবার আগে প্রথমে সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করতে চাই, বিষয়কে একঘেঁয়েমী থেকে মুক্ত করার জন্যে।

এছাড়া আর একটা কথা এ প্রসংগে মনে রাখা দরকার বিশেষভাবে। অনেকে অভিনয় শিক্ষার ব্যাপারে ভাষাগত অভিজ্ঞানকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিতে চান। কিন্তু আমি মনে করি প্রাথমিকভাবে প্রশিক্ষণে উত্তরণের জন্যে ভাষা খুব একটা সমস্যা নয়। ভাষার আগে আত্মগত উপলব্ধিকে সক্রিয় করা এবং সেই সক্রিয়তাকে প্রকাশ করার কৌশল আয়ত্ত করা সবার আগে প্রয়োজন। ইংরিজিতে যাকে 'ইনারম্যানস কোয়ালিটি এণ্ড টেকনিক্যালিটিস' বলে সেই বিষয়ে ধাতস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন উচ্চারণ ভঙ্গিমার পরিচিতি হওয়া প্রয়োজন। নাট্যশিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে ভাষা সমস্যা মূল নয়। পৃথিবীর যে-কোনো দেশের মানুষ প্রাথমিক প্রয়োগ-পদ্ধতি বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করে ভাষাগত বৈচিত্র্যকে নিজের দেশে বসেও আয়ত্ত করতে

পারেন অনায়াসে। কারণ ভাষা নিয়ে সমস্যা কোনো একটা দেশের নিজস্ব ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যা। এ বিষয়ে অধ্যয়নের ব্যাপারটা কিছু পড়াশোনা এবং অনেকটা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানার্জনের পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ।

বাংলা ভাষায় যাঁরা অভিনয় করবেন তাঁদেরকে সাহিত্যিক ভাষা যেমন আয়ত্ত করতে হবে তেমনি অঞ্চলভেদে বিভিন্ন আঞ্চলিকভাষা সম্পর্কে সজ্ঞান এবং প্রকাশোক্ষম জ্ঞানার্জনও করতে হবে।

একথা সত্য যে অভিনয়-শিল্পীর আত্মগত দিকের স্ফুরণ নির্ভর করে একজন মানুষের আবেগ কতোটা আছে এবং কতোটা ভালোভাবে সেই আবেগকে প্রকাশ করতে পারেন তার ভাষার মধ্য দিয়ে।

অভিনেতার কণ্ঠস্বর দিয়ে অভিনয়ের প্রাথমিক কাজ সারা যেতে পারে। কণ্ঠ ভালো হোক কি মন্দ হোক তা যেমন বিচার্য ঠিক সেই রকম সেই কণ্ঠস্বরের প্রকাশে কতোটা মাধুর্য আছে অর্থাৎ কণ্ঠস্বর প্রয়োগে ভাষার সঙ্গে ভাবের কতোটা সমতা রক্ষা হচ্ছে সেটাও বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে। শুধু বেপরোয়া আবেগ প্রকাশ—হট করে থেমে আবার খানিকটা উঁচু নিচু পর্দায় কথা বলা—কথা বলার মধ্যে মাত্রাহীন উচ্চচাপ নিম্নচাপ সৃষ্টি করা একজন যথার্থ শিল্পীর পক্ষে মহৎ কাজ হতে পারে না।

লোক ঠকানো—ধাঁধা দেখানো—ম্যাজিসিয়ানের কাজ। কথা বলা আর তার সঙ্গে যথাযথ আবেগ প্রকাশের যথার্থতাই হলো বড় কথা। বাস্তব শুধু আবেগের জগৎ নয়—মঞ্চ মিথ্যার নামান্তর হলেও সেখানেও একটা নিজস্ব বাস্তবতা আছে—যুক্তি আছে নীতি আছে। কাজেই শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে অভিনবত্বকে মেনে নিলেও তা অবশ্যই যে বাস্তবতাবিরোধী—যুক্তি বা কোনো নৈতিকতার বিরোধী বস্তু তা মেনে নেওয়া কি কোনো প্রখ্যাত শিল্পীর কাজ হতে পারে?

স্বর সাধনার ক্ষেত্রে উপযুক্ত নিষ্ঠা প্রয়োগ করলে কণ্ঠে যেমন ভলিউম সৃষ্ট হবে—তেমন আসবে সুর। অভিনয় করতে করতে শেষের শব্দ কখনো ছেড়ে যাবে না—অর্থাৎ tail dropping হবে—প্রেক্ষাগৃহ থেকে 'louder please' কথাটা শুনতে হবে না। জাত মঞ্চাভিনেতা বা অভিনেত্রী হতে গেলে পূর্বের উল্লিখিত পাঁচ প্রকারের স্বরক্ষেপণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে চরিত্রের ভাবগত বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য রেখে পাঁচ প্রক্রিয়ার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

আবেগ ও প্রকাশ ৮

আমাদের দেহের মধ্যে স্থায়ীভাব এবং অন্যান্য ভাব বা ফিলিং সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো হাসি কতো রকমের? এক কথায় তার উত্তর—৫১ রকমের। কান্নাও তাই। মোটকথা ভাবের পরিবর্তনের মূল সূত্রটা আমাদের হাতে এসেছে।

কি ছায়াচিত্রে—কি মঞ্চাভিনয়ে—কি যাত্রাভিনয়ে—পরিবর্তনশীল আবেগ প্রকাশে কতোজন শিল্পী উত্তীর্ণ? দর্শকের চাহিদাকে একপেশে আর কোণঠাসা করে দেবার চক্রান্তের জন্যে আমাদের দেশের শিল্পীমহল এক একটা নিজস্ব পন্থা বা কেরামতি আবিষ্কার করেন। আর তা যাঁরা পারেন না—বুদ্ধির জোরে তাঁরা বড় শিল্পীর অভিব্যক্তি কণ্ঠস্বরকে নকল করে কায়দা করে দুপয়সার ফায়দা লুটতে চান। শিল্পীরা যেমন নিজেদের স্বকীয়তা প্রকাশের দায়িত্ব বহন করবেন—দর্শকেরা নাট্যশিক্ষা সম্পর্কে দূরদৃষ্ট নয় বলে মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্যকে বা একজন বিশিষ্ট শিল্পীর স্বকীয় কারুকৃতি দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। দোষ দর্শকেরও নয়—দোষ শিল্পীরও নয়। দোষ যদি থেকে থাকে তা হলো নাট্যামোদির—কারণ, এদেশে নাটক হয়—নাট্যশিক্ষা ছাড়া। পুরস্কার দেওয়া হয় পুরস্কার দাতাদের নিজস্ব ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে। উপলব্ধ বিষয়টা উপলব্ধি করার মানুষ কৈ? পুলিশ? আই. এ. এস. অফিসার? নাট্যবোদ্ধা সমালোচক কৈ? তা থাকলে যাত্রাদলের বিজ্ঞাপন পরিমাপ করে সেই অনুযায়ী এদেশে সমালোচনার মান নির্ণয় করা হয় কেন?

থিয়েটার করতে গিয়ে যাঁরা প্রাণ দেয়—সংসার হারায়—জীবনের অমূল্য সম্পদ যৌবনকে অবহেলা করে—তাঁদের নিয়ে ইতিহাস রচনা হয় না কেন ?

ক্রমে ক্রমে মনে হয়েছে নাট্যশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটলে—ব্যবসা জমবে না—অশিক্ষিত পটুগুলো কোথায় যাবে ? সরকার ? সরকারতো এ্যাব্‌স্ট্রাক্ট আইডিয়া। কিন্তু সরকারী পোষ্যরা ? মন্ত্রীবর্গ—দূর গদি যাচ্ছে—তার ওপর সংস্কৃতির শিক্ষা! ভারতবর্ষে I A. S., I. P. S., I. F. S. হয় কিন্তু I. C. S. হয় না অর্থাৎ Indian Cultural Service হয় না। হলে বোধ-হয় এদেশের সংস্কৃতির মান আরো উন্নত করা যেতো—অতীতের অনাবিষ্কৃত বহু মূল্যবান তথ্যকে এতোদিনে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা যেতো। এতে ভারতবর্ষ শুধু গর্বিত হতো না—গর্বিত হতো গোটা মানবজাতি।

যাক সে সব হতাশার কথা। এখন ভাব ও তার অভিব্যক্তির কথায় আসা যাক। অভিব্যক্তি সম্পর্কে কিছু ছবি দিতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু ঈশ্বর বা প্রকৃতি আমাদের জীবদ্দশাতেই আমাদের নিহত করে রেখেছেন। মানুষ প্রজাতি হিসেবে বহিঃরঙ্গের সব কিছু হয়তো মেলে কিন্তু পরিমাপ মতো নয়। দু'টো হাত সব মানুষের থাকে—একটা মাথা—একটা দেহ—দুটি পা—দুটি চোখ ইত্যাদি প্রায়শঃ ক্ষেত্রে মিলে যায়। কিন্তু অন্তর মানুষের সঙ্গে আমাদের সবাইকার প্রচণ্ড রকমের অমিল। মানসিকতায়—কণ্ঠস্বরে—অভিব্যক্তিতে এমন কি মন ও মস্তিষ্কের কাঠামোর দিক থেকে। কাজেই, অভিব্যক্তির সহায়ক একই রকমের সূত্রে গাঁথা কোনো ছবি দেওয়া সম্ভব নয়। যত মানুষ—তত মন—যত মত—তত পার্থক্য। কাজেই একই আবেগ প্রকাশে দু'ই ব্যক্তি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আবেগের প্রকাশ ঘটালে দু'টো ছবি কখনোই এক হবে না—দু'টো আলাদা হবে। তাই এই হিসেবটা বড় গোলমেলে। ঠিক সেই কারণে বোধহয় একই নাটকের একই চরিত্রে রূপ দিতে গিয়ে রস নিষ্পত্তিরদিক থেকে একটা সুনির্দিষ্ট মাত্রার ইংগিত থাকলেও চরিত্র চিত্রণে দেখা যায় আকাশ-পাতাল ফারাক। ফারাক হয়েও দুই সত্তা বৈচিত্র্যময়। সেইজন্যে প্রতিভার আত্মপ্রকাশও নিজস্বতার আপন সৌরভে বিকশিত। এখানেই শিল্পী এক হলেও ভিন্ন—ভিন্ন হয়েও বৈচিত্র্যময়—আর এই বৈচিত্র্যময়তার মধ্যেই নিজস্বতা। আর এক এবং শেষ কথা এই নিজস্বতা মৌল আবেদনে সমৃদ্ধ। তাই প্রতিভার আত্মপ্রকাশ সুন্দর—একক—অদ্বিতীয়।

ঠিক এখানেই বিজ্ঞানের হার—প্রকাশভঙ্গিমায় প্রতিভাধরদের পক্ষে কোনো নির্দিষ্ট সূত্র বাঁধা নেই।

সুতরাং আবেগ আর প্রকাশ অর্থাৎ Emotion এবং Expression সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। শুধু অনুশীলন—সাধনা ও সিদ্ধিলাভ। রসশাস্ত্রে যত রকমের ভাবের কথা বলা হয়েছে তা নিয়মিত অনুশীলন করে নিজেকে নোতুন ব্যক্তিত্বের আড়ালে প্রকাশ করার জন্যে প্রস্তুতি নেয়া সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে পারি। আর বলতে পারি আবেগ-সচেতন হওয়ার জন্যে কি কি বিষয়ে কেমন করে অনুশীলন করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে কিছু কথা। তবে আবেগের যা প্রকাশ ঘটবে তা কিন্তু আপনার দেহের কাঠামো—শরীরের মাংসপেশী—মুখাবয়ব ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে।

এবারে ব্যবহারিক দিক থেকে কিছু কাজের কথায় আসা যাক।

আপনার জগৎ ও জীবন এবং বস্তু বিষয়ে অনুভব করার ক্ষমতা কতোটুকু? আপনার ইন্দ্রিয়শক্তি যতটুকু প্রখর বা প্রবল কেবল ততটুকুই। আর অনুভূতিকে প্রকাশ করার ক্ষমতা কতোটুকু? আপনার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রকাশ করার ক্ষমতা যতটুকু। আবেগের সঠিক প্রকাশ সম্পর্কে সঠিক নির্দেশ দিতে না পারলেও—আবেগ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ে অবহিত করতে পারি। বিশেষ করে আবেগ সৃষ্টির Resowvce যখন পঞ্চ ইন্দ্রিয় তখন এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে active বা সক্রিয় করার একটা দুটো পন্থা সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া যেতে পারে। এই অধ্যায়ের সবিশেষ পন্থাগুলিকে কেউ আবার Inner Technique বা Advance Technique of Acting নামে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

প্রথমে চোখ। জগতের বস্তু, ব্যক্তি, অভিব্যক্তিকে দেখার জন্যে আমাদের সবাইকার দু'টি চোখ আছে। চোখ দিয়ে দেখা—পড়া—সঞ্চয় করা। এই সঞ্চয় মনুষ্যপ্রাণীর সবচাইতে অসাধারণ সঞ্চয়। কারণ, মানুষ এই সঞ্চয়ের ভাণ্ডার থেকে তাকে ব্যক্ত করতে পারে—ভাষায় এবং অন্যান্য শিল্পে। ওখানেই জীব জগতে মানুষ অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম জীব। তার কারণ, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে তাকে সংযত করা, নিয়ন্ত্রণ করা, তাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা এবং সেই নিয়ন্ত্রিত উপলব্ধ বিষয়কে ব্যক্ত করার মধ্যেই শিল্পী জন্মের সার্থকতা।

তা হলে দাঁড়ালো গিয়ে চোখ দিয়ে বস্তু দেখা—তাকে স্মৃতির কোটরে সঞ্চয় করা। অনেক কিছু দেখার তাৎপর্য একজন শিল্পীরপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। শুধু শাদা চোখ নয়—মনের চোখ দিয়ে দেখে সবকিছু স্মৃতিতে সঞ্চয় করতে হবে। সূত্রটা এইরকম।

সঞ্চয়

|

১ শাদা চোখে + ২ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে + ৩ গভীর মনোযোগ সহকারে দেখা + ৪ শেষে প্রকাশ

জগতের দেখা বস্তুকে সঞ্চয় করতে হবে—স্মৃতির ভাণ্ডারকে অফুরন্ত করে তুলতে হবে—অর্থাৎ অভিজ্ঞতা বাড়াতে হবে। সঞ্চয় অফুরন্ত হলে সব সময় সব জিনিস মনে থাকতে নাও পারে। তাই প্রাথমিক অবস্থায় চোখে দেখা অভিজ্ঞতার সঙ্গে মস্তিষ্কের মিতালী ঘটানো। আর এই মিতালী ঘটানো ব্যাপারটা তাৎক্ষণিক কিছু জিনিস নয়। অতএব ধীরে ধীরে এগিয়ে চলুন।

আবেগ-সচেতনতা—জীবনভিত্তিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কিভাবে আপনি আপনার শিল্পীজীবন গড়ে তোলার পক্ষে কাজে লাগাবেন সে সম্পর্কে কিছু অনুশীলনের কথা বলি। নিচের সূত্রটা লক্ষ্য করুন।

Power of Observation + Concentration + Feeling + Imagination + Esthetic sense + Balance + Proportion > Reproduction = Exposition of Art and Character .

ওপরের কথাগুলি মনে রেখে কাজ শুরু করলে ভালো হয়।

তাহলে শুধু দেখা নয়। পঞ্চ ইন্দ্রিয় যা নাকি আবেগ সঞ্চয়ের সহায়ক তার প্রতিটি বিষয় নিয়ে এখন কিছু অনুশীলন করে দেখা যাক।

১। চোখ বা দেখা

(ক) গভীর মনোযোগ সহকারে জগতের সব বস্তুকে দেখুন। তাকে অনুভব করুন। সঞ্চয় করে রাখুন স্মৃতির কোটরে।

(খ) জগতের সব রকম মানুষের—চলা ফেরা—কথা বলার সময় মুখের ভাবভঙ্গিমা লক্ষ্য করুন—শিশু, যুবক, খঞ্জ, বৃদ্ধ, মহিলা, ভিখারী, চোর, বদমায়েস সব রকম মানুষের আচার-আচরণ লক্ষ্য করুন। সবাই ট্রেনে চাপে—বাসে চাপে, পথ চলে, বাজারে যায়, নিজের কর্মক্ষেত্রে যায়। কিন্তু সবাইকার

যাওয়া আপনার যাওয়া এক নয়। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি অভিনিবেশ সহকারে ব্যক্তির আচরণ সক্রিয় অবস্থায় দেখুন। তবে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।

(গ) সারা দিনের দেখা কোনো ঘটনা বা চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে আপনার নিজস্ব নোট বই বা খাতায় লিপিবদ্ধ করুন। যে-কোনো একটা বিশেষ ঘটনা। তা হলে দেখবেন বছর শেষে যদি পাতা উল্টে দেখেন তখন সব কিছু একে একে মনে পড়বে। এতে আপনার অভিজ্ঞতার মূলধন যেমন বাড়বে তেমনি বাড়বে হারিয়ে যাওয়া আবেগকে খুঁজে বের করার এক পরম শক্তি যে শক্তি আপনাকে সৃষ্টির এক পরম আনন্দময় জগতে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করবে।

(ঘ) রাতে শোবার আগে কলম এবং নোট বই মাথার কাছে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। ভোরে বা সকালে ঘুম ভাঙতেই বিছানায় আপনার ব্যক্তিগত একান্ত জগতে—রাতে যদি কিছু স্বপ্ন দেখে থাকেন তাকে মনে করে খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখুন। স্মৃতি-স্মরণের এরচেয়ে প্রকৃষ্ট পন্থা আর কিছু হতে পারে না। স্বপ্ন এলোমেলো বা শুধু রঙ বা ধোঁয়া হলেও নিদ্রা শেষে বাস্তবে ফিরে আসার আগেই এই কাজটি সেরে রাখুন। দেখবেন আপনি নিজে ক্রমশঃ নিজের সজ্ঞান সচেতনতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে উঠছেন।

(ঙ) কথা শিল্পেও চিত্রময়তা আছে। কাজেই নাটক, উপন্যাস, কবিতা কিছু পড়ে ফেলুন। সেই সব চিত্র বাস্তব চিত্র নয় ভেবে যা ভাষার আড়ালে —চিত্র সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে ছবিগুলো পর পর সাজিয়ে কিছু ভেবে নিন।

(চ) সিনেমা, টি. ভি, থিয়েটার দেখুন—কিন্তু কারোর প্রভাব যেন আপনাকে তন্ময় বা বিভ্রান্ত করে না তোলে। আপনি সবাইকার আচরণ সম্পর্কে দৃষ্টি রাখবেন—মাঝে মাঝে সেই সব শিল্পীদের আচরণে কোথায় মাধুর্য সৃষ্টি হচ্ছে লক্ষ্য রাখবেন—কোথায় আচার-আচরণ যুক্তিসম্মত হচ্ছে না তাও লক্ষ্য রাখবেন—এবং পরে সব কথা স্মরণে রেখে কেন হচ্ছে সে সম্পর্কেও নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নেবেন। তারপর চোখে দেখা আচার-আচরণ কি করে যুক্তিগ্রাহ্য শিল্পসম্মত হতো বা হতে পারে সে সম্পর্কে নিজে নিজে react করার মতো ক্ষমতা অর্জন করুন।

২। কান বা শোনা

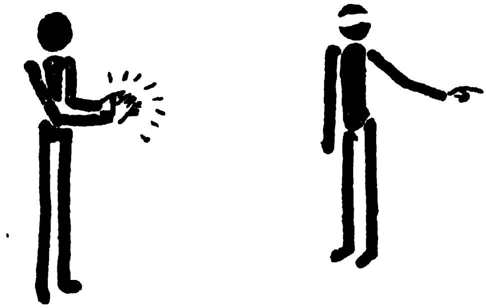
(ক) কোনো ঘরে শুয়ে বা বসে চোখ বন্ধ করে ঘরের ভেতরে কতোগুলো শব্দ শুনতে পান তা নিজে নিজে গুনে নিন। এই শব্দ শোনা দু'মিনিট করুন। দেখবেন অসংখ্য শব্দ আপনার ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

(খ) এবারে ঘর থেকে বাইরের জগতে মনোযোগ দিন। চোখ বুজে ঘরের শব্দ না শুনে বাইরের কতো অসংখ্য শব্দ আছে তা দু মিনিট ধরে সংগ্রহ করুন। প্রথমে ঘরের শব্দ আর বাইরের শব্দ গুলিয়ে যেতে পারে। সেখানেই আপনাকে সচেতনভাবে মনোযোগ দিতে হবে। শব্দ ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা মাথার মধ্যে থাকলে আপনি শব্দ হারাবেন কানকে ঠকাবেন। আত্মবিশ্বাসে ভরসা রেখে এই অনুশীলন নিয়মিত করে যান।

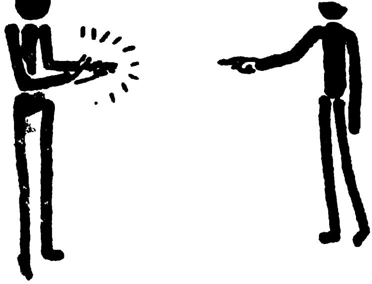
(গ) এরপর বন্ধু-বান্ধব বা কোনো প্রিয়জনকে বলুন বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে শব্দ করুক। আপনি চোখ বুজে শব্দ শুনে সেই প্রিয়জনকে আবিষ্কার করুন।

(ঘ) এখন কাউকে শব্দ করতে বলুন মেঝেতে, হাতে তালি দিয়ে ওপরের দিকে বা যে-কোনো জায়গায়। আপনি চোখ বুজে শব্দের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করুন। যিনি শব্দ করবেন তিনি আপনার অঙ্গুলী নির্দেশ এবং চোখ না খোলা পর্যন্ত শব্দ প্রয়োগের স্থানটি নির্দিষ্টভাবে ধরে রাখবেন (hold)। তারপর চোখ খুলে আপনার কাছ থেকে শব্দ প্রয়োগের নির্দিষ্ট স্থানটি একই সরলরেখায় এবং সঠিক বিন্দুতে হাত ও অঙ্গুলী স্থাপন হয়েছে কিনা লক্ষ্য করুন।

প্রথম ছবিতে হয়নি



দ্বিতীয় ছবিতে হয়েছে



৩। নাক বা ঘ্রাণ নেয়া

(ক) প্রথমে বিভিন্ন বস্তুর গন্ধ সম্পর্কে ধারণা নিন।

(খ) চোখ বন্ধ করে কারোর সাহায্য নিয়ে নাকের কাছে বিভিন্ন বস্তু নিয়ে আসতে বলুন। বস্তুর নাম বলবেন না। আপনার সহযোগী সতীর্থ কখনো চকমাটি, ঘামে ভেজা গেঞ্জি, কখনো সিগারেট, কখনো কয়লা, কখনো পোড়া কাঠি, আবার কখনো পোড়া কাঠ নাকের কাছাকাছি আনবে। আপনি ঘ্রাণ নিয়ে চোখ বুজেই প্রতিটি বস্তুর পরিচয় দিন। তারপর চোখ খুলে মিলিয়ে নিন।

(গ) এবার খোলা চোখে প্রতিটি বস্তুর ঘ্রাণ নিয়ে—আপনি সেই বস্তুর গন্ধ সম্পর্কে অনুভব করুন। তারপর সেই অনুভূতির প্রকাশ কি হচ্ছে একটা আয়নার সামনে লক্ষ্য করুন। শিল্প বাস্তব নয় বলে— অভিনয়ের প্রয়োজনে কতোখানি কল্পনা শক্তির মিশ্রণ ঘটিয়ে সুন্দরভাবে সেই অনুভূতি প্রকাশ করতে পারেন সে সম্পর্কে নিজের চোখে নিজে ধারণা নিন। অভিনয়-শিল্পীকে সবার আগে নিজের কান এবং দৃষ্টি সম্পর্কে বিশ্বাসী হতে হবে পরনির্ভরশীল না হয়ে।

(ঘ) চলমান জীবনে—ধরুন ট্রামে করে শ্যামবাজার থেকে ধর্মতলা আসছেন চিৎপুরের পথ ধরে। লক্ষ্য করবেন—শ্যামবাজারে যা গন্ধ হাতিবাগানে তা নয়—রবীন্দ্র কাননে এসে গন্ধ বদলাবে—মহাত্মা গান্ধী রোড পেরুলে অন্যরকম গন্ধ পাবেন। বাজার করতে গেলেও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন গন্ধ পাবেন।

৪। জিহ্বা এবং ৫। ত্বক

জিহ্বা এবং ত্বকের ক্ষেত্রেও একই রকমের অনুশীলন চলতে পারে। জিহ্বার সাহায্যে বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য এবং বিভিন্ন জীবাণুহীন বস্তু নিয়ে টেস্ট করা যেতে পারে। তবে কোনো রকম ঔষধ কিন্তু নয়।

ত্বক সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে থাকে বলে প্রথমে বস্তুর আকার সচেতন হয়ে বস্তুকে হাতের সাহায্যে অনুভব করা। শরীরের বিভিন্নস্থানে পিন থেকে শুরু করে লোহার পাত বা বল ছুঁয়িয়ে বস্তু সম্পর্কে সচেতন হওয়া যেতে পারে।

এছাড়া চোখ বুজে হাত, পা বা দেহের বিভিন্ন স্থানে বস্তুকে ঠেকিয়ে বস্তুর আকৃতি এবং সঠিক বস্তুটি যে কি তা বলা।

এই সব অনুশীলনের সাহায্যেই যে আপনি রাতারাতি বড় অভিনয়-শিল্পী

হয়ে উঠবেন এমন কথা বলা চলে না। অনুশীলনের পরেও আপনাকে অনুশীলন বিষয়টি সম্পর্কে যেমন রীতিমতো গুরুত্ব দিতে হবে তেমনি আবিষ্কার করতে হবে আরো নোতুন নোতুন পথ। অনুশীলনে উত্তীর্ণ হবার পর সেই উত্তীর্ণ সিঁড়ির দিকে ধাপে ধাপে ওঠার পরে আরো সিঁড়ির কথা চিন্তা করতে হবে। একটা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আপনার আয়ত্ত করা বস্তুর মধ্যে অভিনব ব্যঞ্জনার সৃষ্টিই হবে সার্থক অভিনয়-শিল্পীর অন্যতম কাজ।

আংকিকনিয়মটা কোনো কারণে ভুলে গেলে তা আবার নোতুন করে পুনরায় দেখে নিন। হ্যাঁ নোতুন করে—শুরু করুন—শুরু করুন আবার প্রথম থেকে।

আমাদের রসশাস্ত্রে মোট আটটি স্থায়ী ভাবের কথা বলা হয়েছে। যেমন, রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়। কেউ কেউ আবার নবরস হিসেবে 'শম'কে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। মোট কথা একটা মানুষের মনে যে যে ভাবগুলো জাগরিত হয়—সে নয় হোক, দশ আর আট হোক অথবা নয় আটের দশের সঙ্গে রসশাস্ত্রের তেত্রিশটা সঞ্চারীভাবের সমন্বয়ে হোক—একক বা যৌগিক সেই সব ভাবকে আপনি নিয়মিত অভ্যাসের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রকাশ ঘটাবেন বাস্তবে। আবেগকে উদ্দীপিত করার জন্যে রোজ অনুশীলন করতে হবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হবে।

প্রথম, এক একটি ভাবকে নিজের মনে ভাষার সাহায্যে চিন্তা করে পরিস্থিতি ভেবে ছোট ছোট সংলাপের সাহায্যে ব্যক্ত করুন।

দ্বিতীয়, প্রত্যেক ভাবকে আলাদা করে শুধু শরীরে ছন্দের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে অর্থাৎ ভাষাহীন প্রকাশ করুন।

তৃতীয়, যে-কোনো একটা শব্দের মাধ্যমে মনের ভাবের প্রকাশ ঘটাতে চেষ্টা করুন। ধরুন একটা শব্দ 'উ' বা 'আ'। আপনি প্রচণ্ড রেগে গেছেন এই ভাবটা 'উ' শব্দের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করুন, আপনি দুঃখ পেয়েছেন ভাবটা 'আ' শব্দের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করুন। প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাবের প্রকাশের সময় আয়না সামনে রেখে লক্ষ্য করুন, কোন্ ভাবে মুখের কোন্ অংশ পরিবর্তিত হচ্ছে এবং কেমন ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে।

চতুর্থ, চোখ এবং ভ্রূর জন্যে ব্যায়াম করুন। চোখ খোলা রেখে চোখের মণি বাঁ থেকে ডান, উপর-নিচে, কোণাকুণি, গোল হয়ে ঘোরান। এক ভ্রূ ঠিক রেখে অন্য ভ্রূ ওঠান নামান—ভ্রূ'কে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যান।

এ ছাড়া, বড় বড় অভিনেতাদের অভিনয় দেখুন। বাস্তবের মানুষের

কাছাকাছি আসার চেষ্টা করুন। নিখুঁতভাবে তাঁদের চলাফেরা আচার-আচরণ, ব্যবহার—সেই ব্যবহারের মধ্যে কোথায় কতোটুকু শিল্প সৃষ্টির সহায়ক তা অনুধাবন করুন। জগতে বস্তু, ব্যক্তি কিংবা ভাব অথবা যে-কোনো একটা ঘটনা—যা আপনি নিজের সাদা চোখ দিয়ে দেখবেন শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেই সাদা চোখে দেখাই সব দেখা নয়। এর আগেও বলেছি—সম্ভবতঃ পরেও বলবো—সেই দেখা বস্তু ব্যক্তিকে আরো কত ভিন্নরূপে—অন্যরূপে—নোতুন করে যতক্ষণ আপনারা মানসপটে অন্য দৃষ্টিতে না দেখতে পারছেন ততক্ষণ আপনি আমারই মতো একটা মানুষ মাত্র। শিল্পীর পক্ষে নিজস্ব কল্পনাশক্তির সম্প্রসারণ একটা বিরাট জিনিস।

কিন্তু সেই কল্পনা জিনিসটা কি ? কিছু নয়। জগতে জীবনে যা বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনা যা দেখেছেন প্রতিদিন সেই দেখা সম্পর্কে আপনার মনের জগতে আপনি যে নোতুন নোতুন ছবি আঁকেন সেটাই হলো সাধারণ ভাষায় কল্পনা।

নাটক নিয়ে যখন কাজ করতে যাবেন তখন বাস্তবের হুবহু বলে কিছু জিনিস করেন কি ? সম্ভবতঃ নয়। কিছু-না-কিছু কল্পনার মিশ্রণ ঘটান। মনের জগতে যা ছবি আঁকবেন তাই হলো কল্পনা। বাস্তবে নাটক-বর্ণিত চরিত্রে যা আছে তাকে ব্যক্ত করলে অনুকরণ হবে। এমন কি পরিচালক যা বলতে চাইছেন তা হুবহু ছকে দিলে যথার্থ অভিনেতার কাজ হবে না। আপনি নাট্যকার পরিচালককে আরো কয়েক ধাপ ছাড়িয়ে নিজের প্রতিভার সুষমা মিশিয়ে সেই চরিত্রকে নোতুন ছন্দে, নোতুন রূপে রূপায়িত করবেন। আর তা করা সম্ভব একমাত্র তাঁর পক্ষেই যিনি নিজের কল্পনাশক্তিকে সুদূরপ্রসারী করতে পারেন। কল্পনা, মনোযোগ এবং অনুভূ একজন শিল্পীর নিজস্ব মূল্যবান সম্পত্তি।

অভিনয় এবং নাটকের সমস্ত বস্তু এই পৃথিবীর বাস্তব জগৎ থেকে সংগ্রহ করতে হবে—আপনাদের দুটি সাদা চোখ ছাড়া মনের ভেতরের চোখ দিয়ে জগতকে বা বস্তুকে দেখার দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে হবে—ইংরাজীতে যাকে বলে Power of Observation। বস্তু, মানব চরিত্র, চলমান জগতের হাজার হাজার ঘটনা গভীর মনোযোগ দিয়ে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে দেখতে হবে। পরে সেইসব দেখার জিনিস, চরিত্র, ঘটনাকে নিজের মনের মধ্যে এনে অনুভব করতে হবে। ভবিষ্যতে প্রয়োজনমতো সেইসব স্মৃতির আড়ালে ঢাকা পড়া ঘটনা চরিত্রকে পুনঃ প্রকাশ (Reproduce) করতে

হবে। বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গন্ধ শুঁকুন, চোখ বুজে জগৎ—ব্রহ্মাণ্ডের শত সহস্র শব্দ অনুভব করুন—ইত্যাদি ভাবে সর্ব ইন্দ্রিয় নিয়ে ব্যায়াম করুন রীতিমতো এবং তা করুন অনুভূতি নামক শক্তিকে সম্প্রসারিত করার জন্য। জীবন থেকে—জীবন দেখে জ্ঞান অর্জন করুন। এই সব না করে যদি শুধু পরিচালকের আচরণকে নকল করতে যান, বাস্তবে দেখা মানুষের কার্য-কলাপ, কথা বলা, মুখভঙ্গি নকল করতে যান তা হলে ক্যারিকেচার হয়ে যাবে। নকল করতে গিয়ে প্রাণ ঢেলে দিতে হবে—আপনার নিজস্ব অনুভূতির সাহায্যে।

মনোযোগ বাড়ানোর জন্য প্রথমে শুরু করুন যে-কোনো একটি বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সেই বস্তুকে ভাবা, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষ্য করা অথবা একস্থানে দৃষ্টি রেখে অভিনয়ের অংশ বিশেষ নিজের মনের গভীরে আনা—কিংবা চরিত্রের গভীরে যাবার চেষ্টা করা। অভিনয় শেখার সময় দর্শকসচেতন বা কারিগরি জ্ঞানের সচেতনতাকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো। আপনার অনুভূতি শক্তির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটলে আপনি নিজে নিজেই বুঝতে পারবেন বাস্তবকে, দর্শককে এবং সংশ্লিষ্ট বস্তুকে।

আবেগ মনের মধ্যে ঠিকভাবে বাসা বাঁধলে তার প্রকাশের জন্যে কখনোই উৎকট কৃত্রিমতাকে আশ্রয় করতে হয় না।

অধিকাংশ অভিনয়ে দেখা যায় কোনো আবার আবেগ কম, Expression উৎকট বা অস্বাভাবিক। আবার কোনো জায়গায় আবেগ-ভালো কিন্তু Expression অত্যন্ত নির্জীব। অর্থাৎ আবেগ, প্রকাশ এবং সংলাপের মধ্যে কোনো ছন্দ এবং সামঞ্জস্য ঘটেনি। সুতরাং নবীন অভিনেতা পরিচালকদের প্রথম থেকে এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। আবার দেখুন, আবেগ সংলাপ ভালো, কিন্তু এমন জড়সড় হয়ে কাঠের মতো দাঁড়ানো, হাত রাখতে পকেট হাতড়ানোর যে কী জ্বালা তাতো আমাদের প্রথম মঞ্চে আত্মপ্রকাশের সময় হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছি। নয়কি ?

দেখুন মশাই, সোজা কথা—আগে থেকে প্রস্তুত না হয়ে অন্যের সঙ্গে সমঝোতা না করে মঞ্চের ওপর দুম করে প্যাঁচপোচ মেরে দুর্দাম প্রতিভা-জাত কিছু জিনিস ঘটাতে যাবেন না—না বুঝে বা না বুঝিয়ে অকারণে হাততালি পাওয়ার মুহূর্ত থেকে বিরত হবার চেষ্টা করাই ভালো—যা করবেন তা যেন জীবনধর্মী এবং মানবিক হয়। আর তা হতে গেলে অভিনয়ের সঙ্গে অনুভব (ফিলিং) যুক্ত করতেই হবে। এটা হলো সহজ রাস্তা—মঙ্গলের রাস্তা।

দেহ-সৌষ্ঠব ও অঙ্গসঞ্চালন ৭

এদেশে ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চে এবং ছায়াচিত্রে হিরো বলতে রূপবান একটি সুন্দর যুবককেই বুঝি—যার দেহ-সৌষ্ঠব এক কথায় রমনীমনোলোভা। কিন্তু নাট্যশিল্পে নায়কের এই রকম জাতবিচার আছে না কি? কেন্দ্রীয় চরিত্রকেই তো নায়ক বলবো। রবিঠাকুরের 'কাবুলীওয়ালা' নায়ক হলে মিনিকে নায়িকা বলতে আপত্তি আছে কি? গোঁড়া রক্ষণশীলেরা বলবেন—নিশ্চয়ই! প্রেমের জন্যে লড়াই—জীবনের জন্যে সংগ্রাম করে জয়ী পুরুষকেই তো নায়ক বলবো, জীবনের জন্যে সংগ্রাম কি একজন রোগা পাতলা মানুষ করতে পারে না? বৃদ্ধ বাসচালকটি নায়ক হওয়ায় কি আপত্তি আছে? নাকি বেঁটেখাটো মানুষ নাটকের নায়ক হতে পারে না? হতে পারে। আর তা কেবল নাটকেই হতে পারে। এসব নির্বোধের স্বপ্নের কথা।

নাটক সে বেতার হোক, স্ক্রিন হোক আর মঞ্চ হোক—নায়ক যে কেউ হতে পারে—তার জন্যে বয়সের কোনো সীমা নেই—বয়সের কোনো বাহাদুরী নেই। তবে হ্যাঁ চরিত্রানুগ হতে হবে। যে-কোনো মানুষ নাটকের চরিত্র হতে পারে—আর যে-কোনো মানুষ তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আচার-আচরণে নিজস্বতা বজায় রেখে সত্য প্রকাশ করতে পারে। কারণ, সত্য সব সময় সুন্দর। আপাতদৃষ্টিতে যাকে কুৎসিত লাগে—সে ফুটপাতে হুমড়ি খেয়ে মৃত্যু পথযাত্রী ভিখারীটি হলেও শিল্পের ক্ষেত্রে অসুন্দর। কারণ সেটা সত্য।

সুতরাং বয়স, রূপ, যৌবন, আকৃতি, গায়ের রঙের বিচারে নাটকের

চরিত্রের পরিমাপ হতে পারে না। প্রতিভা রোগা-মোটা-বেঁটে সবার মধ্যেই থাকতে পারে। অভিনয়-শক্তির ওপর নির্ভর করে সেই মানুষটিকে কোন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে সেটাই একমাত্র বিবেচনার বিষয় হতে পারে।

প্রকৃতি যা দেয় তার বেশী অতিরিক্ত সৌন্দর্য সৃষ্টি করা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। খানিকটা হয়তো সম্ভব—চরিত্রানুগ অংগরচনা এবং সাজসজ্জার মধ্য দিয়ে। দেহ-সৌষ্ঠব রচনা এবং চলাফেরার কথা উঠলে পারস্পরিক সূত্রে কয়েকটি বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার। যেমন—

১। দেহের প্রতিটি প্রত্যঙ্গকে নিজের অনুভূতি আর মস্তিষ্কের বশে আনতে হবে অর্থাৎ দেহের প্রতিটি আচার-আচরণ আপনার দেহ এবং মনের বশে থাকবে।

২। দেহকে সুস্থ রাখতে হবে এবং তার জন্য পরিমাপ ও প্রয়োজনমতো নিয়মমাফিক খাদ্যাভ্যাস প্রয়োজন।

৩। নিয়মিতভাবে খালিহাতে ব্যায়াম করা প্রয়োজন।

৪। শরীরের মাংসপেশী যাতে শক্ত না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে শরীরের বিভিন্ন অংশ যাতে নমনীয় হয় তার জন্য ব্যায়াম করা উচিৎ।

৫। মঞ্চাভিনয়ে মুখের অভিব্যক্তির প্রাধান্য যাকে বলে—ভ্রূ, কপাল, চোখ, ঠোঁট এবং গোটা মুখ নিয়ে বিভিন্ন রকমের অভিব্যক্তির অভ্যাস করা অর্থাৎ মুখের মাংসপেশীকে সক্রিয় ও নমনীয় রাখা সর্বদা একান্ত আবশ্যক।

৬। আড়ষ্ঠ হওয়া নয়—প্রয়োজনমতো নিজের দেহকে বিভিন্নভাবে ঘোরাতে হবে।

৭। দেহকে সংযত রেখে হাত পা নিজের ইচ্ছামতো যুক্তিসম্মতভাবে ঘোরানো এবং বিভিন্নভাবে স্থাপন করার অভ্যাস করুন।

৮। ছন্দ বজায় রেখে দেহে balance আনুন। প্রয়োজনে একপায়ে চলুন। একপায়ে দাঁড়িয়ে দেহকে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ঘোরান।

৯। একটা সীমানা চিহ্নিত করে দ্রুত হেঁটে গিয়ে নির্দিষ্ট সীমানায় দ্রুত গিয়ে থামুন দেহ না হেলিয়ে দুলিয়ে।

১০। গোল হয়ে অর্থাৎ একটা গোলাকার কাল্পনিক বৃত্ত সৃষ্টি করে প্রথমে আস্তে তারপর দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করুন। এই চলার সময় কোনো শব্দের সাহায্য নিয়ে কোমর থেকে মাথা পযন্ত সোজা রেখে দেহ নামান এবং বৃত্তের মধ্যে চলমান অবস্থায় উঠানামা করুন।

১১। একপা সোজা রেখে অপর পা যতটা সম্ভব সামনের দিকে এবং যতটা সম্ভব পেছনের দিকে নিয়ে যান। শরীর যেন কোনো ক্ষেত্রে বেঁকে বা দুলে হেলে না যায়। তারপর অন্য পায়ে একইভাবে অনুশীলন করুন।

১২। একপায়ে ভর দিয়ে অন্য পা হাতের দিকে প্রসারিত করুন। অন্য পা সোজা রেখে অপর পা-কে হাতের দিকে প্রসারিত করুন। হাত দেহের সঙ্গে থাকবে।

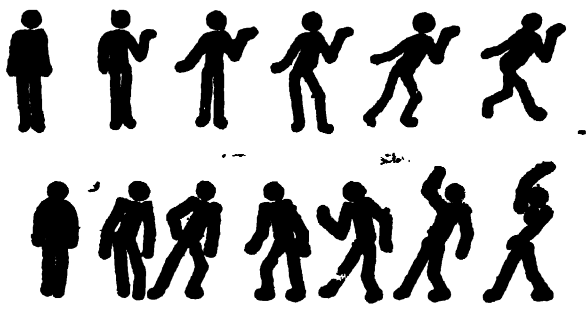
১৩। একপায়ে ভর দিয়ে যে দিকে পা ফেলা থাকবে সেই পায়ের সাহায্যে দেহটা ঘুরিয়ে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনুন। এই ঘোরার সময় দেহ হেলবে না বা দুলবে না।

১৪। বিভিন্ন অভ্যাসের মধ্য দিয়ে হাতের সঙ্গে পা—পায়ের সঙ্গে হাত এবং উভয়ের সঙ্গে দেহের একটা ব্যঞ্জনাময় ছবি সৃষ্টি করুন।

১৫। শরীর বা মুখের মাংসপেশী শক্ত বা Rigid থাকলে দিশি সরিষার তেল দিয়ে শক্ত অংশ ম্যাসেজ করুন—প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

১৬। শরীরকে চালিত করার জন্য নিজে নিজে কিছু কিছু অভ্যাস করুন।

ছবিগুলোর দিকে তাকান :



অনেকক্ষেত্রে মঞ্চে দেখা যায়—অভিনয় করার সময় শিল্পীর অনেক সময় এক-

হাত নির্জীব, অন্য হাত অকারণে ওঠানামা করে। হাত-পা নিয়ে অনেক সমস্যা। এমনকি সংলাপ না থাকলে মঞ্চের নিচের দিকে তাকিয়ে থাকা এবং অকারণে চলাফেরা করা মোটেই শোভনীয় নয়। মঞ্চভীতি কাটানোর জন্য মঞ্চকে আগে চিনতে হবে জানতে হবে। মঞ্চকে নিজের দখলে রাখতে হবে। অনেকের কারণে-অকারণে ঘাড় ওঠানামা করে। কেউ আবার সংলাপ বলতে গিয়ে ঘাড় উঁচু করে কথা বলেন। অঙ্গসঞ্চালন-ক্রিয়া সংঘটিত হবে চরিত্রের ডাইমেনশন অনুযায়ী। অভিনয় করতে গিয়ে সংলাপ বলার সময় অযথা চলাফেরা করা—অন্য অভিনেতাদের আড়াল করা কোনো কারণেই উচিৎ নয়।

যার শরীরের প্রতিটি অংশ নমনীয় তিনি তত সার্থকভাবে—সহজ পথে স্বাভাবিক অভিনয় করতে পারেন। বাস্তবে দেখা গেছে একজন খুব গম্ভীর চরিত্রের মানুষ মঞ্চে উঠে রীতিমতো ছটপট করছেন। উল্টোদিক থেকে, খুব ছটপটে চরিত্রের লোক মঞ্চে উঠে মিইয়ে যান। অঙ্গসঞ্চালন এবং চলাফেরা নিয়ে আরো কি কি অসুবিধার সৃষ্টি হয় একবার ভাবুন।

মঞ্চের ওপর আপনাকে হয়তো একটা ভারী স্যুটকেশ বয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে স্যাটকেশটি নিতান্তই হালকা। আপনি স্যুটকেশের ওজনকে স্বাভাবিক ধরে অভিনয় করতে লাগলেন। দর্শকরা জানেন আপনি ভারী জিনিস বহন করছেন। সেক্ষেত্রে অঙ্গসঞ্চালন ক্রিয়া ঠিক রইলো না। চলাফেরা এতো অস্বাভাবিক যা ভারী জিনিস বহনের কিছুমাত্র সাক্ষ্য বহন করে না। এজন্যে আপনার অনুভূতিশক্তি ক্ষীণ বিবেচ্য হয়ে আপনি হাস্যাস্পদ হবেন সমগ্র দর্শক সাধারণের কাছে। ভারী জিনিস বহন করতে গেলে জিনিসটা কি এবং কতোটা ভারী তা জেনে নিয়ে সেইভাবে অঙ্গসঞ্চালন এবং চলাফেরা করতে হবে।

আপনাকে বলা হলো আপনি UM-এ দাঁড়ান। আপনি up stage-এ গিয়ে গুলিয়ে ফেললেন ব্যাপারটা—middle-টা কোথা তা ধরতে পারলেন না —তেমনটি হলে চলবে না।

শিক্ষা, চরিত্রের নেচার, বয়স, অনুযায়ী আপনার শরীরের প্রতি অঙ্গ চলবে এবং প্রয়োজনে প্রতি অঙ্গ নীরবে কথা বলবে। আপনাকে আশী বছরের বৃদ্ধের মতো চরিত্র দেওয়া হলো। আপনি চব্বিশ বছরের ছেলের মতো হাঁটতে লাগলেন—কথা বললেন আশী বছরের বৃদ্ধের মতো ভাঙা ভাঙা স্বরে। আশী বছরের চরিত্র হলেই যে কুঁজো হতে হবে তা বলছি না। কতোটা কুঁজো

হবেন তা নির্ভর করবে চরিত্রের গুণগত মানের আর বৈশিষ্ট্যের ওপর। মঞ্চে হয়তো একই অর্থাৎ ঐ আশী বছরের বৃদ্ধের চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে আপনার আচার-আচরণ আশী বছরের মতো নিখুঁত করতে পারছেন—হয়তো কথাও বলছেন আশী বছরের মতো। কিন্তু হস্ত চালনায় দেখা যাচ্ছে আপনি যুবকের মতো বলিষ্ঠ বাহু—আঙ্গুলের দৃঢ়তার প্রকাশ ঘটাচ্ছেন। সেখানে অভিনয় উচ্চাঙ্গের হলেও তা সম্পূর্ণ হলো না। তাই আপনার দেহটাকে কয়েক ভাগে ভাগ করে নিন। তারপর সেই ভাগ অনুসারে আপনি প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়মিত অনুশীলন করুন। সেই অনুশীলনে আপনার কল্পনাশক্তি, অভিজ্ঞতা, মনোযোগ, অনুভূতির অনুপ্রবেশ এবং সংমিশ্রণ ঘটান।

দেহের সমস্ত অংশগুলোকে মোট পনেরো ভাগে ভাগ করা যাক—

১। মাথা থেকে গলা পর্যন্ত ২। গোটা মুখ ৩। চোখ ৪। কপাল ৫। ভ্রূ ৬। ঠোঁট, চিবুক ৭। গলা ও ঘাড় ৮। কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত ৯। কোমর থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত ১০। উরু ১১। পা ১২। পায়ের পাতা ও আঙ্গুল ১৩। শুধু হাত ১৪। বাহু ১৫। হাতের পাতা ও আঙ্গুল

ওপরের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনাকে নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। ব্যায়াম করার সময় মাংসপেশী বা হাড়ের জয়েণ্টে যেন অযথা চাপ না পড়ে তা লক্ষ্য রাখতে হবে। তারপর যে চরিত্রে রূপ দিতে যাবেন সেই চরিত্রের আচার-আচরণ অনুযায়ী আপনি প্রতিটি ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। একটা চরিত্র সৃষ্টি মানে শুধু মনের expression নয়—হাত পা গলা ইত্যাদি সবেরই ছন্দময় অভিব্যক্তি ঘটাতে হবে। ওপরের বিভাজন অনুযায়ী শরী. .ক এবং শরীরের বিভিন্ন অংশকে সঠিক পথে নমনীয় রাখতে হবে। প্রয়োজনে যে-কোনো মুহূর্তে আপনি আপনার শরীরযন্ত্রকে যাতে শিল্প সৃষ্টির জন্য যে-কোনো রূপে সহজেই ব্যবহার করতে পারেন সেদিকে ভালোভাবে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। এককথায়, আপনার শরীরকে আপনার বুদ্ধি এবং মনের আয়ত্তের মধ্যে রাখুন। ছোট ছোট ঘটনার সাহায্যে চলাফেরা থেকে ওঠা-বসা-শোয়া—যত রকমে সম্ভব তা অভ্যাস করুন। খালি হাতে, অভিনয় শেখার জন্যে যে প্রয়োজনীয় ব্যায়াম তা জানার জন্যে যোগব্যায়াম জানা ব্যক্তির সাহায্য নিন। এছাড়া খালি হাতে ব্যায়াম এবং যোগব্যায়ামের জন্যে বাজারে বিভিন্ন ধরনের চার্ট এবং সচিত্র বই পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটু চিন্তা-ভাবনা করে বই

সংগ্রহ করে কাজ শুরু করুন। বিভিন্ন ধরনের চলাফেরা—বাস্তব, সিনেমা, নাটক দেখে বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের চলাফেরা অভ্যাস করুন। হাতের নমনীয়তা রক্ষার জন্যে প্রচলিত মুদ্রার অভ্যাস করুন।

তারপর বস্তু বা property নিয়ে অঙ্গ-সঞ্চালন, চলাফেরা করুন। যেমন এক গ্লাস জল টেবিল থেকে তুলে নিয়ে পান করা। এই ব্যাপারটায় কতগুলো ভাগ আছে দেখুন। প্রথমত—হাত দিয়ে গ্লাস ধরা। দ্বিতীয়ত—মুখের কাছে আনা। তৃতীয়ত—জলপান করা। চতুর্থত—পান-শেষে স্বস্থানে গ্লাসটিকে রাখা। বয়স এবং ব্যক্তি-চরিত্রের রুচি, ক্ষমতা অনুযায়ী প্রত্যেকটি action নিখুঁত হওয়া চাই।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে আপনার মনে প্রশ্ন আনতে হবে—আপনি কোথায়, আপনি কখন, আপনি কেন? এই তিন প্রশ্নের যথাযথ ব্যাখ্যাসহ উত্তরের ওপরে নির্ভর করবে আপনি যে চরিত্রে অভিনয় করতে যাচ্ছেন তার সার্থক রূপায়ণ—জলপান করার সময় আপনি মনে রাখবেন—আপনি কে, কোথায়, কেন এবং কি খাচ্ছেন, কি ভাবে খাচ্ছেন, কেন খাচ্ছেন।

ধরুন, একটি দৃশ্যে সিগারেট খাওয়ার কথার উল্লেখ আছে। এই সিগারেট আঙুলে নেয়ার মধ্যে আপনার চরিত্রের গুণগত মান নির্ভর করবে—সিগারেট ধরানো এবং টানার মধ্যেও। একজন ভাবুক সাহিত্যিক যেভাবে সিগারেট আঙুলে ধরবে—একজন গ্রামের সরল মানুষ কিংবা গুণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ঠিক সেইভাবে সিগারেট ধরবে না, আঙুলে নেবে না। চরিত্রের উপস্থাপনের নিখুঁত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আপনাকে বাস্তবতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে প্রতিটি আচরণ সংঘটিত করতে হবে।

এছাড়া মঞ্চে যে property থাকবে তার সঙ্গে অভিনয় এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের একটা যোগসূত্র থাকে—শুধুমাত্র visual concept প্রতিভাত করার জন্য নয়। দৃশ্যে যা আসবাব বা অন্যান্য জিনিস থাকবে তার সঙ্গে কোন্ চরিত্রের কতটুকু সম্পর্ক তাকে জানানোর জন্যে propertyকেও আপনার কাছে এনে, বা property-র কাছে গিয়ে তার সম্পর্কে ইংগিত করে কিংবা তাকে ব্যবহার করে তার অস্তিত্বকে প্রমাণিত করতে হবে এবং তা প্রমাণিত করার জন্যে প্রত্যক্ষভাবে হোক পরোক্ষভাবে হোক বস্তুর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। অন্যদিক থেকে বলা যায়—যোগসূত্র স্থাপন করতে গেলে নিজের অংগ ও movement সম্পর্কে সচেতন হতে হবে সবার আগে।

এর পরে নিজের অঙ্গকে সঙ্গে নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়াস। গভীর মনীষার সঙ্গে অনুভব করতে হবে—নিজের শরীর আর চলাফেরা বিষয়ে আরো কিভাবে নিখুঁত detail-এর কাজ করা যায়। এই কাজটুকুতে আপনার নিজস্বতা প্রমাণ করতে বেশী করে শরীরকে নমনীয় এবং রমণীয় করার জন্যে relaxation এবং অন্যান্য অনেক টুকিটাকি বিষয়ে শিক্ষা নেয়ার আছে। এ বিষয়ে আগ্রহীরা আমার 'নাটক পরিচালনা' বইটা পড়ে দেখতে পারেন।

মানুষের দেহযন্ত্র বিকল হলে (সে আপনি অভিনেতা হোন আর business magnet হোন) জীবনের সব সাধনা ভেস্তে যাবে এবং যেতে বাধ্য। অভিনয়-শিল্পীরা দেহ সম্পর্কে সজাগ হবেন নিজের তাগিদে। খাদ্য সচেতন, রূপ সচেতন, ভঙ্গি সচেতন, সাজসজ্জা সচেতন হবার আগে দেহ সচেতন হতে হবে। কারণ—অভিনেতার দেহই তো একমাত্র সম্পদ। দেহ দিয়েই তো যত কিছু [illegible]। কাজেই দীর্ঘ সুষ্ঠু জীবন যাপন যেমন-তেমন অভিনয় জীবনের স্বার্থে নীরোগ জীবন নিশ্চয়ই কাম্য—কাম্য দীর্ঘায়ু।

এর জন্য আমাদের যোগীরা অনেক ব্যবস্থা রেখে গেছেন। নাট্য-শিল্পের সঙ্গে প্রযুক্ত এবং শরীর গঠন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব 'যোগাসন'কে আমরা নিশ্চয়ই কাজে লাগাবো। আমাদের যোগাসনকে এখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নাট্য-শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হোচ্ছে। হাজার অজ্ঞতার মধ্যে এখানেই আমাদের স্বকীয়তা—আমরা বিশিষ্ট। যোগাসন সম্পর্কে বাজারে অনেক বই এমনকি চার্ট আছে তা সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় কিছু আসন আয়ত্ত করা যেতে পারে। যেমন, শবাসন, ভুজঙ্গাসন, ধনুরাসন, চক্রাসন, শীর্ষাসন, পদ্মাসন, পবনমুক্তাসন ইত্যাদি। এছাড়া আরো অনেক আসন আছে—নির্দেশ অনুযায়ী নিয়মিত অভ্যাস করলে শরীর যেমন নমনীয় হবে—যেমন রমণীয় হবে—ঠিক তেমনি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত হবার পথ পাওয়া যাবে। দেহ সুস্থ থাকবে—দীর্ঘায়ু হবেন নিঃসন্দেহে।

তবে যাঁদের শরীরে বায়ুচাপজনিত রোগ আছে তাঁরা রোগের পরিপন্থী আসনগুলো অনুধাবন করে সেইসব আসনগুলো নিশ্চয়ই বাদ দেবেন। নইলে হঠাৎ যে ক্ষতি হবে তা জীবনে কোনো ঋণ দিয়ে শোধ করতে পারবেন না।

দেহ সুস্থ এবং নমনীয় থাকার পর আপনি কিছু মাইম অভ্যাস করতে

পারেন। মাইমে অভিব্যক্তি, আবেগ, অঙ্গসঞ্চালন এবং চলাফেরার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজে লাগবে।

মাইম বা মূকাভিনয় যদিও একটি স্বতন্ত্র শিল্প—কিন্তু ইদানিং নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রেও মাইমের পরিচ্ছন্ন ব্যবহার হোচ্ছে। নীরব নাট্য বা silent থিয়েটার কিন্তু মাইমের কাছাকাছি জিনিস—যদিও মাইম নয়।

মাইম ছোট ছোট স্কেচ করে করতে পারেন। আবার ছোট ছোট বা পরিস্থিতি বা ঘটনাকে ব্যক্ত করার জন্যেও করতে পারেন।

মাইম অভ্যাস করার সময় action বড় করতে হবে। কারণ—শ্রুতিগ্রাহ্য কোনো বস্তু মাইমের অঙ্গ নয় বলে কার্যকলাপ, চলাফেরাকে এবং মুখাভিব্যক্তিকে একটু বড় করতে হয়। মূক-অভিনয় বলেই স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবে দৃষ্টিগ্রাহ্যতার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে বিশেষভাবে। এক্ষেত্রে একথাটা মনে রাখতে হবে action খুব একটা দ্রুত হলে চলবে না—যে বিষয়কে প্রতিভাত করার চেষ্টা করা হোচ্ছে তাকে আগে establishকরে তারপর অপ্রয়োজনীয় অথচ সংপৃক্ত actionগুলোকে দ্রুত করা যেতে পারে। এছাড়া অভ্যাসের মধ্য দিয়ে শিল্প সচেতন হয়ে বিশ্বাসযোগ্যভাবে বিষয়ের গভীরে যেতে হবে-গভীরের পর detail-এর কাজে অংশ নিতে হবে।

এই শিল্পের জন্য কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই—চোখে ভালো দেখানো বস্তুকে মনে ধরানোর জন্যে দেহের পক্ষে যতটুকু সম্ভব সার্থক ছবি সৃষ্টি করা। বাস্তবতা বজায় রেখে যিনি যত বেশী ছন্দ ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারবেন তিনি তত উঁচু জাতের মাইম শিল্পী।

মাইমকে যখন নাটকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে নীরব ক্রিয়া বা silent action বললে ভুল হবে না। এই নীরব ক্রিয়ার সঠিক আত্ম-প্রকাশ সম্ভব হবে নাটকের কনটেন্ট বা বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে। নাটকে মাইমের ব্যবহার সম্পর্কে সর্বক্ষেত্রে কিন্তু ঘটনা বা action বড় করতে হবে তার কোনো মানে নেই। নাটকের নিজস্ব গতি অনুযায়ী action-কে দানা বাঁধাতে হবে। তবে Balance and Proportion মেনে নিয়ে পুংখানুপুংখ-ভাবে বৈচিত্র্যময় এবং detail কাজের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। নাটকের সঙ্গে মাইম একজায়গায় একত্রে সন্নিবেশ ঘটাতে গেলে action-এ গতিময়তা ছন্দ ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কিন্তু নাটকের মধ্যে সংলাপ সহ অভি-

নয়ের বাইরে যদি মাইমের ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রে অন্য চিন্তা। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে :

পরিমিতি বোধ+শারীরিক ছন্দ+বস্তুর পরিমাপ এবং পরিমাণ+ঘনত্ব+ওজন+Detail কাজ+ঔচিত্য বোধ+বাস্তবতা +আবেগের সংমিশ্রণ

মাইম শিল্পকে আয়ত্ত করা এবং অভিনয়-শিল্পের কাজে এই শিল্পকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্যে ওপরের সূত্রটা মনে রাখুন।

যাইহোক—মাইম অভ্যাস যে শারীরিক ছন্দ এবং ব্যঞ্জনাসৃষ্টির সহায়কতা অবশ্যই স্বীকার্য। দর্শক সুন্দর ছবি দেখবে—ব্যস!

এই পর্যায়ে আরো দু-একটি বিষয়ে টুকিটাকি কথা বলে এখনকার আলোচনা শেষ করবো।

কপালের খাঁজ অনুযায়ী মাংসপেশী কোঁচকানো এবং ওঠানো-নামানোর অভ্যাস করুন।

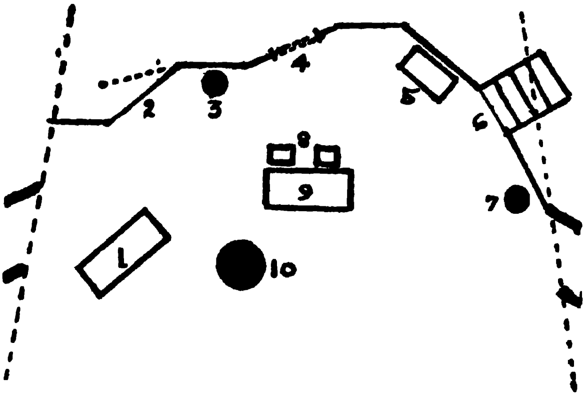
ঠোঁট আলাদাভাবে যতটা সম্ভব মুখের ভেতর এনে দাঁত দিয়ে চেপে ধরুন। ঠোঁট ডান দিক বাঁ দিকে বন্ধ অবস্থায় নিয়ে যান। তারপর মুখ ফাঁক করে ডান দিক বাঁ দিকে নিয়ে যান এবং ক্রমে উঁচুতে নিচুতে আনুন।

এরপরে চোয়ালের ওপরের মাংসপেশীকে চোখের দিকে ওঠান—প্রথমে একসঙ্গে—পরে একটি চোখের মাংসপেশীকে স্থির রেখে অন্যটিকে সক্রিয় করে ওপরে তুলুন—পাশে ঘোরান—এইভাবে মুখের মাংসপেশীকে নমনীয় এবং নিজের আয়ত্তে রাখার জন্য সব রকম অভ্যাস করুন মনোযোগের সঙ্গে।

বড্ড একঘেয়ে লাগছে—নয় কি? আরো কথা বলবো একটু পরে—সাধারণভাবে একটু ধ্যান-ধারণা দেয়ার জন্যেই কথা বলা। দোহাই, ধৈর্য হারাবেন না। এখনো অনেক কথা বলার আছে। ধরে নিন—বর্তমানটাই শুরু।

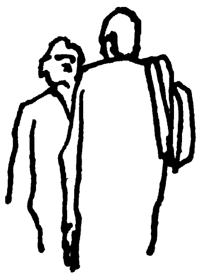
এবারে জিজ্ঞাসা করি—গোটা শরীরটা কাজে লাগাবেন কোথায়? একটি মঞ্চের ওপর। মঞ্চের ওপর একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকবে আপনার চলা-ফেরার জন্যে। আর থাকতে পারে থামবার। আপনার অভিনয়-এলাকা সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করে তবেই মঞ্চে আসতে হয়। নইলে উল্টোপাল্টা ভাবে চলবেন—action ভুল করে নাটকে মাটি করে বসবেন। তাই প্রত্যেক অভিনয়-শিল্পীদের মঞ্চের গ্রাউণ্ড প্ল্যান সম্পর্কে অবহিত হতে

হয়। এতো আলোচনার পর একটা কোনো কাল্পনিক নাটকের একটা মঞ্চ-



পরিকল্পনা বিষয়ে কিছুটা ধারণা দেবার জন্যে ওপরের ছবিটাকে ভালো করে দেখে রাখুন।

1. তক্তাপোষ 2. জানলা 3. টেলিফোন রাখার টেবিল 4. দরজা 5. পিয়ানো বা ডিভান 6. ওপরে ওঠার সিঁড়ি 7. ফ্লাওয়ার ভাস 8. চেয়ার (শোফা) 9. টেবিল 10. নিচু গোল টেবিল।



ধ্বনি ও স্বর শাসন ঃ শ্রুতিগ্রাহ্য বৈচিত্র্য ১০

প্রাকৃত প্রস্তাবে বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনির আশ্রয়েই মানুষ ভাষা সৃষ্টি করেছে। ব্যাকরণের দিক থেকে শব্দকে বিশ্লেষণ করে যা উচ্চারিত হয় পারতপক্ষে তা ধ্বনি (sound) বা বর্ণের (letter) সমন্বয়ে। আসলে ধ্বনি হলো বর্ণের একটি উচ্চারিত রূপ। যেমন 'কবি'। আসলে ক+অ+ব্—ই।

ধ্বনি নির্দেশিত উচ্চারিত হোক আর অনুচ্চারিত হোক সেই প্রতীককে বর্ণ বলতে কোনো আপত্তি থাকা উচিত নয়। কারণ—বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত সাংকেতিক ধ্বনিসমষ্টি হলো ভাষার অন্যতম রূপ।

এখন ক+অ+ব+ই এই চারিটি বর্ণ বা শব্দ (ধ্বনি ?) হ‌ অক্ষর কিন্তু মাত্র দুটি তা হলো—ক+বি।

বর্ণ উচ্চারিত হলে তা ধ্বনি হবে আর ধ্বনি লিখিত আকারে প্রকাশ পেলে তা বর্ণ হবে।

কয়েকটি বর্ণ মিলে একটি ভাব প্রকাশ হলেই 'শব্দ' হয়। ব্যাকরণের এই সামান্য তত্ত্ব বা সূত্রটুকুর কথা মনে রেখে আমরা আলোচনায় প্রবেশ করবো। এই সংগে বাংলা বর্ণ বা ধ্বনির উচ্চারণস্থান অনুসারে সেই বর্ণ বা ধ্বনির শ্রেণীগত পরিচয়টুকু জেনে রাখা ভালো। কারণ ধ্বনিসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রতিটি স্থানকে নমনীয় এবং নিজের আয়ত্তে আনার জন্য অনুশীলন করতে হবে। মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ বই খুলে দেখুন এতে স্কুলে

পড়ার জীবনের কথা মনে পড়বে। কিন্তু কে এখন ব্যাকরণ খোঁজে? চালা কি দিয়ে কি নাটক হয়? তাই কাজের সুবিধার জন্য আবার না হয় নোতুন করেই শুরু করা যাক।

আগে স্বর সাধনা সম্পর্কে বলা হয়েছে বেশ কিছুটা পরিসর নিয়ে। এখন ধ্বনি থেকে অক্ষর, অক্ষর থেকে শব্দ আর শব্দ থেকে শব্দাবলীর সমন্বয়ে সৃষ্ট কাব্যকে নিজের মননশীল ও শৈল্পিক চেতনার মধ্য দিয়ে নিজের শাসনে আনতে হবে। এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার ইচ্ছা আছে। এতে শৈল্পিককুশলতার সঙ্গে প্রতিভার এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন প্রয়োজন হবে—একথা মনে রাখতে বলছি আগে থেকেই।

মঞ্চে উঠে অভিনয় করার সময় আপনি এলোপাথাড়ি কিছু বলবেন না—যা আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুন্ন করতে পারে। স্বর বা শব্দশাসনের দ্বারা আপনি দর্শকের প্রতি নিষ্ঠাবান হবেন। শ্রুতিগ্রাহ্য বৈচিত্র্যকে একটি চরিত্রের পারম্পরিক ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে আরো ব্যঞ্জনাময় করে তুলবেন।

তাহলে দেখা যাক স্বর বা শব্দশাসনের উপযোগিতা কি। তার আগে মনে রাখা প্রয়োজন শব্দ বা স্বর প্রক্ষেপণের রীতি কতো রকমের। চার রকমের তা আগেই বলা হয়েছে। তা হলো—'লিপ্ টাঙ', 'এবডোমেন', 'হেড রেজিস্টার', 'নেইজাল'। এর সঙ্গে যুক্ত হবে 'whispering' যাকে বলে ফিসফিস করে কথা বলা। এই প্রক্রিয়ায় ঠোঁট, জিভ, দাঁত সক্রিয় ভূমিকা নিলেও মূল শব্দ বা শব্দাবলীকে এবডোমেন বা নাভিমূল থেকে এনে ভোকাল কর্ড বা স্বরনালির ওপর জোর দিয়ে শব্দ ক্ষেপণ করতে হবে। মোটামুটি পাঁচ রকমের শব্দ প্রয়োগের রীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলে এবং এই পাঁচ নীতির ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান থাকলে মঞ্চে দাঁড়িয়ে সব সংলাপ একভাবে না বলে চরিত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের রীতি প্রয়োগ করে তার শ্রুতিগ্রাহ্য বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু সর্বপ্রকার রীতির উৎস যে ডায়াফ্রাম তা মনে রাখতে হবে। যেমন—

আমি ভাবছি আজ সন্ধ্যায়—[লিপ টাঙ্]
উঃ বিশ্রী গরম [এবডোমেন]
কেন তোমরা বিরক্ত করছো [হেড রেজিস্টার]
বলছি তো আজ সন্ধ্যায় যাবো [লিপ টাঙ্]

ওপরের সংলাপে বৈচিত্র্য আনা গেছে। 'নেইজাল' বা নাক দিয়ে শব্দ প্রয়োগ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হতে পারে এবং 'ন', 'ম', 'ঁ', 'ন্ব', 'ম্প',

ইত্যাদি বর্ণ যে শব্দের মধ্যে যুক্ত আছে অর্থাৎ নাসিকা বর্ণের উচ্চারণ নাক দিয়ে হয়— তবে গোটা শব্দটা নয়। যেমন পদ্মা নদী।

প দ/দা অঁা [নাসিকা] ন [নাসিকা] দী

শব্দ বা স্বর শাসনের উপযোগিতা অনেক ঃ

১। কথা বলায় একঘেঁয়েমী থেকে মুক্ত হওয়া

২। শ্রুতিগ্রাহ্য করা (যুক্তিসম্মত)

৩। শ্রুতিমধুর বা কথা বলায় মাধুর্য সৃষ্টি করা

৪। শেষের দর্শকটিকে পযন্ত পরিষ্কারভাবে আপনার কথা শোনানো

৫। চরিত্রচিত্রণে বিশিষ্টতা দান

৬। আপনার নিজস্ব ক্ষমতা দেখানোর চেয়ে চরিত্র যা বলতে চাইছেন তা ব্যক্ত করা পরিষ্কারভাবে

৭। শব্দ প্রয়োগের অভিনবত্বে আপনি শুধু সংলাপের সাহায্যে মঞ্চে action ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করতে পারবেন

৮। নাট্য মুহূর্ত রচনার সহায়ক

৯। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—শারীরিক, মানসিক এবং বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কথা বলা ও পরিবর্তন হয় সে সম্পর্কে আপনি সচেতন হয়ে প্রতিমুহূর্তে একটি চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে নোতুনভাবে কথা বলবেন

১০। আধুনিক নাটকে যাঁরা একাধিক চরিত্রে অভিনয় করেন তাঁদের পক্ষে শব্দ শাসন যে কতোবড় বস্তু তা নিজেরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন

১১। অন্য শিল্পী কম দক্ষ হলে আপনি বিভিন্ন পর্দায় বিভিন্নভাবে আপনার সংলাপ বলার বৈচিত্র্য এনে অন্তত: গোটা নাটকটা যাতে ভালোভাবে শেষ করা যায় সে বিষয়ে সক্রিয় এবং সচেতন ভূমিকা নেবেন

১২। কথা বলায় জড়তা থাকবে না

১৩। সংলাপ কখনো খেয়ে যাবে না বা একটি সংলাপের ওপর আর একটা সংলাপ কখনো হুমড়ি খেয়ে পড়বে না কিংবা শেষের কথা হারিয়ে যাবে না

১৪। আপনি জীবন জগৎ এবং শিল্পী জীবনে খ্যাতি অর্জন করবেন

১৫। কথায় বলে না 'শব্দব্রহ্ম' একটি কথা উচ্চারণ করে জগতে কতোবড় ক্ষতি সাধন হয়ে কতোজন অপ্রীতিভাজন হয়—কতো মানুষ আবার একটি শব্দের বিশিষ্ট উচ্চারণ ভঙ্গিমার জন্য এক অনাবিল আনন্দ এবং এক আশ্চর্য সত্যের সন্ধান পায়।

এবারে শব্দশাসনের সূত্র ধরে—ধ্বনি, অক্ষর, শব্দ, শব্দাবলী, বাক্য এবং বাক্যাবলীর মধ্যে কোথায় কিভাবে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায় সে সম্পর্কে একটু আলোচনায় বসা যাক।

শব্দ শাসনের প্রাথমিক সূত্রকে ধ্বনি ও শব্দ প্রয়োগের যে রীতি তাকেই ধরে নেয়া যাক। প্রাথমিক সূত্রগুলি সাধারণ শিল্পী বা বাস্তব সচেতন মানুষের প্রায় প্রত্যেকেই জানেন। প্রাথমিক সূত্রের পর এবারে একটু প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের দিকে গুরুত্ব আরোপ করবো। গুরুত্বপূর্ণ হলেও সূত্রগুলি প্রায় সকলের জানা। জানা কিন্তু কিছু এলোমেলো বলে কাজ করতে অসুবিধা হয় বলে সূত্রগুলি সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে পরিচিতি লাভ করা প্রয়োজন। তাই এখন প্রয়োজনসূত্রপরিচিতির। এই সূত্রপরিচিতির আগে আমি একটি কথা আপনাকে মনে রাখতে বলবো—তা হলো 'বাস্তব সত্য' আর 'অনুমিত সত্য'। বাস্তব সত্য বাস্তবের জিনিস—বাস্তব থেকে, বাস্তব নিয়ে এবং বাস্তবের জন্য। অনুমিত সত্যে বাস্তব ভাঁওতা হতে পারে। কিন্তু শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাস্তব সত্য এবং অনুমিত সত্যের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ আছে। আর সেই সংমিশ্রণের জন্যেই মঞ্চ সত্য হয়েও বাস্তব নয়! কাজেই ঘরে বসে বাস্তবে যেভাবে আপনি কথা বলেন—মঞ্চে উঠে সেইভাবে তো আর কথা বলবেন না। হয়তো অনেক প্রয়োজন, বাস্তব প্রেক্ষাপট সেখানে বেশ কিছুটা বিস্তৃত। আর ঠিক সেই কারণে যুক্তিসম্মতভাবে শিল্প সৃষ্টির তাগিদে বাস্তব সত্য আর অনুমিত সত্যের সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে কিছু সংলাপ প্রয়োগে—কি আচার-আচরণে। আপনি নির্জন ঘরে একাকী হলেও একাকিত্ব আপনার পক্ষে বাস্তব সত্য। কিন্তু আপনার বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার জন্যে হয়তো একহাজার দর্শক বসে আছেন। সেখানে আপনি একা হলেও—আপনি তখন অনেক—অনেক—অনেকের জন্যে।

আবার সেই সূত্র পরিচিতিতে ফিরে আসি।

১। লেভেল বা পর্দা

২। পজ বা থামা (বিরতি)

৩। এমফেসিস বা শব্দাঘাত

৪। সাউণ্ড এক্সপানশন বা স্বর সম্প্রসারণ

৫। সাউণ্ড কনট্রাকশন বা শব্দ সংকোচন

৬। সোয়েল বা চিতিয়ে বলা

৭। টেলিসকপিক বা শব্দ সংযুক্তিকরণ

৮। স্পিড ফাস্ট বা দ্রুতবেগে বলা

৯। স্পিড শ্লো বা ধীর গতিতে বলা

১০। ক্রিসেণ্ডো বা শব্দাবলীর উত্তরণ

১১। ডিমিনেণ্ডো বা শব্দাবলীর অবতরণ

১২। ভাওয়াল বিটস্ বা স্বরবর্ণের বিস্তৃতি

১৩। রাইজিং এ্যাকশন বা কার্যাবলীর সূত্রে সংলাপ উচ্চমুখী হওয়া

১৪। ফলিং এ্যাকশন বা কার্যাবলীর সূত্রে সংলাপ নিম্নমুখী হওয়া

১৫। একটিভ সাউণ্ড বা সক্রিয় শব্দ ক্ষেপণ

১৬। রিদিমিক সাউণ্ড বা সুরেলা ধ্বনি ক্ষেপণ

মঞ্চাভিনয় করার জন্যে শিল্পী যদি একক অবস্থান করে সংলাপ বলেন তা হলে—মোটামুটি প্রেক্ষাগৃহের আয়তন, সেই প্রেক্ষাগৃহে শব্দ ক্ষেপণের পক্ষে কোনো খুঁত আছে কি না তা জেনে নিয়ে মোটামুটি একটা 'বেজ' ঠিক করবেন। সেই বেজ যখন ওঠানামার পর্যায়ে চলে যাবে তখন তাকে 'লেভেলও' বলা চলে। এই পর্দার ব্যবহার একক অভিনয়ের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত এবং একাধিক অভিনয়-শিল্পীর সঙ্গে অভিনয় করার সময় পর্দা সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। সংলাপ প্রক্ষেপণে একঘেঁয়েমী থেকে মুক্ত হওয়া এবং শ্রবণীয় এবং শ্রুতিমধুর করার জন্যেও পর্দার ওঠানামা সম্পর্কে গুরুত্ব দিতে হয়।

যেমন আমি যখন মঞ্চে কোনো একটা লেভেল ঠিক করে কথা বলবো এক বা একাধিক বাক্য প্রয়োগের শেষে যে সেই লেভেল এক থাকবে তা নয়। প্রথমে normal-এ ধরে সংলাপ শেষ করার সময় হয়তো below normal-এ ছাড়লুম। এখন সমস্যা অপর শিল্পী কোন্ পর্দায় ধরবে? আরো নিচুতে না একই লেভেলে? নিচুতে তো নয়—একই পর্দায় ধরতে পারেন তবে বড় 'হলে' অভিনয় হলে এক ডিগ্রী ওপরে অর্থাৎ above normal-এ ধরাই ভালো। তাহলে সংলাপ বিনিময়ের ক্ষেত্রে একজন যেখানে ছাড়বেন দ্বিতীয় জন কিন্তু তারপরের ধাপে বা পর্দায় ধরলে ভালো হয়। কিন্তু কিছুতেই নিচু পর্দায় নয়। নিচুতে ধরতে গেলে

আঙ্গিক বা সাত্ত্বিক অভিনয়ের সাহায্য নিতে হবে। অর্থাৎ একজনের কথার শেষে সঙ্গে সঙ্গে কথা না ধরে একটু বিরতি দিয়ে কথা নিচু পর্দায় শুরু করা যেতে পারে। কিন্তু বিরতির সময়ে অভিনয় চলবে রীতিমতো—সেই অভিনয় সংলাপহীন এবং অনুচ্চারিত—বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি এত তীব্র হবে যা নিম্নমুখী পর্দায় সংলাপ শুরুর আগে দর্শক নোতুন সংলাপ শোনার দিকে আগ্রহ বাড়ানোর সুযোগ যেন অবশ্যই পায়।

পর্দা ঠিক রেখে উঁচু নিচুতে ধরা সম্পর্কে সজ্ঞান ধারণা লাভ করলে ত্রুটিপূর্ণ হলেও অভিনয় করতে অসুবিধা হয় না। তবে নিচু পর্দায় ছাড়ার পর হঠাৎ যদি দু'তিন ধাপ উঁচুতে অন্য শিল্পী সংলাপ বলতে শুরু করেন তাহলে তা পরিবেশগত হবে না—বেখাপ্পা লাগবে। সংলাপ আদান-প্রদানের 'মধ্যে' যেন একটা সামঞ্জস্য বজায় থাকে তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। একধাপ ছেড়ে যদি কোনো উঁচু ধাপ ধরতে হয় তাহলে দর্শকের মানসিক প্রস্তুতির কথা মাথায় রেখে শোনানোর আগে কিছু ভালো আচরণ বা অভিব্যক্তি দেখিয়ে দিন—তারপর উঁচুতে ধরুন বা নিচুতে ধরুন তাতে কোনো অসুবিধা হবে না।

ধরা ছাড়ার বিষয়টা ঠিক হবার পর সংলাপ শুরু করে এক বা একাধিক সংলাপ থাকলে তাকে নানা রকম পর্দায় ওঠান নামান—বিভিন্ন প্রক্ষেপণ রীতিকে কাজে লাগান—তাতে কোনো আপত্তি নেই। তবে সংলাপ প্রয়োগের সময় যা কিছু করুন না কেন—কিন্তু কখনো ঔচিত্যবোধ হারাবেন না।

তাহলে পর্দা বা লেভেল হচ্ছে তিন রকমের (১) Normal বা স্বাভাবিক (২) Above বা উচ্চমুখী (৩) Below বা নিম্নমুখী

মঞ্চে অভিনয় করার সময় যখন আপনার সঙ্গে অন্য শিল্পীরা অভিনয় করেন তখন সেই অন্য শিল্পীর কণ্ঠস্বর প্রক্ষেপণে ক্ষমতা, গাঢ়তা এবং সেই শিল্পীর কণ্ঠে কতোখানি ছন্দ সৃষ্টি করার ক্ষমতা সে সম্পর্কে আপনাকে অবহিত হতে হবে। মঞ্চে যখন আপনি একা থাকবেন তখন আপনি যা করবেন সেটা এক ব্যাপার আর মঞ্চে যখন আপনি অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে অভিনয় করবেন তখন আর এক ব্যাপার। আর এই ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ—কণ্ঠস্বর প্রক্ষেপণে যখন কণ্ঠস্বরের আদান প্রদান চলবে তখন ভাব-বক্তব্য শ্রুতিগ্রাহ্যতার কথা মনে রেখে কণ্ঠস্বর প্রয়োগে ভারসাম্যতা বজায় রাখতে হবে।

তবে পর্দা প্রসংগে এই আলোচনা সব নয়। পরিচালক যদি unconventional কিছু করতে চান তাহলে অন্য কথা। কিন্তু প্রচলিত নিয়মকানুন জেনে নিয়ম ভেঙে অন্য নিয়মে আসার সার্থকতা সম্পর্কে আমি কারোর সঙ্গে দ্বিমত নই। নোতুনকে আহ্বান জানানোর সদ্ইচ্ছা চলছে—চলবেও।

Pause বা বিরতি :

এখন আমার কথা কণ্ঠস্বরের প্রয়োগ-পদ্ধতি নিয়ে নয়। আমি জানাতে চাইছি শব্দ ও স্বরপ্রক্ষেপণ বিরতির ব্যবহার কোথায় কিভাবে অভিনবত্ব সৃষ্টি করছে। কতো রকমের বিরতি আছে। যত রকমের বিরতি আছে তাদের সার্থক প্রয়োগে একজন অভিনেতা কীভাবে অভিনয়ের সামগ্রিক অংশের মধ্যে সংলাপ প্রয়োগের অংশের মধ্য দিয়ে কতোটুকু অভিনব ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারেন। এক কথায় স্বরক্ষেপণে বিরতিকে ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে অভিনেতা অবশ্যই অভিনয়ের অনেকখানি এগিয়ে দিতে পারেন। নইলে বিভিন্ন মঞ্চে যেমন অসংখ্য তোতাপাখী দেখা যায় তেমন আরো অনেক তোতাপাখী সৃষ্টি হবে পবিত্র এই রঙ্গভূমিতে। একজন পরিচালকের বা নির্দিষ্ট কোনো অভিনেতার কণ্ঠস্বরকে সার্থক অনুকরণ করে যা তৈরি হবে তা তোতাপাখী ছাড়া আর কি বলবো? আমরা তৈরি করার কাজে বিশ্বাসী নই—আমরা চাই সৃষ্টি করতে।

তাহলে আসুন তত্ত্বের কচকচানি থেকে মুক্ত হয়ে ব্যবহারিকভাবে কিছু কাজ করা যাক। যাত্রাদলে বা অধিকাংশ ব্যবসায়ীর দলে এমন কি অ-পেশাদার দলেও অভিনেতারা বিরতির উল্টোপাল্টা প্রয়োগ করে আসল কাজের জায়গা থেকে সরে এসে কেমন যেন জগাখিচুড়ি পাকিয়ে বসে।

সাধারণভাবে আমরা জানি—গদ্য বা পদ্য যে-কোনো রচনায় লেখক তাঁর নিজস্ব চিন্তা অনুযায়ী বিরতির স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু উপস্থাপ্য শিল্প হিসেবে সংলাপ প্রয়োগ শুধু কথা বলার নয়—কথার সঙ্গে আরো অনেক জিনিস আছে, আছে অনেক ব্যাখ্যা। আর ঠিক সেই জন্যই শিল্পীদের বিরতি-সচেতন হতে হবে।

লেখার মধ্যে অনেক রকম বিরাম চিহ্নের ব্যবহার হয়, যেমন কমা, সেমিকোলন, কোলন, কোলন-ড্যাশ, ড্যাশ, দাঁড়ি, হাইফেন, ফুটকি। সংলাপ বলার সময় বিরতির ব্যবহারের সঙ্গে এইসব লিখিত বিরাম চিহ্নের খুব কমই সম্পর্ক রয়েছে। কারণ ছাপা রচনা বা পাণ্ডুলিপির মধ্যে যে বিরাম চিহ্ন থাকে, সংলাপ বলার সময় ঠিক সেখানেই যে 'বিরতি' দিতে হবে তার কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। বরং যেখানে বিরাম-চিহ্ন আছে সেখানে 'বিরতি' না দিয়ে যেখানে বিরাম-চিহ্ন নেই সেখানে 'বিরতি' দিলে সংলাপ অর্থবহ ও উদ্দেশ্যমূলকও হতে পারে।

এবারে কাগজ-কলম নিয়ে বসুন। যে-কোনো একটা বাক্য লিখুন। বাক্যের

প্রতিটি শব্দ ভেবে নিয়ে গোটা বাক্যটির মধ্য দিয়ে আপনি কি বোঝাতে চাইলেন তা ঠিক করে নিন। এরপর কাজ শুরু করুন।

একটা শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের কি সম্পর্ক, একটা Sentence বা বাক্যের মধ্যে একটা Phrase বা বাক্যাংশের মধ্যে কোন্ অংশগুলির কি পারস্পরিক সম্বন্ধ রয়েছে তার পার্থক্য বোঝাতে গেলে প্রত্যেকটি সংলাপকে আপনি আলাদা করে সাজান—প্রত্যেকটি আইডিয়া বা ভাবকে 'বিরতি' দিয়ে ভাগ করুন। মনে রাখবেন এ ব্যাপারে 'বিরতি' আপনার কাছে একটি বড় মূলধন। আবার দেখুন একটা Sentence-এর মধ্যে যে আবেগ ও রস আছে তা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে দর্শকদেরও আপনার সময় দিতে হবে। এর জন্যও 'বিরতি'র দরকার। কোনো ফাঁকা 'হলে' বন্ধুর সামনে সংলাপ বলে দেখুন—দেখবেন একটা ন্যূনতম বিরতির ভীষণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এটাও অবশ্য ঠিক যে, 'বিরতি'র দৈর্ঘ্য পরিবেশানুযায়ী পরিবর্তিত হয়। এই পরিবেশ আবার অনেক অবস্থার উপর নির্ভর করে। যেমন :

(ক) উপস্থিত দর্শকদের মেজাজ ও মনোভাব।

(খ) নাটমঞ্চের আকৃতি, গঠনপ্রকৃতি ও শব্দধারণ ক্ষমতা।

(গ) উপস্থিত দর্শক সংখ্যা।

(ঘ) অভিনেতার নিজস্ব স্বরগ্রামের প্রকৃতি ও কাযক্ষমতা।

কিন্তু যে প্রাক্-শর্তই থাক্ না কেন, যে পরিবেশই থাকুকনা, যে অবস্থাই আরোপিত হোক্না, যদি 'বিরতি' না দিয়ে সংলাপ বলার পেছনে যথেষ্ট শৈল্পিক যুক্তি থাকে, যদি শব্দ ও বাক্যের মানেটাকে ঠিক ঠিক প্রকাশ করতে হয় তবে শব্দগুলো এবং বাক্যাংশগুলোর মধ্যে 'বিরতি' দিতেই হবে। যদি বিরামহীন ও দ্রুত সংলাপ বলার প্রয়োজনও হয় তবু সেই বিরামহীন দ্রুততা খুব কম ব্যবহার করা উচিৎ ও বেশ বিচারবুদ্ধি করেই তবে ব্যবহার করা উচিৎ। মনে রাখবেন, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন, এই ধরনের বাচনভঙ্গী উপলব্ধির পক্ষে বাধাস্বরূপ। কারণ, বিরামহীন সংলাপ হয়তো নাটকীয়, আবেগময়, ভাবোদ্দীপক মুহূর্ত সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত অন্তরতম নির্যাসটিকে প্রকাশে একেবারেই অক্ষম।

'বিরতি' আপনার দুটি প্রধান কাজ করে দিচ্ছে—১। প্রত্যেকটি Sentence-কে সঠিকভাবে শ্রবণযোগ্য ও বোধগম্য করে দিচ্ছে ২। Sentence-এর মধ্যে যে ভাব ও আবেগ আছে তা প্রকাশ করে দিচ্ছে।

কনস্তান্তিন স্তানিস্লাভস্কি, ডেরেক বাউস্কিল প্রমুখ নাট্যশিক্ষকরা 'বিরতি'কে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করেছেন :—

২। যুক্তিসম্মত বিরতি (Logical Pause)

২। মনস্তাত্ত্বিক বিরতি (Psychological Pause)

৩। বাতাস নেবার জন্য বিরতি (Luft Pause)

৪। শব্দের উপর জোর দেবার জন্য বিবতি (Pause for Emphasis)

১। যুক্তিসম্মত বিরতি [Logical Pause]

এই 'বিরতি' বাক্যাংশগুলিকে একটি সামগ্রিক রূপ দেয়—তাদের বোধগম্য করতে এবং আবেগ ও ভাবপ্রকাশে সাহায্য করে অর্থাৎ এ একই সঙ্গে দুটো কাজকরার ক্ষমতা রাখে।

(ক) একটা শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দ জোড়া লাগাতে পারে।

(খ) শব্দগুলিকে একটি অপরটি থেকে ভাগ করতে পারে।

একজন মানুষের ভাগ্য এমন কি তার জীবনও এই 'যুক্তিসম্মত বিরতি'র অবস্থানের উপর নির্ভর করতে পারে। নিচের শব্দগুলিকে দেখুন—

PARDON IMPOSSIBLE SEND TO SIBERIA.

যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি জানছেন 'যুক্তিসম্মত বিরতি'টি কোথায় বসানো হয়েছে ততক্ষণ এই শব্দগুলোর কি মানে আপনি বুঝবেন ? তাহলে বলতে হয়—

PARDON (বিরতি) IMPOSSIBLE SEND TO SIBERIA.

অথবা

PARDON IMPOSSIBLE (বিরতি) SEND TO SIBERIA.

প্রথম ক্ষেত্রে এটি ক্ষমাশীলতার প্রকাশ, দ্বিতীয়টি নির্বাসন। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালোযে,সংলাপের মধ্যে যে 'যুক্তিসম্মত বিরতি'-গুলি আছে তাদের সাহায্যে উচ্চারণ করলে সংলাপের অর্থ বোধগম্য হয়। আর একটা কথা, 'যুক্তিসম্মত বিরতি'গুলির মাঝের সময়টুকুতে বাকি বাক্যাংশটি বা শব্দগুলি যতদূর সম্ভব প্রায় একটি একক শব্দের মতো উচ্চারণ করবেন। অর্থাৎ, ঐ মাঝের সময়ের অসম্পূর্ণ অংশগুলোকে একদম না ভেঙে, ঐ টুকরোগুলোতে যা বলবার আছে চট্ করে একদমে বলে ফেলতে হবে। অবশ্য অনেকগুলো ব্যতিক্রমও আছে যেগুলি ঐ মধ্যবর্তী অংশগুলোর মধ্যেও বিরতি দিতে বাধ্য করে। তাই সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনি আপনার পাণ্ডুলিপির সংলাপ-

গুলিকে 'যুক্তিসম্মত বিরতি' দিয়ে ভাগ করে নেন। এই পদ্ধতিটি আপনাকে আর একটি বড়ো সুবিধা করে দেবে। এটি আপনাকে সংলাপের অভ্যন্তরে প্রবাহিত অনুভূতিকে স্পর্শ করতে, শব্দগুলিকে বিশ্লেষণ করতে ও তাদের নির্যাস আত্মস্থ করতে সাহায্য করবে। বাস্তবিক, এই পদ্ধতিতে সংলাপ বলার রীতিটিকে স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে পূর্ণ করে, অন্তর্নিহিত বস্তুটি বোধগম্য ও গভীর বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে প্রতিভাত হয়। একটি উদাহরণে আসা যাক—

'তুমি কি অবাক হয়ে ভাবছো যে আমি কে বা আমি কি করি? এখানে তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, কোনো ছোট বাচ্চা ছেলে, অথবা কোনো গজমূর্খ যে আমার কথা শোনেনি এবং আমি এখানে কেন এসেছি তা জানে না?'

(ক) তুমি কি অবাক হয়ে ভাবছো যে (বিরতি) আমি কে (বিরতি) বা আমি কি করি? এখানে (বিরতি) তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে (বিরতি) কোনো (বিরতি) ছোট বাচ্চা ছেলে (বিরতি) অথবা কোনো (বিরতি) গজমূর্খ (বিরতি) যে আমার কথা শোনেনি এবং (বিরতি) আমি এখানে কেন এসেছি তা' জানে না?

অথবা

(খ) তুমি কি অবাক হয়ে ভাবছো যে আমি কে বা (বিরতি) আমি কি করি? এখানে তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, কোনো ছোট বাচ্চা ছেলে বা কোনো (বিরতি) গজমূর্খ, যে আমার কথা (বিরতি) শোনেনি এবং (বিরতি) আমি এখানে কেন এসেছি তা' জানে না?

অথবা

(গ) তুমি কি অবাক হয়ে ভাবছো যে (বিরতি) আমি কে বা (বিরতি) আমি কি করি? এখানে (বিরতি) তোমাদের মধ্যে (বিরতি) এমন কেউ কি আছে (বিরতি) কোনো ছোট বাচ্চা ছেলে অথবা কোনো গজমূর্খ, যে (বিরতি) আমার কথা শোনেনি?

উপরের ক, খ, গ অনুযায়ী 'যুক্তিসম্মত বিরতি'র ব্যবহার করে আবেগ ও ভাব-প্রকাশে সাহায্য করছে; তা লক্ষ্য করুন। সংলাপটি বোঝা ও শোনার পক্ষে বেশ সহজ হচ্ছে—নয় কি?

২। মনস্তাত্ত্বিক বিরতি [Psychological Pause]

'যুক্তিসম্মত বিরতি' ছাড়া যেমন সংলাপ বোধগম্য হয় না; 'মনস্তাত্ত্বিক বিরতি' ছাড়া সংলাপ তেমনি জীবনহীন হয়। 'যুক্তিসম্মত বিরতি' আমাদের

মস্তিষ্কের সেবা করে, 'মনস্তাত্ত্বিক বিরতি' আমাদের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। একজন বিখ্যাত অভিনেতা বলেছিলেন, 'তোমার সংলাপ থেমে যাক্ এবং তোমার নীরবতা বাঙময় হোক।' 'মনস্তাত্ত্বিক বিরতি' ঠিক এটাই—অলঙ্কার-পূর্ণ নীরবতা। অক্ষর ও শব্দগুলির পরিবর্তে কাজ করবে আপনার চোখ দু'টি, আপনার মুখের অভিব্যক্তি, আপনার বুদ্ধির ঝলক, ইঙ্গিতপূর্ণ চলাফেরা। মজাটা হচ্ছে, 'মনস্তাত্ত্বিক বিরতি' কোনো আইনেরই নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, বরং কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, কথা বলার সমস্ত নিয়মই এটির শাসনাধীন। যেখানে 'যুক্তিসম্মত বিরতি' ব্যবহার করা অসম্ভব সেখানে 'মনস্তাত্ত্বিক বিরতি' নির্ভীক ভাবে অনুপ্রবেশ করতে পারে। একটা ঘটনা বলি, একটি যুদ্ধ শিবিরে ধৃত শত্রুপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে দুইজনকে গুলি করে হত্যার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ও বাকী সবাইকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। ধরুন, এমনিভাবে পড়া হলো—

'এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে দুইজন যুদ্ধবন্দীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইল ও বাকী সবাইকে মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইল। যে দুইজন যুদ্ধবন্দীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইল তাহাদের নাম, সুরজিৎ সেনগুপ্ত এবং (এখানে বলে রাখি—অবশ্যম্ভাবী দুর্বিপাকটিকে কোমল করার জন্য অথবা বিপরীতভাবে বলতে গেলে ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের একটি আবেগকে প্রকাশের চেষ্টায় একটি মনস্তাত্ত্বিক বিরতি দেয়া হলো) এবং (আবার বিরতি) যশোবন্ত কাউল।'

আপনি জানেন, কোনো 'বিরতি'র জন্য 'এবং' এই বিযুক্তিকরণ শব্দটিকে ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয় না। কিন্তু 'মনস্তাত্ত্বিক বিরতি' এই রকম একটা আইনকে ভাঙ্গার ব্যাপারেও কোনো বাধাই মানে না। সবচেয়ে বড় কথা, 'মনস্তাত্ত্বিক বিরতি' 'যুক্তিসম্মত বিরতি'কে ধ্বংস না করেও তার জায়গায় নিজের জায়গা করে নেবার ক্ষমতা রাখে। 'যুক্তিসম্মত বিরতি'কে অল্প সময়ের পরিধিতে কাজে লাগানো হয়। ঐ সময়টিকে যদি বাড়ানো হয়, 'যুক্তিসম্মত বিরতি'টি একটি সজীব 'মনস্তাত্ত্বিক বিরতি'তে রূপান্তরিত হয়। এই বিরতির সঙ্গে সময়ের কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো এ্যাক্‌শন বা নাট্যমুহূর্ত তৈরি করার জন্য আপনি এটি যতক্ষণ প্রয়োজন তত সময় ধরে রাখতে পারেন, এমন কি একটি পুরো দৃশ্যও 'মনস্তাত্ত্বিক বিরতি' দিয়ে সাজাতে পারেন। অবশ্য মন্থরতা ও একঘেঁয়েমির বিপদ থেকে 'মনস্তাত্ত্বিক বিরতি'কে সতর্কভাবে পাহারা দেবেন। এটি ঘটার আগেই সংলাপকে জায়গা করে দেবেন। শুধু-মাত্র 'বিরতি'র স্বার্থেই 'বিরতি'র ব্যবহার যেমন উচিৎ নয়, তেমনি একটি

অতি সাধারণ 'বিরতি'র মধ্যে একটি 'মনস্তাত্ত্বিক বিরতি'র মৃত্যু শৈল্পিক কারিগরিতে শূন্যতা সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ 'যুক্তিসম্মত বিরতি'গুলিতে আপনার মানসিক পরিতৃপ্তি পর্যন্ত 'মনস্তাত্ত্বিক বিরতি'তে রূপান্তরিত করুন। কিন্তু সাবধান! অর্থহীনভাবে যদি তাদের ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু দর্শকরা bore হয়ে যাবেন।

৩। বাতাস নেবার জন্য বিরতি [Luft Pause]

গান গাওয়ার সময় জার্মানরা এই বিরতিকে বলেন 'luft pause' (luft—বাতাস)--বাতাস নেবার জন্য বিরতি। এটি বিরতিগুলির সংক্ষিপ্ততম একটি। দ্রুত বাতাস নেবার জন্য এটি যথেষ্ট কার্যকর। আঙুলের একটি তুড়ি মারতে যতখানি সময় লাগে এ জাতীয় বিরতি তার চেয়ে বেশী সময় নেয় না। এমনকি প্রায়ই এই luft pause একক ভাবে সত্যিকারের 'বিরতি'ও হয় না। এটি সংলাপকে বাঙময় অবস্থাতেই রাখে। আমরা যাকে চোরাদম বলি, luft pause তাই। দ্রুত সংলাপ বলার সময় এই 'বিরতি' আপনার খুব কাজে লাগবে।

৪। শব্দের উপর জোর দেবার জন্য বিরতি [Pause for Emphasis]

কোনো শব্দের উচ্চারণের আগে যদি সচেতন ও সুচিন্তিত 'বিরতি'র ব্যবহার করা যায় তবে সেই শব্দের প্রতি দর্শকদের মনোযোগ সহজেই আকর্ষণ করা যায়। শব্দটি তীক্ষ্ণতরভাবে প্রক্ষেপিত হয়। এই পদ্ধতি শব্দটির অর্থের গুরুত্বটিকে একটি বিশেষ মাত্রা সংযোজন করে। যেমন :—

'তুমি কি ভাবছো যে আমি কে বা আমি কি করি? এখানে তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, কোনো ছোট বাচ্চা ছেলে অথবা কোনো গণ্ডমূর্খ যে আমার কথা শোনেনি এবং আমি এখানে কেন এসেছি তা জানেনা? (অল্প বিরতি) '**কেউ নেই?** আচ্ছা যদি কেউ থাক তাহলে বল। (দীর্ঘ বিরতি) **কি কেউ নেই?**'

কোনো শব্দ বা বাক্যের মধ্যে 'বিরতি' না দিয়ে প্রথম দু'টি বাক্য দ্রুত পড়ুন। এবার 'কেউ নেই' কথাটি বলার আগে একটু অল্প 'বিরতি' দিন। আবার দ্বিতীয় 'কেউ নেই' কথাটির আগে আরো বেশীক্ষণ 'বিরতি' দিন। দেখবেন, অল্প বিরতির পর প্রথম 'কেউ নেই' কথাটির গুরুত্ব বেড়ে গেছে ও শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে ও পরের দীর্ঘ বিরতির পর দ্বিতীয় 'কেউ নেই' কথাটি আরো তীক্ষ্ণতরভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

এতক্ষণ, সংলাপ বলার সময় বিরতিকে কিভাবে ব্যবহার করবেন, পৃথিবীর বড় বড় নাট্য শিক্ষকরা কতোরকম 'বিরতি'র কথা বলেছেন, তা আপনাকে শোনালাম। আপনি নিশ্চয়ই এখন ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছেন। এবার আপনাকে আমি আরো কিছু এগিয়ে দিতে চেষ্টা করছি। আমি নিজে এ বিষয়ে কিছুটা কাজ করেছি ও হাতে-কলমে তার চমৎকার ফলও পেয়েছি। আপনিও আমার এই ভাবনাগুলোকে পরীক্ষা করে দেখুন এবং সম্ভবতঃ আমার বিশ্বাসে আপনিও আমার সঙ্গে দ্বিমত হবেন না।

আবেগের পরিবর্তনে 'বিরতি'র ব্যবহার [Emotional Pause]

একাধিক সংলাপের মধ্যে বিভিন্ন আইডিয়া বা ভাব থাকে। আবার প্রত্যেকটি আইডিয়াই ভিন্ন ভিন্ন আবেগ দ্বারা ব্যক্ত হয়। একটি আবেগ থেকে অন্য আবেগে যাবার আগে যদি 'বিরতি' ব্যবহার করেন, তবে আপনি এই আবেগের পরিবর্তন ও পার্থক্যটা সহজেই প্রকাশ করতে পারবেন। যেমন :

১। কর্ণকুন্তি সংবাদ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কর্ণ ॥ মাতঃ, করিয়ো না ভয়।
কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়। (বিরতি)
আজি এই রজনীর তিমিরফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
ঘোর যুদ্ধফল। এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছি মনে
জয়হীন চেষ্টার সংগীত, আশাহীন
কর্মের উদ্যম—হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম। (বিরতি) যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান। (বিরতি)
জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডবসন্তান—(বিরতি)
আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে। (বিরতি)
জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন, গৃহহীন। (বিরতি) আজিও তেমনি
আমারে নির্মমচিত্তে তেয়াগো, জননী,
দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব পরে। (বিরতি)

শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে,
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে অয়ি,
বীরের সদ্‌গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।

এখানে প্রত্যেকটি নোতুন আইডিয়া বা ভাবের প্রকাশের আগে 'বিরতি'র ব্যবহার করেছি। প্রথম পর্যায়ে কর্ণ কুন্তীকে আশ্বাস দিচ্ছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে যুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে ভাবছেন। তৃতীয় পর্যায়ে মিনতি বা অনুরোধ, চতুর্থ পর্যায়ে অভিমান ও সর্বশেষে আশীর্বাদ প্রার্থনা।

২। **সাজাহান**—পঞ্চম দৃশ্য : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[স্থান—ঔরংজীবের বহিঃকক্ষ। কাল—দ্বিপ্রহর রাত্রি। ঔরংজীব একাকী।]

ঔরংজীব : যা করেছি—ধর্মের জন্য। (বিরতি) যদি অন্য উপায়ে সম্ভব হোতো (বিরতি) [বাহিরের দিকে চাহিয়া] উঃ কি অন্ধকার। (বিরতি) কে দায়ী? (বিরতি) আমি? (বিরতি) এ বিচার, ও কি শব্দ?—(বিরতি) না বাতাসের শব্দ।—(বিরতি) একি! কোন মতেই এ চিন্তাকে দূর করতে পাচ্ছি না। (বিরতি) রাত্রে তন্দ্রায় ঢলে পড়ি, কিন্তু নিদ্রা আসে না, [দীর্ঘনিশ্বাস] (বিরতি) উঃ কি স্তব্ধ। এত স্তব্ধ কেন? (বিরতি) [পরিক্রমণ, পরে সহসা দাঁড়াইয়া] ও কি! আবার সেই দারার ছিন্ন শির? (বিরতি) সুজার রক্তাক্ত দেহ? (বিরতি) মোরাদের কবন্ধ? (বিরতি) যাও সব। আমি বিশ্বাস করি না। ঐ (বিরতি)—ঐ তারা আবার আমায় ঘিরে নাচছে। (বিরতি) কে তোমরা?

এখানে ঔরংজীবের মধ্যে বিভিন্ন আইডিয়া বা ভাবের পরিবর্তন ঘটছে। কোনো সময় তিনি নিজের বিবেকের কাছে দারাকে হত্যা করার জন্য যুক্তি দিচ্ছেন, কোনো সময়ে তাঁর মনে ভীষণ দ্বন্দ্ব চলছে, পরমুহূর্তেই উত্তপ্ত চিন্তার প্রতিচ্ছবি দারার মুণ্ড, মোরাদের কবন্ধ ও সুজার হাসি দেখতে পাচ্ছেন। বিভিন্ন ভাবের পরিবর্তনের সাথে সাথে আবেগ ও রসের পরিবর্তন ঘটছে।

সিদ্ধান্ত : প্রত্যেকটি ভাবের আগে 'বিরতি'-কে ব্যবহার করে প্রত্যেকটি আবেগ ও ভাবের মনোজ্ঞ পরিবেশন করা সম্ভব।

সক্রিয় বিরতি [Active Pause]

নাটক মানে অ্যাকশন। আবার দেহভঙ্গি ও চলাফেরা ছাড়াও অ্যাকশন আছে। আলোর সাহায্যে বা শব্দক্ষেপণের (effect music) সাহায্যেও নাটকে অ্যাকশন তৈরি হতে পারে। সংলাপ বলার মধ্যেও ঠিক এমনি অ্যাকশন

তৈরি হয়, আর এই অ্যাকশনকে সক্রিয় করার জন্য 'বিরতি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সংলাপ বলার সময় অতীতে ঘটে গিয়েছে এমন কোনো ঘটনা বা ভবিষ্যতের সম্ভাব্য একটি ছবি বা ভাবকে মূহূর্তে যদি বিশ্বাসযোগ্য করে দর্শকদের কাছে তুলে ধরতে চান তবে আপনি 'বিরতি'-কে চমৎকারভাবে কাজে লাগাতে পারেন। যেমন ধরুন :—

শেষ থেকে শুরু : সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

(ক) নীলমণি : তোর বৌদি মরে গেল (বিরতি) ছেলেটাকে মামার বাড়ীতে রেখে মানুষ করতে লাগলুম। (বিরতি) আমি তখন এলাহাবাদে বাউণ্ডুলের মতো ঘুরছি। (বিরতি) Contractor-এর কাজ করতুম, রোজগার শুধু ঐ ছেলের জন্য। (বিরতি) তারপর ছেলে মানুষ হয়ে একদিন চিঠি লিখলো, 'বাবা তুমি ফিরে এসো, আমরা দুজনে বাপ-বেটায় এক জায়গায় থাকবো।' উঃ সেদিন যে কি আনন্দ হয়েছিলো ভোলা কি বলবো (বিরতি) নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে, ছেলের কাছে চলে এলুম (বিরতি) তারপর ছেলে love marriage করলে (বিরতি) বৌমা এলো (বিরতি) আমি যেন আবার সংসারী হয়ে গেলুম। দু'বেলা বাজার-হাট করতুম, বৌমার ফাইফরমাশ খাটতুম, আমার বেশ লাগতো (বিরতি) তারপর ভাবতুম আমার নাতি হবে (বিরতি) আমি নাতিকে কোলে করে নিয়ে বেড়াবো, (বিরতি) নাতি আমায় দাদু! দাদু! ব'লে ডাকবে।

এখানে 'বিরতি' নীলমণির অতীতের সুখ-দুঃখের ছবিগুলোকে একটার পর একটা ছায়াছবির মতো সাজিয়ে দিচ্ছে। তৈরি হচ্ছে নোতুন নোতুন অ্যাকশন। দর্শকের মনেও একটি নিটোল চিত্রকল্প ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে এগোচ্ছে। আবার দেখুন, প্রত্যেকটা 'বিরতি' সময় বা বছরগুলিকে লাফ লাফে অনায়াসে পার হয়ে যাচ্ছে।

(খ) ভোলা : আমি এখন মাঝে মাঝে ভাবি (বিরতি) আমি মরে গেছি (বিরতি) একটা ভালো দড়ির খাটে আমাকে শুইয়ে দিয়েছো (বিরতি) কপালে ফোঁটা ফোঁটা চন্দন দিয়েছো (বিরতি) আমার শক্ত ঘাড়টাকে একটু উঁচু করে দিয়ে, তুমি ছবি তুলছো (বিরতি) তুমি কিছুতেই ফোকাস করতে পারছো না (বিরতি) ক্যামেরার কাঁচ কেবলই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে তোমার চোখের জলে।

লক্ষ্য করুন এখানে 'বিরতি' ভোলার ভবিষ্যতের কল্পনার ছবিটা একটু

একটু ক'রে তুলে ধরছে আর সঙ্গে সঙ্গে সংলাপের মধ্যে অ্যাকশন বাড়িয়ে চলেছে—নাট্য মুহূর্ত তৈরি হচ্ছে।

ব্যাখ্যানমূলক বিরতি [Interpretative Pause]

চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে প্রতিভাত করার জন্য এই শ্রেণীর 'বিরতি'র সক্রিয় ভূমিকা আছে। এই সংলাপটা দেখুন—

বাবা : খোকা, আমি যে কতো কঠিন তা' তুমি জানো। তুমি জানো যে আমি কোনোদিন অন্যায়কে প্রশ্রয় দিইনি। আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি—(বিরতি)—খোকা তুই বিপথে গেলে আমার বড় কষ্ট হয়।

সিদ্ধান্ত : এখানে 'বিরতি'র সাহায্যে পিতার চারিত্রিক কাঠিন্যের আড়ালে সন্তানের প্রতি হৃদয়ে যে নরম জায়গাটি আছে তার প্রকাশ করা হয়েছে।

৭০ বছরের বৃদ্ধ কথা বলার সময় যত 'বিরতি'র সাহায্য নেবে, ২০ বছরের যুবক নিশ্চয়ই তত 'বিরতি' ব্যবহার করবে না। আবার ৪০ বছরের মানুষটিও ঐ একইভাবে 'বিরতি'র ব্যবহার করবে না। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো বয়সের সীমারেখা অনেকাংশে 'বিরতি'র নিয়ামক। উল্টো করে বলতে গেলে, 'বিরতি'র ব্যবহার চরিত্রের বয়সের সম্বন্ধে মোটামুটি একটা রেখাচিত্র দর্শকের সামনে হাজির করতে সাহায্য করে। অবশ্য ভগ্ন স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক অবস্থা ও যে পরিবেশে চরিত্রটি ব্যক্ত তাও অনেকাংশে এ ব্যাপারে নির্ভরশীল।

ছন্দময় বিরতি [Rhythmic Pause]

অনেক জনপ্রিয় অভিনেতাকে দেখেছি সংলাপকে ছন্দময় করার জন্য এক ধরনের বিরতি ব্যবহার করেন।

যেমন ধরুন :—দীপক। সঞ্জু—সঞ্জু

সঞ্জয়। এ্যা—(বিরতি)—হ্যা—(বিরতি)—কি বলছিস।

আর একটা কথা বলতেই হবে। 'বিরতি'র সময় অভিব্যক্তি কিন্তু কখনই নিষ্ক্রিয় থাকবে না।

একটু বোঝবার চেষ্টা করি :—

শ্যামল বন্ধুদের নিয়ে মদের আসরে মশগুল। এমন সময় তার বন্ধু অভি এসে বললো—

অভি। শ্যামল বাড়ী চল্।

শ্যামল। বাড়ী—কোন্ বাড়ী—কার বাড়ী—আমার কোনো বাড়ী নেই—

অভি। শ্যামল তোর বাবা মারা গেছেন।

শ্যামল। কে বাবা—কার বাবা—(বিরতি)—না—(কান্না)

এখানে 'বিরতি'র সময়টুকুতে কিন্তু অভিব্যক্তি প্রচণ্ডভাবে সক্রিয়। ঘটনার আকস্মিকতা সংলাপকে স্তব্ধ করে দিলেও শ্যামলের মানসিক প্রতিক্রিয়ার স্তরগুলি এই মুহূর্তে তার চোখ ও মুখের অভিব্যক্তির মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন ফুটে উঠবে। শ্যামল মুহূর্তের জন্যে স্তম্ভিত হলেও তা গভীর ছন্দময়।

এছাড়া অভিনেতা চেরকাশভ আরো দুরকমের নাটকীয় বিরতির কথা উল্লেখ করেছেন। এক, নাটকীয় ঘটনা, চলা-ফেরাকে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে কৌতূহলোদ্দীপক করা। দুই, স্বল্প মেয়াদী বিরতি—যা নাটকীয় ঘটনাকে সুতীক্ষ্ণ এবং ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত করবে। অর্থাৎ বলা যায় 'ক্ষণস্থায়ী বা সুদীর্ঘ এই উভয় জাতীয় বিরতিতেই নাটকের প্রধান প্রধান চিন্তার বিষয়বস্তুকে দর্শকের মনে গেঁথে দেয় এবং নাটককে করে তোলে রহস্যঘন ও কৌতূহলোদ্দীপক। অভিনেতা যখন অনুভব করেন প্রেক্ষাগারের সব দর্শকই তাঁর আয়ত্তাধীন, অর্থাৎ ইচ্ছামতো তিনি তাদের হাসাতে কাঁদাতে বা শ্বাসরুদ্ধভাবে স্থিরভাবে বসিয়ে রাখতে পারেন, তখন তাঁর মন এক অপার আনন্দে ভরে ওঠে।'

Emphasis বা শব্দাঘাত ঃ

সোজা কথায় Emphasis বলতে বুঝি—ধ্বনি বা অক্ষর বা অক্ষর-সমষ্টির ওপর জোর দিয়ে একটি বাক্যের মধ্যেকার আসল অর্থকে বিশিষ্ট এবং বৈচিত্র্যময় করে তোলা।

যেমন 'আমি যাব না বলছি' একটি বাক্য বা সংলাপ। এই সংলাপে 'আমি' অক্ষরের ওপর জোর দিয়ে অন্য অক্ষরগুলিকে একটি ভাবে বললে—

'আমি যাব না বলছি' এই বাক্যে 'আমার' ওপর গুরুত্ব পড়ে। আবার যাব অক্ষরের ওপর জোর দিলে 'যাওয়া'র ওপর গুরুত্ব পড়বে। আর 'বলছি' অক্ষরের ওপর জোর দিলে 'আমি' বা 'যাওয়া'র ওপর গুরুত্ব না পড়ে 'বলা'র ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। এখন আপনাকে দেখতে হবে—নাট্যকার কোন্ অক্ষরের আসল অর্থকে এই বাক্যের মধ্যে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন তা বুঝে নিয়ে তবেই শব্দ বা অক্ষরের ওপর আঘাত করার কাজটা সারতে হবে।

যে-কোনো কাজ করতে যান না কেন মোটামুটি কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কে

সচেতন হলে সংলাপে শব্দাঘাতের ব্যবহার সম্পর্কে নিজে নিজেই সচেতন হওয়া যায়। যেমন,

১। আগের চরিত্র কি বললো?

২। আগের চরিত্র কি করলো?

৩। নাটকের আগের মুহূর্তে কি ঘটনা ঘটতে চলেছে?

৪। আপনি মঞ্চে এসেছেন কেন?

৫। কখন এসেছেন?

৬। মঞ্চে আপনার কাজ কি?

৭। এখন কি করবেন?

৮। কি বলবেন?

৯। বলার পর অন্যে কি বলবে?

১০। বলার পর অন্যে কি করবে?

১১। আপনার বলার ওপর নাটকের গতি এবং নাট্য-মুহূর্ত রচনা কতোখানি নির্ভর করছে?

১২। আপনার সজ্ঞান চেতনা কতোখানি?

১৩। আপনার সঙ্গে যিনি অভিনয় করছেন তিনি কতোখানি অভিজ্ঞ বা দক্ষ?

১৪। চরিত্রটা নিশ্চয়ই বুঝেছেন এবং আয়ত্তে আছে?

আমাদের দেহে যতগুলি স্থায়ীভাব আছে ঠিক অতগুলি ভাবকে ব্যক্ত করার জন্য 'Pause' যেমন কাজে লাগে তেমন Emphasis-কে কাজে লাগানো যেতে পারে।

যেমন,

কি! [বিষয়]

কি ! [ভয়] ইত্যাদি

শুধু বর্ণ নয় অক্ষর সমষ্টিকেও বিশেষভাবে বিশিষ্ট করা যেতে পারে।

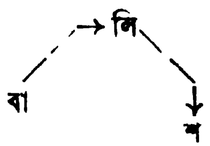
এছাড়া একই সংলাপে wave সৃষ্টি বা ছন্দের বৈশিষ্ট্য দানের জন্যে ঔচিত্য বজায় রেখে বিভিন্ন অক্ষরের ওপর আঘাত করে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করা যেতে পারে।

এ ছাড়া কোনো অক্ষরের মধ্যে যে-কোনো একটি শব্দকে জোর দিয়ে হাস্যরসও সৃষ্টি করা যেতে পারে। যেমন,

অসভ্য=অ—সভ্য।

মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার পর অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে দু'এক কথায় যা বলা চলে। কারণ আমরা মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রে আরো অন্যান্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনুপ্রবেশ করবো।

সোয়েল : সোয়েল কথাটা ব্যবহৃত হবে যে-কোনো একটি অক্ষর দিয়ে বা নিয়ে। যেমন 'বালিশ'। 'বালিশ' অক্ষরটিকে বলার সময়—'বা' শব্দটি নিচু পর্দায় ধরে 'লি' শব্দটি উঁচু তারপর 'শ' বা 'ইশ' শব্দটা নিচুতে আনবো। এই রকম দাঁড়াবে



টেলিসকপিক : একটি বাক্য : যেমন, কাল বিকেলে আমরা সবাই বাড়ী যাবো।

বাড়ী যাওয়াটা যদি কাল বিকেলে নিশ্চিত থাকে তাহলে বলার সময় এইভাবে বলতে হবে :

কালবিকেলে (বিরতি) আমরাসবাইবাড়ীযাবো।

এখানে দুবার টেলিসকপিক ব্যবহৃত হয়েছে।

সাউণ্ড একপানশন বা শব্দসম্প্রসারণ : একটি কথার মধ্যে শব্দকে সম্প্রসারিত করে কথাটির বিশিষ্ট অর্থকে প্রকাশ করা।

যেমন—বদমাই—ই—ই—শ

সাউণ্ড কনট্রাকশন বা শব্দ সংকোচন : এটি ঠিক উল্টো প্রক্রিয়া।

যেমন— কা—কা—কা—লো বউ।

স্পিড ফাস্ট : বিরতি না ঘটিয়ে এক বা একাধিক বাক্যকে দ্রুতগতিতে বলা। তবে উচ্চারণ অস্পষ্ট করে নয়। প্রতিটি কথা যেন বোঝা যায়।

স্পিড শ্লো : এক বা একাধিক বাক্যকে ধীর গতিতে বিরতি না ঘটিয়ে বলা।

ক্রিসেণ্ডো : বাক্যের মধ্যে অক্ষর সমষ্টিকে বিশ্লেষণ করার জন্য ধাপে ধাপে একটি অক্ষর যে পর্দায় বলবেন পরপর অক্ষরগুলি একটির পর একটি ক্রমান্বয়ে উঁচুতে উঠবে।

ডিমিনেণ্ডো : ঐ একই জিনিস—কিন্তু ওপরের পর্দায় ধরে ক্রমশ নিচে নামবে। উল্লিখিত দুটি পদ্ধতি শুধু যে একটি বাক্যের মধ্যে সীমিত থাকে তা নয়। বাক্য সমষ্টির মধ্যেও এই সূত্র কাজে লাগানো যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অক্ষর ক্রমান্বয়ে ওপরে উঠবে বা নামবে না। বাক্যগুলি একটির পর একটি ওপরে

উঠবে এবং ভিমিনেণ্ডোর বেলায় একটির পর একটি বাক্য ক্রমশ নিচে নামবে।

ডাওয়াল বিটস্‌ : খুব সোজা জিনিস। যেমন 'আমি যাবো না' এই সংলাপটি বলার সময় এই ভাবে বলবো। আমি যাবো না—আ—আ।

রাইজিং এ্যাকশন : কোনো কাজ করতে করতে অক্ষর বা বাক্য সমষ্টিকে ঊর্ধ্ব মুখে নিয়ে যাওয়া। আর ফলিং 'এ্যাকশন' ঠিক তার বিপরীত নিয়ম। কাজ ছাড়া সংলাপ প্রয়োগ হবে না।

এ্যাকটিভ সাউণ্ড : মনের কোনো বিশেষ ভাব—কার্যকারণ সূত্রে একটা গোটা কথায় প্রকাশ না করে একটি বা দু'টি শব্দের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা। যেমন—'অ' [দীর্ঘ বিরতি]—'হু'।

রিদিমিক সাউণ্ড : কথা বলার সময় একটা সুর বজায় রাখা। বিশেষ করে কথার শেষের দিকে সুর তীব্রতা পাবে। যেমন—

আমি বলছি—ছি—ই—ই

কাল ঠিক—যা—বো—বো—ই।

এছাড়া আরো চিন্তাভাবনা করা যায়। সে দায়িত্ব আপনারা পালন করুন।

অনুসন্ধান করুন। অন্যের মধ্যে আর কি খুঁজে পাচ্ছেন তা কাছে ধরে রাখার চেষ্টা করুন। এভাবে কাজ করতে করতে—নিজের চিন্তা-রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটাতে ঘটাতে আরো যে কতো পথ আপনি নিজে আবিষ্কার করতে পারবেন তা এই মুহূর্তে হলফ্‌ করে বলা যায় না। কিন্তু চেষ্টা করলে—ভাব-ভাবনাকে সম্প্রসারিত করে তার সঙ্গে নিজের সার্থক উপলব্ধিকে কাজে লাগাতে পারলে আরো অনেক অনেক অজানা পথ উন্মোচিত হবে আপনার দ্বারাই।



চরিত্রভাবনা ও রূপায়ণ ১১

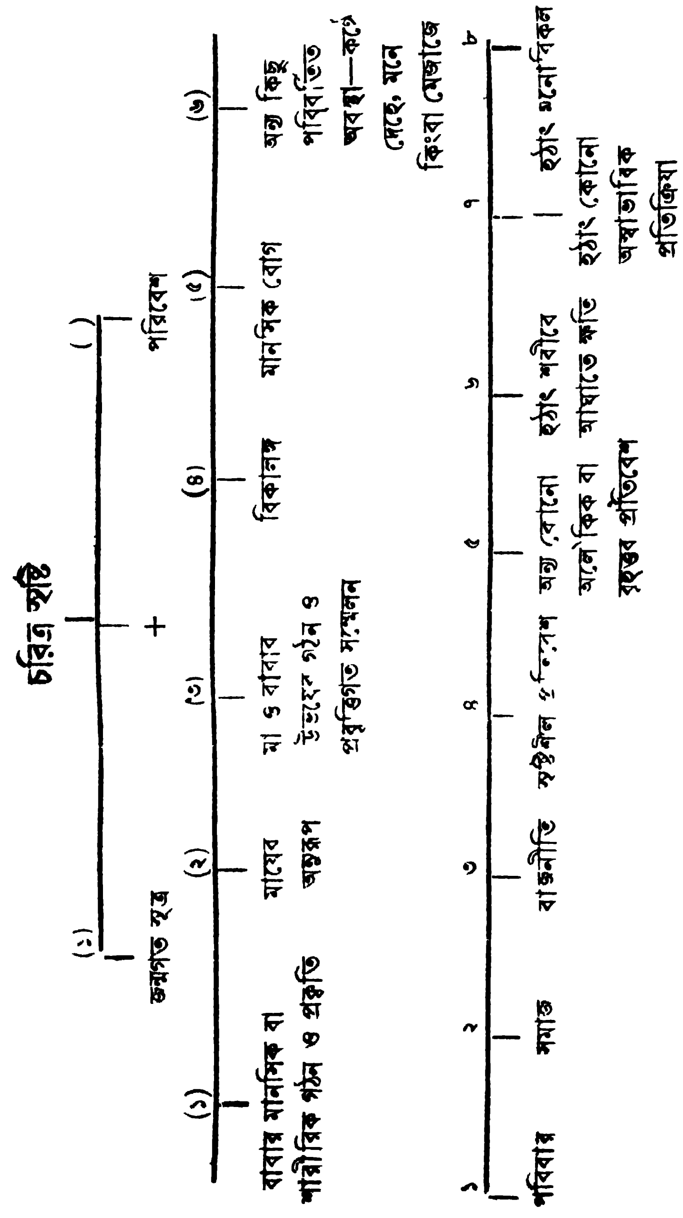
যখনই আপনি হাতে একটা নাটক পাবেন তখন আপনার কি অবস্থা হয়? পরিচালক হিসেবে নাটক পড়লে তার অনুভূতি এবং ভাবনা এক রকমের আর অভিনেতা হিসেবে যখন নাটকটি পড়বেন তখন ভাবনাটা একটু অন্য রকমের। আপনি পরিচালক অভিনেতা যদি হন তাহলে আগে দ্বিমুখী ভাবনাকে ঠিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে নিন—কোন্ ভাবনাটি আগে তা শেষ করার পর দ্বিতীয় ভাবনাটিতে ঠিক রেখে ব্যবহারগত দিক থেকে কাজে অগ্রসর হওয়াই ভালো। যেহেতু অভিনয় শিল্প আর সে শিল্প—শিল্পীকে নিয়েই। আমার কাজ সেই কারণে অভিনয়-শিল্পীর ভাবনা নিয়েই। সুতরাং এখন সেই আলোচনায় এগুনো যাক।

আপনি যখন বই পড়তে থাকবেন তখন আপনার কল্পনার জগতে আপনি চরিত্রগুলিকে পরপর দেখতে পাবেন—বুঝতে পারবেন। বই পড়তে পড়তে দেখবেন অনেক সময় আপনি বিচলিত হয়ে পড়তে পারেন। বিচলিত হবেন —কোন্ চরিত্রটি আপনার পক্ষে গ্রহণীয়। এমন কি পড়তে পড়তে চরিত্রগুলির পারস্পরিক কাজের ছবিও দেখতে পাবেন, আপনার প্রবৃত্তিগত সূক্ষ্ম ধ্যানধারণার ওপর নির্ভর করে। চরিত্রগুলি একসূত্রে গাঁথা অবস্থায় কোথায় কি রকম এবং কিভাবে আচরণ করছে তাও দেখতে পাবেন—দেখতে পাবেন চরিত্রগুলির মুখাভিব্যক্তিকে। যদি আপনি আপনার কল্পনার জগতে ছবি না দেখতে পান—যদি কথা না শুনতে পান তাহলে বুঝতে হবে আপনি স্রষ্টা নন।

এখন অভিনয়ের ক্ষেত্রে কিভাবে সূক্ষ্ম এবং বৈজ্ঞানিক দিক থেকে চরিত্র চিত্রণ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট সূত্র বের করা যাক।

এ বিষয়ে আমরা পরপর তিনটি সূত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করবো।

প্রথম সূত্র :



সূত্র : বয়েস এবং লিঙ্গবিভাজনের স্তর অনুযায়ী জন্ম থেকে চরিত্রের বিভিন্ন পর্যায়ক্রম দেখা যায়। এই পর্যায়ক্রমকে সুবিধামতো সাজিয়ে নেয়া যাক।

শারীরিক>সামাজিক>মানসিক

কেউ যদি সামাজিক>শারীরিক>মানসিক—এই ভাবে সাজাতে চান তাতেও কোনো আপত্তি নেই। আসলে একটা ছাড়া অন্যটা নয়। আর মূল রহস্যটা আরো গভীরে। আমরা না হয় সূত্র নিরূপণের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ভাবে সাজিয়ে নিই।

শারীরিক	মানসিক	সামাজিক
১। দেহের কাঠামো	১। শিক্ষার প্রভাব	১। জাতি
২। দেহের ওজন	২। পরিবেশের প্রভাব	২। বর্ণ
৩। গায়ের রঙ	৩। ধর্ম বা রাজনৈতিক প্রভাব	৩। প্রতিপত্তি ও প্রভাব
৪। চোখ, নাক, মুখের আকৃতি ও গঠন	৪। জন্মগত প্রভাব	৪। শিক্ষা
৫। মাথার চুলের রঙ ও প্রকৃতি	৫। পারিবারিক জীবনে মানসিক গঠন	৫। সংস্কার
৬। বয়স	৬। সামাজিক জীবনে মানসিক গঠন	৬। পেশা
৭। উচ্চতা	৭। কনজুগাল লাইফে মানসিক দ্বন্দ্ব	৭। অর্থনৈতিক অবস্থা
৮। লিঙ্গ	৮। হতাশা	৮। নেশা বা হবি
৯। আচার-আচরণ	৯। উচ্চাশা	৯। পারিবারিক সুখ ও সমৃদ্ধি বা অবক্ষয়
১০। দেহের খুঁত	১০। নৈতিকতা	১০। রাজনৈতিক
১১। চলাফেরায় কোনো বৈশিষ্ট্য	১১। বিভ্রান্তি	১১। সংস্কৃতির
১২। জন্মগত সূত্র	১২। মেজাজ	১২। [illegible]দেশের প্রভাব
১৩। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোনো খুঁত	১৩। নীতিবোধ	১৩। সামগ্রিক রুচি
১৪। কথা বলার বৈশিষ্ট্য	১৪। জীবনবোধ	১৪। মানুষ দেখে জীবনবোধ
১৫। শরীরে কোনো অসুখ	১৫। রসবোধ	১৫। সমাজের সপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো জেহাদ ঘোষণা
১৬। পটুত্ব (বিশেষ কোনো প্রিয় বিষয়ে)	১৬। কমপ্লেক্স	১৬। কথা বলায় বৈচিত্র্য।
১৭। নিজের শরীরকে চেনা	১৭। অন্তর্মুখীন মানসিকতা	১৭। নিজের সমাজকে বিশেষ দেখা
১৮। কথা বলার ধরন	১৮। বহির্মুখীন মানসিকতা	
	১৯। স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য	
	২০। অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য	
	২১। অনুভূতি শক্তি	
	২২। নিজের মনকে চেনা	
	২৩। কথা বলায় ভাবালুতা	

তৃতীয় সূত্র : একটি চরিত্র যখন পুরোপুরি পরিমার্জিত রূপ রস গন্ধে সম্পূর্ণ হয়ে বাস্তবে অর্থাৎ মঞ্চজগতে রূপায়িত হয় তখন-কার সূত্রটা অনেকটা এইরকম

সংলাপ > মুখাভিব্যক্তি > আচার-আচরণ > চলাফেরা > বসনভূষণ এবং অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা

এই সূত্রকে সামগ্রিকভাবে রূপায়ণে সাহায্য করে টিম ওয়ার্ক, আবহ সংগীত এবং আলোকসম্পাত ও অন্যান্য শিল্প-সামগ্রী।

চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট কয়েকটি দিক আগে থেকে মাথায় ধরে রাখতে হবে। আপনি নিয়মিত অনুশীলন এবং প্রাথমিক সূত্র ধরে নিজের চরিত্রটি রূপায়ণের জন্য সচেষ্ট হবেন সততই। কিন্তু আপনাকে দেয় চরিত্রটি যখন বাস্তবে এসে সার্থক রূপ নেবে তখন আনুষঙ্গিক এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আপনাকে সচেতন হতে হবে। সেই বিষয়গুলি কিন্তু চরিত্র রূপায়ণের বা চরিত্রভাবনার বাইরের কোনো জিনিস নয়।

১। চরিত্রের পরিমাপ, পরিমিতি এবং ঔচিত্য অনুযায়ী নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা

২। আপনি যে চরিত্র রূপদান করছেন সেই চরিত্রের সঙ্গে নাটকের অন্যান্য চরিত্রের সম্পর্ক

৩। কেন আপনি নাটকের একটি বিশেষ চরিত্র হয়ে উঠলেন

৪। মঞ্চে উঠে দর্শকের সামনে আপনার কাজ কি

৫। অন্যান্য শিল্পের প্রয়োগগত দিক আপনার চরিত্র রূপায়ণে কতোটা সার্থকতার পথ সৃষ্টি করতে সমর্থ হোচ্ছে

৬। নির্দেশকের নির্দেশাবলী সম্পর্কে সচেতন হওয়া

৭। মঞ্চে ওঠার আগে গভীরভাবে প্রস্তুতি নেবেন সর্ব বিষয়ে

আপনি মঞ্চে প্রবেশ করার আগে মঞ্চের পরিস্থিতি কি ছিল—আপনি কি করবেন—তারপর মঞ্চে উঠে কি করলেন—এবং করার পর নাটকের পরবর্তী অংশে আপনার অবস্থিতির প্রভাব কতোটুকু রইলো।

এখন সূত্র তিনটি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয় মনে রাখার চেষ্টা করুন। কারণ—এই সূত্র ধরেই চরিত্র সৃষ্টির কাজে এগুলো প্রথমে একটু জটিল হলেও ধীরে ধীরে তা সহজ এবং সরল হয়ে উঠবে। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে—একটি সার্থক চরিত্রসৃষ্টির জন্যে মূল উপাদানগুলি কোথায় পাবো?

উত্তর : ১। নিজের সংলাপের মধ্যে
২। অন্য চরিত্রের সংলাপের মধ্যে
৩। নাট্যকারের বিবৃতি
৪। পরিচালকের ব্যাখ্যায়
৫। নিজস্ব অনুভূতি—লোকচরিত্রের জ্ঞান

সেইজন্যে আদ্যোপান্ত নাটকটা পুরোপুরি বেশ কয়েকবার আপনাকে পড়তে হবে। নিজের সংলাপে যেখানে বৈশিষ্ট্যটি উল্লিখিত নেই—আপনি নেই এমন কোনো দৃশ্যে হয়তো অন্য একটি চরিত্র আপনার সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বললো। সেই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি যদি আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি বিশেষ অঙ্গ হয় তাহলে সেই উৎস আপনি পেয়ে যাবেন ছড়ানো ছিটানো বিক্ষিপ্ত সংলাপের মধ্য থেকে। আর যদি সেই গুরুত্বপূর্ণ সংলাপটি আপনার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য না হয় তাহলে সংলাপটি যিনি বলছেন সেই চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য হলো অপরের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঘাটাঘাঁটি করা।

মোট কথা বই পড়ার সময় নিজের প্রাপ্য চরিত্রটি সম্পর্কে যে শুধু ভাববেন তা চলবে না। অবিশ্যি নাটক পড়ার সময় পরিচালকের আপনার ওপর আস্থা থাকলে নিজের চরিত্র বণ্টনের ভার আপনাকেও দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনি একটি চরিত্রকে 'টারগেট' করবেন—কিন্তু অন্য চরিত্রগুলি আপনার ভাবনার বাইরের কোনো ব্যাপার যেন না হয়।

অনেকে আবার ঠেকা দিয়ে—'স্টেজে ম্যানেজ করে নেব'। এসব কথাও বলেন। এই সব কথা—অবুঝ বেয়াদপের কথা। এমনও দেখা গেছে নাটক পড়ে চরিত্রের বাছবিচার করে তবে নাটক মনোনীত করেন। ও করুন—কিন্তু অভিনেতা অভিনয় করলেও তিনি তো একটি নির্দিষ্ট চরিত্রের পরিচ্ছন্ন রূপকার। আর এই কাজটি সমাধান এবং সার্থক করতে গেলে—ছোটখাট, আশেপাশের কোনো জিনিসকেই উপেক্ষা করা চলে না।

'পাঠ লিখেছেন?' 'হ্যাঁ।'

'কৈ দেখি? এ কি! আপনার চরিত্রটি সযত্নে রেখে যাদের সঙ্গে অভিনয় করছেন তাদের চরিত্রগুলি ডট ডট দিয়ে শুধু শেষের দুটো অক্ষর লিখেছেন কেন?'

—'তারপর? অন্যে যখন অভিনয় করবেন তখন তিনি কি বলবেন এবং বলার সঙ্গে সঙ্গে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মঞ্চে আপনি আপনার উপস্থাপ্য চরিত্র সম্পর্কে দর্শকদের কি ধারণা দেবেন?'

'রিহার্সালে ঠিক করে নেব।'

রিহার্সাল কম হলে, কিংবা রিহার্সালের দিন আপনার প্রতি অভিনয়-শিল্পী যদি কোনো কারণে উপস্থিত না হতে পারেন?'

'আরে মশাই—প্রতিভা বলে একটা জিনিস আছে তো। কি ভ্যান্ ভ্যান্ করছেন—কেউ না এলেও—কেউ ভুল করলেও—আমি ঠিক আমার প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে—দেখবেন ঠিক সবাইকে টেনে তুলবো।'

'বুঝলাম!'

কি বুঝলাম আর বলে লাভ কি! সরস্বতীর বরপুত্র। নিজের প্রতিভার ওপর কি ভীষণ আস্থা! শিক্ষা বা নাট্যশিল্পের জন্যে কোনো ম্যানেজমেণ্টকে এঁরা তারিফ করবেন না। কারণ—এনারা ম্যানেজ মাস্টার। তাছাড়া ওসব কাজে তো বাজে সময় নষ্ট! এতো অভিনয় এদেশে হোচ্ছে—কেউ কি এতো কথা ভাবে! বটেই তো। সখের দল, গোটা চিৎপুর—এমন কি নামজাদা শিল্পীদের নিয়ে নাট্যকে গোষ্ঠীরা নম্বরী ছাঁচে এবং মাপে এবং ডট ডট দিয়ে চরিত্র উপলব্ধির বিষয়টা এখনো ছাড়তে পারছেন না। তবে সত্যি কি বিজ্ঞানসম্মতভাবে কাজের প্রচেষ্টা হচ্ছে না? কেউ কি ভালো কাজ করার কথা ভাবছেন না? নিশ্চয়ই ভাবেন।

আমি বলি একশোবার ভাবে। আমি যা বলছি তার চেয়ে হাজার গুণ ভাবে। ভাবে বলেই তো—শম্ভুমিত্তির—শম্ভু মিত্তির। অজিতেশ বাঁড়ুজ্যেকে কে ছাড়িয়ে যাচ্ছে? উৎপল দত্তের ভূমিকা কি অশিক্ষার নামান্তর? ইব্রাহিম আলকাজি, হাবিব তনভির, বলবন্ত গার্গে, গিরিশ কার্নড, বসন্ত বাপাট কিংবা রুদ্রপ্রসাদ, নিমচাঁদ জৈন—এঁরা সব বরেণ্য প্রতিভা—এঁরা কি রাতারাতি ভারতবর্ষের মঞ্চ জগৎ দখল করতে এগিয়ে এসে জয়ী হয়েছেন? নাকি দীর্ঘ সাধনা, দীর্ঘ শিক্ষা আর দীর্ঘ অনুশীলনের মাধ্যমে এগিয়ে নিজেদের স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন?

নাটক করা যদি সখ আর অবসর বিনোদনের মাধ্যম হয় তাহলে আপনার সঙ্গে আমার আড়ি—আমি এখন তাহলে যাই বাড়ী।

কিন্তু এর মধ্যে যদি কেউ অনুসন্ধিৎসু থাকেন তাহলে আরো একটু অপেক্ষা করুন।

হ্যাঁ—কি নিয়ে যেন কথা হোচ্ছিল? চরিত্র ভাবনা এবং রূপায়ণ নিয়ে।

তৃতীয় সূত্রটি মঞ্চে প্রয়োগ বা রূপায়ণের জন্য। তবুও এখানে আর একটি কথা বলা যাক।

মঞ্চে চরিত্র রূপায়ণে আর একটি সংক্ষিপ্ত সূত্র আছে। যেটা হলো W⁴।

1) W = Who are you ? বা, কে তুমি ?

2) W = Where you are ? বা, কোথায় তুমি ?

3) W = When you are ? বা, কখন তুমি ?

4) W = Why you are ? বা, কেন তুমি ?

মনে রাখবেন মঞ্চে আপনি যতবার উপস্থিত হবেন ততবারই আপনাকে ওপরের সংক্ষিপ্ত সূত্র অনুযায়ী প্রশ্ন করা হবে। আপনি নিশ্চয় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবেন এবং দিতে থাকবেন।

যেমন—১। 'কে তুমি ?' কে তুমি অর্থে—নাম, পেশা, শিক্ষা, কোথায় থাকো, বয়স কতো ইত্যাদি।

২। 'কোথায় তুমি ?' (বাস্তবতঃ—মঞ্চে) ড্রইং রুমে, বাগানে, ডাস্ট-বিনের ধারে, রাজপ্রাসাদে না জঙ্গলে—ইত্যাদি।

৩। 'কখন তুমি ?' সময়—সকালে, বিকালে না সন্ধ্যায়—গ্রীষ্মে বসন্তে না শীতে ? যখন মঞ্চে প্রবেশ করলে তখন মঞ্চে কি হচ্ছিল—নিশ্চয়ই কিছু হচ্ছিল—নয়তো দর্শক অপেক্ষা করে কিছু-না-কিছু হবে তাই দেখতে এসেছেন। হয় অন্যে বা অন্যেরা যখন কিছু করছিল নয়তো কিছু করার জন্যে যে-সময়টা নির্ধারিত সেই সময়ে তুমি মঞ্চে প্রবেশ করলে। এটাই হোচ্ছে 'কখন তুমি'র উত্তর

৪। 'কেন তুমি ?' ঔচিত্য বা লজিক এবং বাস্তবতা। কারণহীন প্রবেশ করা হয় না—কারণহীন অবস্থান বা প্রস্থান হতে পারে না। আপনি নাটককে এগিয়ে দেবার জন্যে একটি চরিত্রের আড়ালে নিজেকে ঢেকে মঞ্চে প্রবেশ করেছেন। সেখানে নাটকের বক্তব্য, ঐ সময়ের পরিস্থিতি, কার্যাবলী যা ঘটে গেছে, যা ঘটাতে এসেছেন এবং যা আপনার দ্বারা ঘটবে—সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পথ আগেই প্রস্তুত থাকবে, নাটকের বিষয়, প্রয়োগ প্রধানের ব্যাখ্যা এবং আপনার ভাব-বিনিময়ের ক্ষমতার ওপর এ কাজে অর্থাৎ 'কেন তুমি' এই প্রশ্নের সঠিক জবাব পাবেন।

মঞ্চে আপনি যতবার প্রবেশ করবেন ততবারই এই প্রশ্নগুলো নিজের সঙ্গে নিজে বিনিময় ঘটিয়ে আগে নিজেকে প্রস্তুত করে নেবেন মানসিক দিক থেকে এবং পরে রূপায়ণের জন্যে আপনার কণ্ঠ কিভাবে, শরীর কোথায় কি

ভাবে কাজ করবে তা একবার মনে মনে ঝালিয়ে নেবেন। এই কাজ করার সময় মঞ্চে অন্যান্য শিল্পীরা আপনাকে কতোটা সহযোগিতা করবে এবং আপনিও তাদের কতোটা সহযোগিতা করবেন তা আগে ভাগে ঠিক করে নেবেন এটাই স্বাভাবিক।

কারণ এ সব বিষয় মহলার সময় ঠিকভাবেই অনুশীলিত হয়েছে। চরিত্র-রূপায়ণের ক্ষেত্রে মহলাগৃহের তাৎপর্য অনিয়মানুবর্তিতা এবং কাজ ছাড়া অন্য কাজের কোনো আলোচনা নয়। কারণ সার্থক মহলাই যেমন সামগ্রিকভাবে দলগত স্বার্থ বজায় রাখতে সক্ষম হবে, ঠিক তেমনি নিজের চরিত্র রূপায়ণের পীঠস্থান হিসেবে পরিগণিত হবে। তাই মহলা এবং মহলা কক্ষকে কখনো অবজ্ঞা নয়—মহলার স্থান কখনোই নিছক আড্ডাবাজদের জন্যে নয়। পবিত্র স্থান। এখানে নোংরামী নয়—এখানে অনুশীলন আর সাধনা। নাট্যমঞ্চ যেমন আপনার মতো সাধকের স্থান—মহলাকক্ষও তেমনি পবিত্রস্থানের অন্ত প্রবেশের অন্যতম সোপান। কাজেই মহলায় উপেক্ষা নয়—ঘৃণা নয়—বিদ্বেষ নয়--মহলা কক্ষও সাধক-সম্মেলনের একটি যুগ্ম প্ল্যাটফর্ম—সব বিতর্ক বিদ্বেষের উর্ধ্বে একটি পবিত্র প্রেক্ষাপট। এ জায়গায় যার ভক্তি নেই—মঞ্চে ওঠবারও তার শক্তি নেই। তার দম্ভ ক্ষণিক। এমন কি অজ্ঞ বাচালদের এই স্থান থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন।

এতে কাজ শুরু হতে দেরী হয় হোক—কিন্তু অসতর্ক—বেহিসেবী—খামখেয়ালী এবং মোহগ্রস্তদের দূরে সরিয়ে দিন সবার আগে। তবে সখের জন্যে যাঁরা বছরে একদিন নেহাৎ বিনোদনে অংশ নেবেন—আমি তাদের কথা বলতে চাই না। আমি বলছি—প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁরা নাটক নিয়ে সাধনা করবেন তাদের কথা।



মঞ্চাভিনয়ঃ দৃষ্টিগ্রাহ্য বৈচিত্র্য ১২

অভিনয় কেউ ধরে শেখাবে—এমন কল্পনা বা প্রত্যাশা করার চেয়ে অভিনয় কি করে ধরে ধরে শিখতে হয়—আয়ত্ত করতে হয় সেবিষয়ে চিন্তা করলে কার্যতঃ অনেক সুফল পাওয়া যায়। পরের ওপর পর্যাপ্ত নির্ভর করে কালক্রমে আপনি দম দেয়া পুতুল হয়ে উঠতে পারেন। নিজের ওপর যেমন নির্ভরশীলতা থাকবে না—ভবিষ্যতে প্রয়োজনার খাতিরে আপনার ওপর কেউ নির্ভরও করবে না। তাই বারবার আত্মসমীক্ষার দিকে নজর দেয়ার জন্যে বলছি।

কেউ দু'একটা ছবিতে অভিনয় করে তালেবর হয়ে পড়েছেন—তাকে না হলে চলে না বা চলতে পারে না—কেননা অমুকের নামডাক অনেক। এসব কথা—নির্দিষ্ট শিল্পীকে বা অস্থায়ী অভিনয় আসরকে পপুলার করার জন্যে এবং ব্যাপারটা কি শুধু অভিনয় করে পয়সা লোটার জন্যে? আমি আপনার কথা বলছি। আপনি যদি হঠাৎ কোনো পপুলার শিল্পী হন তাহলে ভবিষ্যতের কথা ভেবে আপনাকে আবার শিক্ষণের ক্ষেত্রে নামতে হবে। যদি আমার মতো ডালরুটী খাওয়া মানুষ হ'ন তাহলে গোড়া থেকে শুরু করাই ভালো। হঠাৎ করে রাজপ্রাসাদ পেলে আত্মম্ভরিতা বাড়তে পারে—কিন্তু তা সাময়িক। কারণ যখন জানতে পারবেন—বুঝতে পারবেন ঐ গোটা প্রাসাদে কেবল আপনি একা আর কিছু পায়রা পাখী এবং সেই প্রাসাদকে জিইয়ে রাখার মতো অর্থ আপনার নেই তখন কি হবে? দম্ভ কোথা যাবে?

কাজেই আমার মনে হয় হঠাৎ কোনো বস্তু বা প্রশংসা পাওয়ার কোনো স্থায়ীত্ব নেই—মনে হয় তা বড় ক্ষণ-ভঙ্গুর। তাই শিল্প সাধনার ক্ষেত্রে অনেক কিছু বিচার-বিবেচনা করে—আসল নকলকে বুঝে—কোন্‌টা গ্রহণীয়, কোন্‌টা বর্জনীয় তা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে তবেই কাজের মধ্যে হাত লাগানো ভালো।

আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সমস্তার মধ্যে সমতা না রেখে যদি জীবনচালানোর চেষ্টা না করেন তাহলে জীবনে যেমন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা তেমনি নিজের শক্তি ক্ষমতা বিদ্যাবুদ্ধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হয়ে যদি অভিনয়-শিল্পে অনুপ্রবেশ করেন তাহলে প্রকৃতিপ্রদত্ত বিরাট প্রাসাদে কখন যে আপনার অজান্তে ফাটল ধরবে তা আপনি জানতেই পারবেন না। হতাশা—শিল্প-শিল্পীদের প্রতি বিদ্বেষ—অনীহা জাতীয় রোগগুলি আপনাকে সহজে আক্রান্ত করবে।

আপনি যদি যা কিছু জানার জেনে—যা কিছু উপলব্ধির তা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে অভিনয় করতে গিয়ে সাফল্য নাও পান তাতেও ক্ষতি নেই। কারণ আপনি যা করেছেন তা নিজের কাছে ঠিক—নিজের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেননি বলেই আপনার পক্ষে আপনার বড় সান্ত্বনা।

বর্তমানে যে বিষয়কে নিয়ে আলোচনা হবে আপাতঃ দৃষ্টিতে তা একটু কঠিন বলে মনে হতে পারে। তাই বর্তমান বিষয়টি একটু অভিনিবেশ সহযোগে অধ্যয়ন করতে অনুরোধ করছি। কারণ এই বিষয়টির ওপর এর আগে এদেশে খুব একটা বিশেষভাবে আলোচনা হয়েছে বলে মনে পড়ছে না।

শরীর, মন, মস্তিষ্ক, কণ্ঠ এবং অঙ্গসঞ্চালন ইত্যাদি বিষয়ে আগে আলোচনা হয়েছে। এখন দৃষ্টিগ্রাহ্য বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা।

একবার ভেবে দেখেছেন কি—আপনি মঞ্চের যে জায়গায় দাঁড়িয়ে বা বসে অভিনয় করেন বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা দর্শক নিজের স্থান থেকে আপনার কোন্ অংশ কতটুকু দেখতে পাবেন? দর্শকের দিক থেকে বাঁ দিকে যিনি বসে আপনার অভিনয় দেখছেন—আপনি হয়তো DL-এ ৪৫° এ্যাঙ্গেলে দাঁড়িয়ে আছেন—যে দর্শক ডান দিকে বসে অভিনয় দেখছেন তিনি কি একই ভাবে আপনাকে দেখতে পাবেন? তা ছাড়া আমাদের দৃষ্টিশক্তি কতোখানিই বা তীব্র! সামনের সারিতে বসে একজন আপনাকে ঠিক যতটুকু দেখতে পাবেন

প্রেক্ষাগৃহের শেষ সারির দর্শক কি আপনাকে ঠিক ততটুকু দেখতে পাবেন? মোটেই নয়। সুতরাং অভিনয় করার সময় গুরুত্বপূর্ণ অংশকে প্রতিপাদ্য করার জন্যে মঞ্চের কোন্ স্থানে কিভাবে দাঁড়িয়ে অভিনয় করলে মোটামুটিভাবে দর্শকসারি ডান থেকে বাঁ প্রথম থেকে শেষ সারির দর্শক পর্যন্ত সব কিছু ভালো জিনিস দেখতে পাবে—সে বিষয়টা ভাবা উচিৎ।

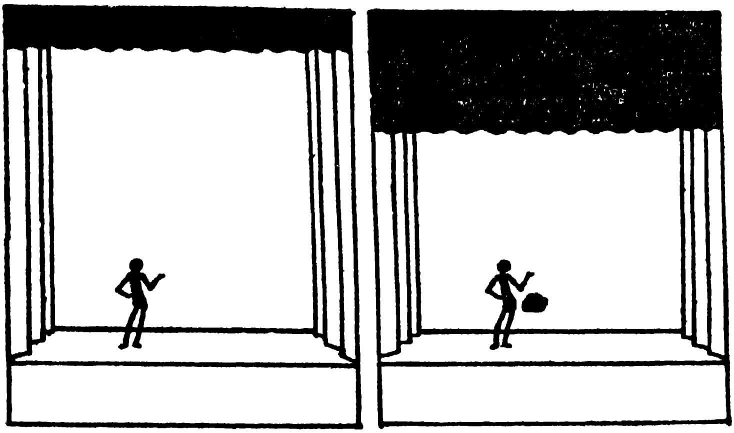
অভিনেতার ইনার টেকনিকের পর টেকনিক্যাল বিষয়ের ওপর বাস্তব জ্ঞান অবশ্যই অর্জন করতে হবে। তাহলে প্রথমে মঞ্চকে চেনা যাক।

UR	UM	UL
CR	CM	CL
DR	DM	DL

ছোট বড় মাঝারী যে-কোনো জাতের মঞ্চ হোক না কেন মোটামুটিভাবে কাল্পনিক রেখা টেনে মঞ্চটাকে নভাগে ভাগ করে নেয়া চলে কাজ চলার খাতিরে। মঞ্চকে না চিনে—তার acting area না জেনে—মঞ্চে এসে অভিনয় করতে গেলে অনেক বিপাকে পড়তে হয়। এক সময়ে দেখা যাবে আপনি মঞ্চের অধীনে চলে যচ্ছেন। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। মঞ্চ থাকবে আপনার অধীনে। শুধু মঞ্চ চেনাতেই সব নয়। মঞ্চে কোথায় কি আসবাব আছে। তার উচ্চতা, দীর্ঘতা সমস্ত সবকিছুকেই আগে ভাগে জেনে রাখতে হবে। দরজা কোথায় এবং কটা আছে। দরজা না থাকলে side wing দিয়ে যাতায়াতের কোন্ পথটা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তা মাথায় রেখে তবেই মঞ্চে আসতে হবে। নইলে বাইরে যাবার দরজা বা wings দিয়ে প্রবেশ করে ভেতরে যাবার দরজা দিয়ে প্রস্থান করবেন। এতে দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়বেন।

অনেক সময় মঞ্চ নির্মাণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিশেষভাবে অস্থায়ী মঞ্চ নির্মাণের ক্ষেত্রে লম্বা, চওড়া এবং উচ্চতার পরিমাপ একই। কিন্তু প্রয়োজন মতো মঞ্চ যতটা চওড়া হয় উচ্চতায় ঠিক ততটা পরিমাপ রাখলে দৃষ্টিগ্রাহ্য বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। আড়াআড়িভাবে মঞ্চের

খোলা অংশ অনেকটা পরিমাণ দেখা গেলে অভিনয়-শিল্পীদের আকার উচ্চতার দিক থেকে খুবই তা ছোট দেখাবে। তাই যদি কোনো কারণে মঞ্চের খোলা অংশের উচ্চতা খুব একটা বেশী হয় তখন ওপর থেকে পর্দা বা স্কাইকে একটু নিচে নামিয়ে দিতে হবে। নচেৎ বেঁটে বা লম্বা মানুষকেও বেশখানিকটা খাটো দেখাবে। মঞ্চ নির্মাণের দিক থেকে অভিনেতা এই দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হলে চরিত্রচিত্রণে উপযুক্ততা প্রমাণ করতে তিনি অনায়াসে সফল হবেন। নিচের পাশাপাশি ছবি দুটির দিকে লক্ষ্য করুন।



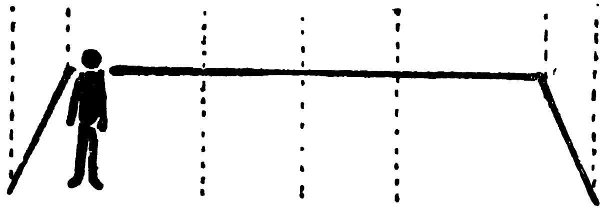
উচ্চতায় খোলা মঞ্চে শিল্পীর ওপরের ফাঁকা অংশটুকু পূরণের জন্যে যথারীতি ব্যবস্থা থাকলে আলাদা কথা। কিন্তু এই শূন্যস্থান পূরণের জন্যে যে-কোনো জিনিস ব্যবহার করুন না কেন তা কিন্তু নির্দিষ্ট চরিত্রের আকারের চেয়ে বেশী হলে চরিত্র ছাপিয়ে অন্য বস্তুর প্রাধান্য বেশী বড় হয়ে উঠবে। সেকারণে মঞ্চ নির্মাণের ক্ষেত্রে যে পরিমাণে চওড়া হবে উচ্চতাকে তার চেয়ে কম পরিমাণে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। চওড়া ৩০ ফুট হলে উচ্চতা ১৫-২০ ফুটের বেশী রাখা উচিৎ নয়। ভেতরের ঘনত্ব অবশ্য বেশী রাখতে হবে এমন কি উচ্চতাও। কিন্তু দৃশ্যমান উচ্চতা সম্পর্কে একটি পরিশীলিত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

ধরুন মঞ্চে আপনি একা অভিনয় করছেন। অনেকখানি সংলাপ আছে। চরিত্রের expression-টাই প্রথমে প্রধান জিনিস। সুতরাং মঞ্চে এসে আপনি কোথায় দাঁড়াবেন। কথা শুরু করে বা কথা বলতে বলতে যদি আপনি move করেন তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু মঞ্চে এসে প্রথম দাঁড়ানোটা এমন

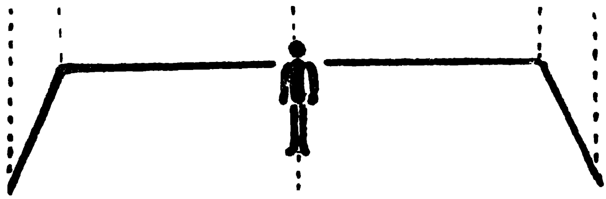
হওয়া উচিৎ যাতে করে সব জায়গার দর্শক আপনার উপস্থিতি এবং আপনার সর্বাঙ্গটা ঠিকভাবে দেখতে পান। যদিও জানি—দুচোখের দৃষ্টিশক্তির একটি নির্দিষ্ট পরিমণ্ডল আছে, যার জন্যে একই মানুষ দুচোখে একটা গোটা মানুষকে সম্পূর্ণরূপে দেখতে পায় না। প্রথমে হয়তো মুখ তারপর দেহ তারপর পা এইভাবে একটা গোটামানুষকে যতটা সম্ভব গোটা হিসেবে দেখার চেষ্টা করি।

কিন্তু মঞ্চের কোন্ জায়গাটায় দাঁড়ালে ব্যাপারটা দৃষ্টিগ্রাহ্য হবে? নিচের ছবিটার দিকে লক্ষ্য করুন।

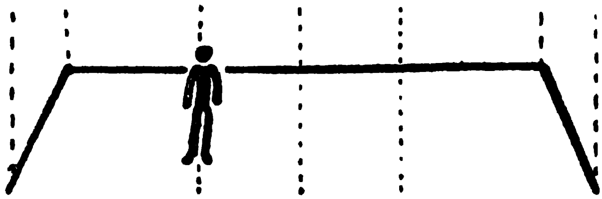
লক্ষ্য করুন মঞ্চের সেনটার লাইনটা কোথায় আছে। লক্ষ্য করুন



শিল্পীর দাঁড়ানোতে মঞ্চের অনেকখানি জায়গা খোলা পড়ে রয়েছে। তাই মঞ্চের কখনো ভ্যাকুউম সৃষ্টি করতে দেয়া উচিৎ নয়। তাছাড়া এভাবে দাঁড়ালে দর্শকের দিক থেকে বাঁ এবং একবারে ডান দিকে ঘেঁসে বসা দর্শকরা হতাশ হবে। তাহলে উপায়, নিচের ছবিটার দিকে লক্ষ্য করুন।



এভাবে position নিলেও চলতে পারে। কিন্তু কেমন যেন গতানুগতিক। তাহলে উপায়। নিচের এই ছবিটা লক্ষ্য করুন।

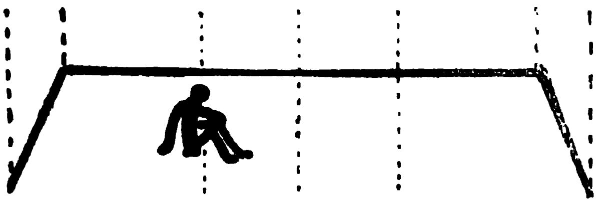


মঞ্চের উল্লিখিত স্থানটি অর্থাৎ CR ঘেঁসে দাঁড়ালে একটা Contrast সৃষ্টি হতে পারে। অনুরূপ •CL-এ দাঁড়ালেও। কিন্তু দর্শকদের দিকে

মোজাসুজি না দাঁড়িয়ে প্রোফাইল চেঞ্জ করে দাঁড়াতে পারলে কনট্রাস্টটুকু ভালোভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে দর্শকের সামনে পরিস্ফুট করা যায়।

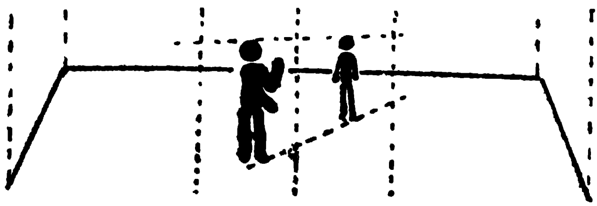
শুনেছি—গিরিশ বাবুর যুগে অভিনয়-শিল্পীরা সারি বেঁধে প্রবেশ করে সারিবেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এযুগে এমন রেয়াজ এখনো আছে। তবে লাইন ধরে আসাযাওয়ার মধ্যে রীতিমতো Contrast দেখা যায়। গিরিশ যুগের অভিনয়ের বিশেষ করে গ্রুপ অভিনয়ের ছবির দিকে একটু ভালোভাবে নজর দিলে দেখা যাবে সারিবেঁধে আসা যাওয়া করলেও গ্রুপ একটিং-এ অভিনয়-শিল্পীদের অবস্থিতির একটা উঁচুনিচু রেখাচিত্র লক্ষ্য করা যায়। দাঁড়ানোর ব্যাপারটা আজকের যুগে দৃষ্টিকটু হলেও রেখাচিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে সে যুগের বৈচিত্র্য সৃষ্টির বহু নমুনা বহু ছবির মধ্যে আঁটা রয়েছে।

এবারে একজন অভিনেতা আগের ছবির মতো একজায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে একটু অন্যভাবে যখন বসে থাকে তখন মঞ্চে কেমন সুন্দর ছবি সৃষ্টি হয় তা লক্ষ্য করুন।



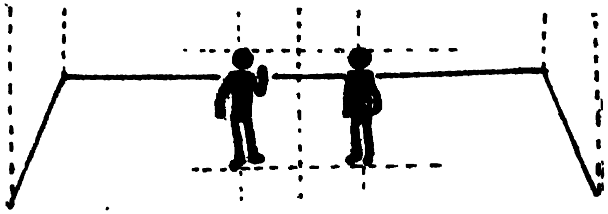
এই তো গেলো একজন অভিনয়-শিল্পী নিয়ে কাজকর্মের কিছু মামুলি কথা। এবারে আসুন একাধিক শিল্পীদের নিয়ে মঞ্চের ওপর টেকনিক্যাল দিকটা (শুধু শরীর নিয়ে) কিভাবে দৃষ্টিমধুর করা যায়—তা দেখা যাক।

প্রথমে দুজন শিল্পীর অবস্থিতি নিয়ে।



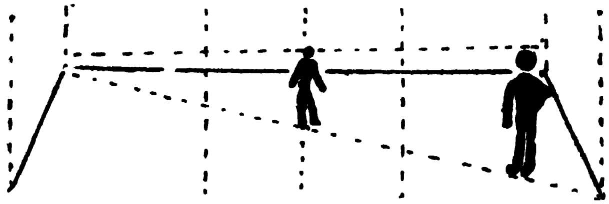
ওপরের Composition নিঃসন্দেহে সুন্দর। কিন্তু যে দর্শক একেবারে বাঁদিকে বসে আছেন তিনি up stage-এর শিল্পীকে দেখতে পাবেন না। প্রথমজনের দেহের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাবেন। অথচ ডান দিকে যিনি বসে

আছেন এবং মধ্যিখানে যিনি বসে আছেন তিনি ঠিকই দেখতে পাবেন। দাঁড়ানোর এবং মাথার ওপর রেখা চিত্রে বৈচিত্র্য আছে—কিন্তু সবদিক থেকে দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। তাহলে নিচের ছবিটার প্রতি একবার চোখবুলিয়ে নিন।

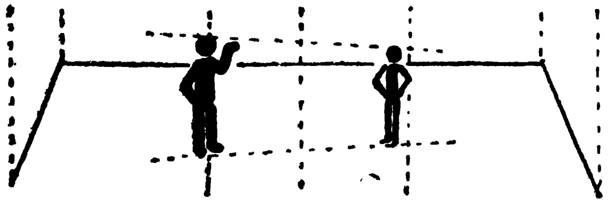


এক্ষেত্রে খুব একটা contrast সৃষ্টি হচ্ছে বলে মনে হয় না। তথাপি এর মধ্যে দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয়টি পরিষ্কার।

কিন্তু যদি এইভাবে সাজানো যায় তাহলে রেখাচিত্রে একটা contrast আসে এবং দেখতেও ভালো লাগে। নয় কি ?

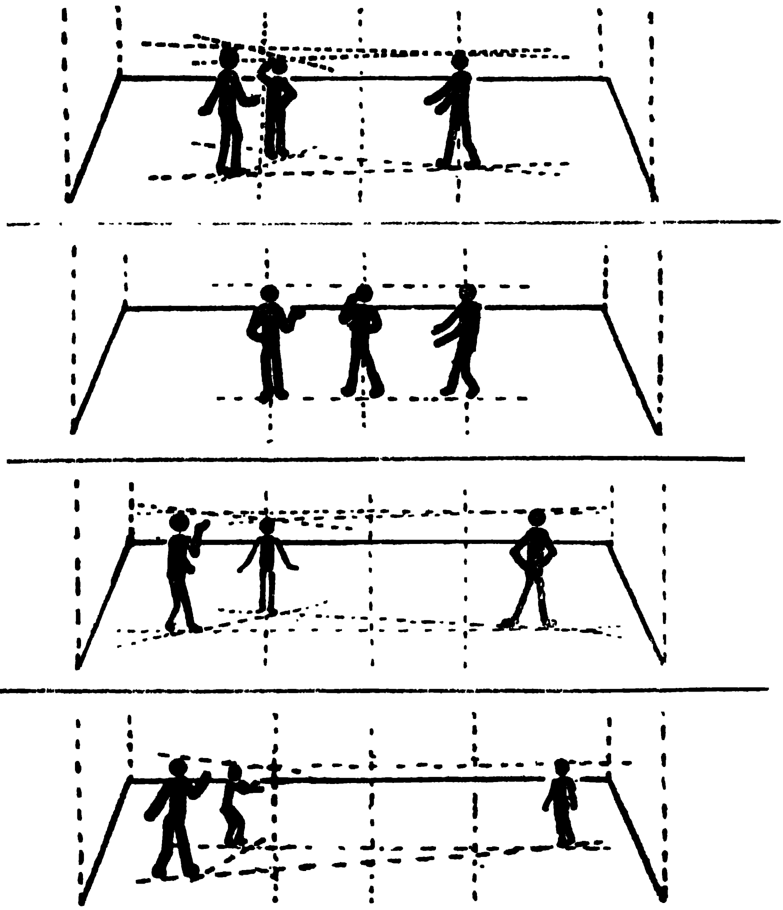


সুতরাং মঞ্চের পরিমিতি অনুযায়ী, শিল্পীদের উচ্চতা ইত্যাদি বিবেচনা করে মঞ্চের ওপর সরলরেখা ছাড়া বিভিন্নভাবে রেখাচিত্র সৃষ্টি করার কথা পরিচালককে যেমন ভাবতে হবে, তেমন ভাবতে হবে অভিনেতাদের। নইলে নিচের ছবির কমপজিশন বাতিল করতে হয়, কারণ একঘেঁয়ে গতানুগতিক style বলে।



তিনজনকে নিয়ে Composition রচনার পর পর চারটি ছবি সাজিয়ে দিলুম। এর মধ্য থেকে আপনার কোন্ ছবিটি বিশেষভাবে পছন্দ এবং বৈচিত্র্যময় বলে আপনি মনে করেন তা খুঁজে বের করুন এবং কেন তা রমনীয় তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করার চেষ্টা করুন।

মঞ্চের সেণ্টার লাইন। চরিত্রদের অবস্থিতি ও কার্যক্রম এবং অবস্থান সংক্রান্ত রেখাচিত্রকে লক্ষ্য আপনি নিশ্চয়ই করেছেন। এখন বলুন কোন্‌টা অপেক্ষাকৃত ভালো বলে মনে হয়।

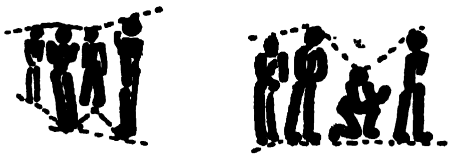


যুগ যত জটিল হচ্ছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ততই বিলীন হচ্ছে। নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রেও এর ছোঁয়াচ ইতিমধ্যেই বেশ ভালোভাবেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন আগেকার গুরুগম্ভীর অভিনয়-রীতি এবং অভিনয়ে একক ব্যক্তিত্বের প্রাধান্যের চেয়ে দলগত অভিনয়ের সার্থকতর রূপায়ণের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে। যদিও কিছু গ্রুপ থিয়েটার বিশেষ করে ব্যবসায়িক এবং আধা-ব্যবসায়িক দলগুলি ব্যক্তি-অভিনয়ের প্রাধান্যকে আজো দৃঢ়ভাবে প্রশ্রয় দেয়ার চেষ্টা করেছে—তথাপি এই সবের মধ্যে একটা দলগত নৈপুণ্যের আন্তরিক চেষ্টা না দেখতে পেলে অনেকের মন ভরতে চায় না।

তাই দেখা যায়—টিম ওয়ার্ক এবং গ্রুপ এ্যাকটিং-এর প্রাধান্য। গ্রুপ এ্যাকটিং করলে—দলগতভাবে অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার কথা আগেই বলা হয়েছে। এখন মঞ্চে দৃষ্টিগ্রাহ্য বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার জন্য—সার্থক কমপোজিশন রচনার জন্য কিভাবে শিল্পীদের অনুশীলনে নামতে হবে সে সম্পর্কে জ্ঞাতব্য কয়েকটি কথা বলি। আগে একক অঙ্গ-ভঙ্গিমা চলাফেরা এবং দেহ সৌষ্ঠব সম্পর্কে বেশ কিছু পাতা আলোচনা করা হয়েছে। এখন জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করতে গেলে আমার পক্ষে তা বোকামী হবে। তাই কথা না বলে কিছু ছবি পর পর সাজিয়ে যাই।



আপনারা বা আপনি ছবিগুলি দেখে মোটামুটি নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে একটু কৌশল-সচেতন হয়ে লক্ষ্য করলে দেখবেন আপনার সতীর্থদের

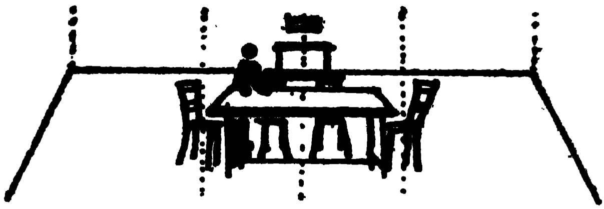


নিয়ে আপনি ছবি দেখে—ছবি থেকে কিছু নির্ভরতা পেয়ে নিজে নিজেই কমপোজিশন রচনার কাজে অনুশীলন করতে নেমে যাবেন। এই অনুশীলনে প্রতিভা প্রকাশে যতটা না মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশী মূল্য হচ্ছে শরীর দিয়ে সার্থক ছবি তৈরির কাজে। আমার দেওয়া ছবিগুলো অনুশীলনের চূড়ান্ত ধাপ নয়—অনুশীলনে অনুপ্রবেশের ছাড়পত্র মাত্র। সুতরাং দেখুন—ভাবুন—অনুধাবন করুন এবং পরিশেষে কিভাবে প্রয়োগ করবেন সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিন।

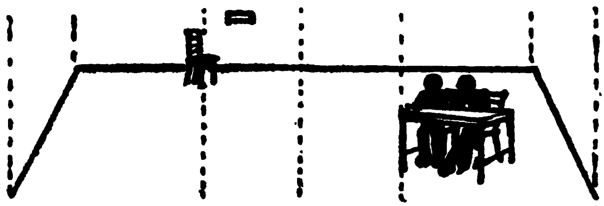
আশাকরি পা থেকে মাথাপর্যন্ত এবং নিচে ওপরে রেখাচিত্র (লাইন) কিভাবে কনট্রাস্ট বা ছন্দ এবং চলমান অবস্থার সৃষ্টি করছে লক্ষ্য রেখেছেন।

যা পাওয়া যায় তাতেই তো কাজ চালাতে হবে—এরকম কথা আমাদের প্রায় সময়েই শুনতে হয়। ধরা যাক একটি চরিত্র যার উচ্চতা চার ফুট দশ ইঞ্চি তিনি হয়তো কেন্দ্রীয় চরিত্র। কিন্তু মঞ্চে একটা টেবিল ও কিছু চেয়ার দরকার হলো। মঞ্চকর্তা যে টেবিল দিলেন তার উচ্চতা প্রায় সাড়ে তিন

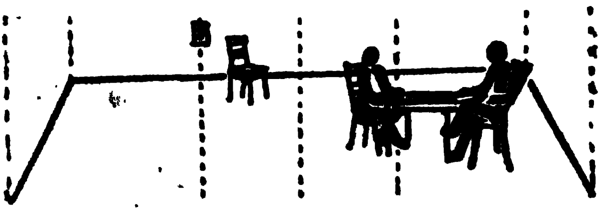
ফুট। চারফুট দশ ইঞ্চির মানুষটি যদি চেয়ারে বসে গুরুত্বপূর্ণ অভিনয়ের অংশে অভিনয় করেন তাহলে স্বভাবতই দর্শকের দৃষ্টি যাবে চরিত্রের ওপর নয়—মঞ্চের ওপর রাখা ঐ ঢাউস টেবিলের ওপর। ছবিটা দেখুন।



তাই মঞ্চের পরিস্থিতি, শিল্পীর শরীরের উচ্চতা, দেহসৌষ্ঠব এবং প্রয়োজনীয় আসবাবের চেহারা পরিমাপের সাযুজ্য না থাকলে অভিনয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাঞ্চাল হয়ে যাবে। হয়তো বড় টেবিলের ওপরে মুখের খানিকটা অংশ দর্শক দেখতে পাচ্ছে এবং একই সঙ্গে টেবিলের নিচে অভিনেতার পা দোলানীও দেখছে। সেক্ষেত্রে এক অংশ প্রপস্‌ অর্থাৎ টেবিল চেয়ার কেড়ে নিচ্ছে, অন্য অংশ পা দোলানী টেনে নিচ্ছে—কিন্তু অভিনয় অংশটা—জিরো। যেমন খাবার দৃশ্যে খাচ্ছে তো খাচ্ছেই—নিজের ঘরে বেশ জুতসই করে খাচ্ছে—দর্শকরা হাঁ করে খাবার দিকে তাকিয়ে আছে আর মনে মনে অশ্রাব্য গালিগালাজ করছে—যেন মনে হচ্ছে জীবনে বুঝি শেষ খাওয়া হচ্ছে এই মঞ্চে। কাজেই পরিমিতিবোধ সর্বত্র প্রয়োজন। নিচের ছবি দু'টি অপেক্ষাকৃত মার্জিত এবং গ্রহণীয়। কারণ শরীরের দীর্ঘতার সঙ্গে চেয়ার-টেবিল সামঞ্জস্য রক্ষায় সক্ষম হয়েছে।

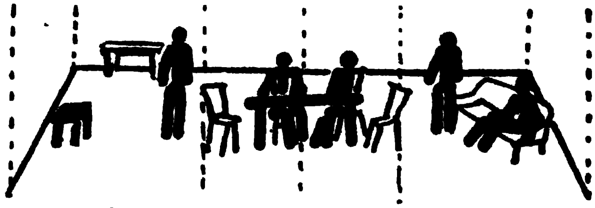


অন্যদিক থেকে ডান দিকে, সেণ্টার লাইনের পরের অংশ ফাঁকা থাকলেও

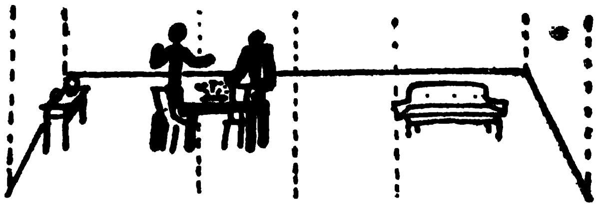


অন্য কিছু প্রপ্‌স দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রপ্‌স-এর সঙ্গে,

ফিজিক এবং ফিজিক্যাল এ্যাকশনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না ঘটলে দলগত অভিনয় কখনোই সার্থক হতে পারে না।

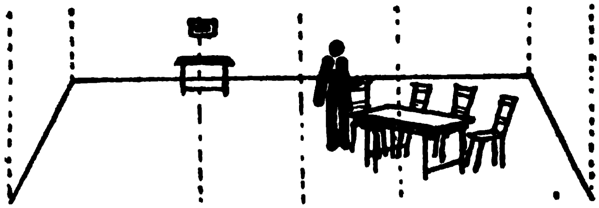


ওপরের ছবিতে Props distribution-এর চেয়ে নিচের ছবিগুলিতেও



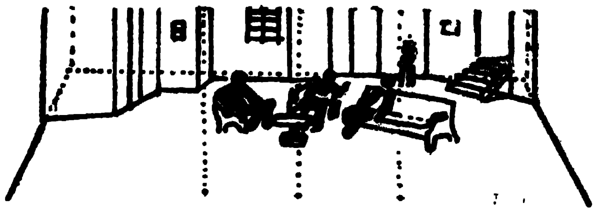
আসবাব বণ্টন আরো সার্থক হয়েছে। ভালো করে লক্ষ্য করুন।

কিন্তু নিচের ছবিতে কোথায় অসংগতি বলুন তো? মঞ্চের ডান দিক এবং



বাঁ দিকের অনেকটা স্থান ফাঁকা। সেখানে অন্য কিছু প্রাসংগিক জিনিস দিয়ে আরো দৃষ্টিগ্রাহ্য বৈচিত্র্য পরিস্ফুট করা যেতে পারতো।

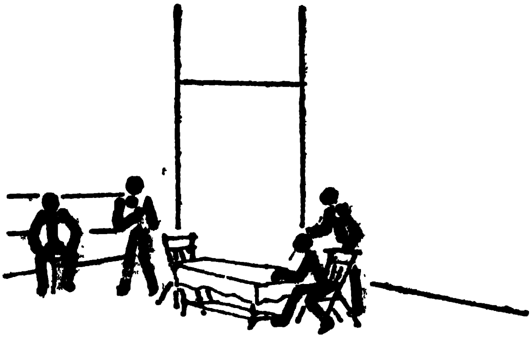
যেহেতু সব দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকে মঞ্চের উপর সব বস্তুকে একইভাবে দেখা যায় না—সেক্ষেত্রে মঞ্চে আসবাব রেখে বিভিন্ন চরিত্রের সমন্বয়ে কিভাবে এ্যাকশন সৃষ্টি করা যেতে পারে? মঞ্চের পরিমাপ এবং দর্শকের আসন সংখ্যা



সাজানোর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর একটু নির্ভর করলে চলে। কিন্তু আমাদের

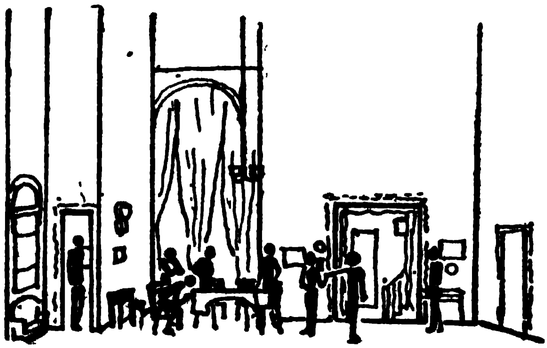
দেশে কটা প্রেক্ষাগৃহ বিজ্ঞানসম্মত এবং স্থায়ীর চেয়ে যেখানে অস্থায়ী মঞ্চের সংখ্যাধিক্য সেখানে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট নীতি রক্ষা করা সম্ভব নয়। তবুও ছবিটা দেখে প্রাথমিক ধারণা নেয়া যেতে পারে।

তবে এটা ঠিক এতোকিছু খুঁটিনাটি বিষয় আমরা ভাবি না বা ভাবতে পারি না বলে সার্থক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রযোজনা করতেও অক্ষম হই। তাই



মঞ্চে শিল্পী, নিজে দৃশ্যসজ্জা, আলোকসম্পাত এবং আসবাবের সামঞ্জস্য বণ্টন হলে তবেই তো আমরা একটা সার্থক প্রযোজনা দেখতে পাবো। সেই সার্থক প্রযোজনা কখনোই একক সীমার কল্পনানির্ভর হতে পারে না।

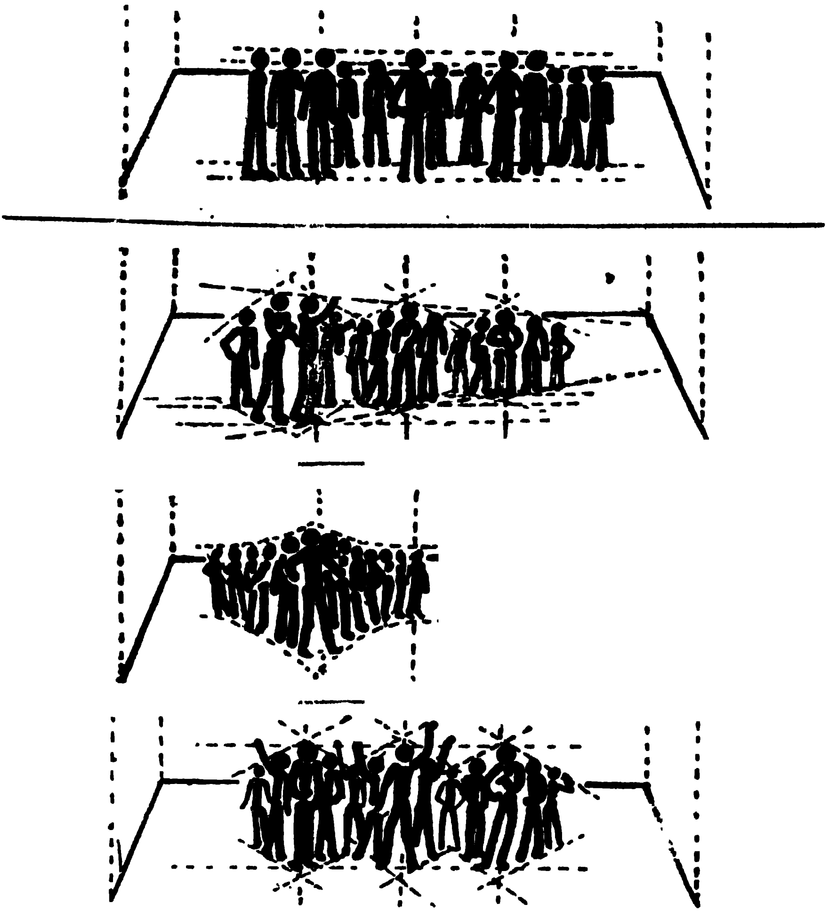
দেখুন না কাঠের মিস্ত্রি থেকে আরম্ভ করে দর্জি, মানুষ, পেপণ্টার সবাই না মিললে এই নিচের ছবিটা কিভাবে সৃষ্টি হবে ?



গানাড়া আর গাঝাড়া দিয়ে চোখ বড় করে গলাকাটিয়ে সুর করে অভিনয়ের যুগের বন্ধন ইতি তখন মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রে দৃষ্টিগাহ্য বৈচিত্র্যকে কি বাদ দিলে চলে ?

এককভাবে, দুজনে, তিনজনে এমন কি বিভিন্ন আসবাব নিয়ে কাজ করার পর সার্থকভাবে গ্রুপ এ্যাকটিং-এর জন্যে গ্রুপ ওয়ার্কে অংশ নেয়ার

স্বার্থে দলগতভাবে কাজ করার সুবিধার জন্যে বিভিন্ন স্থানে কিভাবে সুন্দর ছবি যা দলগত বৈশিষ্ট্যকে প্রতিভাত করবে তা জানানোর জন্য পর পর ছবিগুলির দিকে লক্ষ্য করুন।



এখন কথা শেষ করে কাজে লাগার চেষ্টা করলেই ভালো বা ভালোভাবে কি করে কাজ করা যায় সে নিয়ে ভাবতে পারলেও ভালো।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ঃ নাট্যশিক্ষা—এদেশে ১৩

.... .

১৯৬১ সালের শেষ ভাগ। তার এক বছব আগে স্বজন প্রিয়জন ছেড়ে বাস্তুহারা হয়েছি। এক কথায় ত্যজ্যপুত্র। বাপ-চোদ্দপুরুষের জাতীয় ব্যবসায় মনোযোগ দিতে গিয়েও অনেক রকম ব্যক্তিগত কারণে অবশেষে ঘর ছেড়ে পথে বেরুতে হয়েছিলো। পডাশোনাব প্রতি অনীহা আমাদের বংশের রক্ত-গত দোষ।

জীবনে শিক্ষার গর্বে গর্বিত হওয়ার এক আত্যন্তিক বাসনা আমার পরিবার-পরিজনদের বিরুদ্ধে এক অদম্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল ছেলে বয়েসেই। একটু ব্যক্তিগত কথা বলছি—নিজেব প্রতি খানিকটা সান্ত্বনা আর কিছুটা আত্ম-প্রচারে অংশ নেবো বলে।

না মশাই নাটক কববো, নাটক লিখবো—এসব কথা—এসব স্বপ্ন কোনো দিনই দেখিনি। তবে সখ বা Hobby বলে একটা জিনিস আছে তো—অল্পবিস্তর সকল মানুষের মধ্যে সেই সখ থাকে। আমিও তা থেকে বাদ নোই।

ছেলেবয়েসে বেহিসেবী সংসারেব পাপচক্রে পডে স্কুলের পড়াশোনা ঠিকমতো করতে পারিনি কোনোদিন। মা হাসপাতালে থাকতেন ফি বছর। ছোট ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা এবং সময়মতো বাবাকে একটু অবকাশ দেওয়ার কাজটাও আমাকেই সারতে হতো। কাজেই—স্কুলের খাতায় নাম লেখা থাকলেও বছরের শেষে যে ফলাফলটা হাতে আসতো তা বড্ড ভেঁতো। বাবার

সিদ্ধান্ত স্কুল বন্ধ করো। আমার মত উল্টো। মতান্তরে এক আমাপ্যান্টে বাড়ী ছাড়া হতে হলো।

ইতিমধ্যে ১৯৫৫ সালে স্কুলে রবিঠাকুরের জন্মদিনে একটা নাটক হবে ঠিক হলো। একজন শিক্ষক মশাইয়ের নেতৃত্বে অডিশন হলো। আমার বয়েস তখন কতো হবে? বড়জোর এগারো। কিন্তু এগারো বছর হলেও স্বাস্থ্যটা মজবুত আর গড়নপেটনটা ভালো বলে কেউ আমাকে চোদ্দর কম ভাবতেই পারতো না। সে যাই হোক—এক ক্লাস ভর্তি ছেলেরা হাজির—আবৃত্তি করতে দেয়া হয়েছে আর কিছু চলাফেরার কৌশল দেখাতে বলা হচ্ছে। সব জিনিসেই আমার কৌতূহল থাকায় আমিও গুটিগুটি মেরে সেই ক্লাসে হাজির হলুম। পরিতোষবাবু কাগজ কলম বাগিয়ে কি যেন লিখছেন। অনেকের আবৃত্তি শেষে হঠাৎ আমার দিকে নজর গেলো। বলে উঠলেন:

—তোর এখানে কি চাই? আজ খেলা নেই?

আমি ভালো ফুটবল খেলতুম। ক্রিকেটেও হাত ভালোই ছিল। সবাই আশা করতো—আমি একদিন ভালো খেলোয়াড় হবো। আমার নীরবতা দেখে পরিতোষবাবু আবার হেঁকে বসলেন!

—নাটক করবি নাকি?

আমি কিছু না ভেবেই বলে দিলুম—হ্যাঁ। ব্যস আর যায় কোথা। রবীন্দ্রনাথের একটা শক্ত কবিতা এগিয়ে দিয়ে বললেন:

—এটা বেশ জোর গলায় খেলিয়ে আবৃত্তি করতো।

মরেছে! হাতে বই নিয়ে কাঁপতে লাগলুম। ক্রমে পা কাঁপছে। যাই হোক—ক্লাসশুদ্ধ সবাই অপেক্ষা করছে আমার গলা শোনার জন্য। আমি কোনোরকমে কাঁপা কাঁপা গলায় যতটা সম্ভব জোরে কবিতা পাঠ করলুম। শেষ হলো না। শোনা গেলো—থাক। আর পড়তে হবে না। মনে মনে ভাবলুম—বোধহয় অভিনয় করার ঈষৎ স্বাদ গয়ায় পিণ্ডদানের জন্যে অপেক্ষা করছে। পরিতোষবাবু অন্য একজন স্যারের সঙ্গে কানে কানে কি যেন বলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই এর আগে অভিনয় করেছিস?

ফস করে আধা মিথ্যে কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লো—হ্যাঁ স্যার।

—ঠিক আছে, যা।

অডিশন শেষ হলো। কিন্তু ঐ মিথ্যেটা পাকা ফোড়ায় পেরেক ঠোকার মতো কে যেন ঠুকতে লাগলো। 'বিদ্রোহী' নামে একটা নাটক কিছুদিন

(সরস্বতী পুজোতে অভিনয়ের জন্যে) মহড়া হয়েছিল। আমি ওতে একটা ছোট্ট পার্ট করার চান্স পেয়েছিলুম। কিন্তু নাটকটা শেষ পর্যন্ত হয় নি। এ যাত্রাও সম্ভবতঃ চান্স পেলুম না।

কিন্তু জীবনে এমন ঘটনা ঘটে বা ঘটে যায় যা বুদ্ধি দিয়ে ভাবার অনেক বাইরের জিনিস। পরেরদিন স্কুলে এসে দেখি—রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' বই হবে। আমার নাম আচার্যের ভূমিকায়। বড় পার্ট পেলে সবাই খুশী হয়। কিন্তু আমি খুব ছোট বলে বড় পার্ট পাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে রীতিমতো ঘাবড়ে গেলুম।

মহলা হলো। অভিনয় করলুম। সবাই একবাক্যে বললো—এই বয়েসে অমন কঠিন রোলটা করলো কি করে। ব্যাটার 'এলেম' আছে। নিশ্চয়ই 'সাইন' করবে।

সেই বয়সে 'এলেম' আর 'সাইন' কথার মানে বুঝিনি। তারপর কয়েকটা বছর স্কুলেই বেশ কয়েকটা অভিনয় করলুম। স্কুলের মধ্যে নাম ছড়িয়ে পড়লো। ফুটবলের আসর থেকে নাটক আমাকে হাতছানি দিয়ে টানতে লাগলো।

তারপর অনেক উৎরাই পার হয়ে এলো ১৯৬১ সাল। অভিনয় জিনিসটা বেশ সহজ বলেই মনে হলো। দৌড় ঝাঁপ নেই, কসরৎ করার কিছুই নেই—হাঁপিয়ে পড়লে কেউ কিছু বলবে না—নানা সাজে নানা ভাবে সবাই কেমন দেখবে—সামনাসামনি প্রশংসাও করবে। স্কুল ফাইন্যাল পাস করার পর এ্যামেচার দলে 'নন্দকুমার', 'স্বীকৃতি,' 'দুইমহল' ইত্যাদি বই করলুম। বন্ধুরা প্রশংসা করলো। বাড়ী ছাড়া হলে কি হবে, চুলে ঢেউ খেলাতে শুরু করলুম। কাজের সময় বাদে টাটকা গিলেকরা পাঞ্জাবী এবং আর্টিস্টিক গাম্ভীর্য বজায় রাখার জন্যে ঘাড় বেঁকিয়ে প্রখ্যাত নায়কের কথাবলার ভঙ্গি থেকে কিছু ধার করে, নিজের কিছু মিশিয়ে একটা আরোপিত ভঙ্গিমাকে ব্যক্ত করতে শুরু করলুম। মঞ্চে তেমন পা কাঁপেনি বলে—বুকটা প্রায়সময় উঁচু করে চলতে সাহস করতুম। ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর ইংরিজি ছবি দেখে মুখের অভিব্যক্তি এবং কথা বলার ভঙ্গিমাকে যতটুকু বুঝতুম ততটুকু সঞ্চয়ের থলিতে পুরে রাখতুম। বন্ধুরা কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতো—এতো ইংরিজি বই দেখিস কেন! দেখে কিছু বুঝতে পারিস?

আমি একটু থেমে গম্ভীর হয়ে কলার উল্টে (প্রয়োজনে) বলতুম—না বুঝলে কি পয়সা খরচ করে কেউ বিদেশী ছবি দেখে! অভিনয় শিখতে গেলে

ইংরিজি ছবি দেখতে হবে—ওদের সবটাই ন্যাচারল, মায় ঘুসিমারার আওয়াজটা পর্যন্ত—বুঝেছিস।

আমার কথা বলার ধরনগুলো দিনের দিন এমন হয়ে উঠতে লাগলো যেন আমি কতো বুঝি—আর আমার আশেপাশে যাঁরা আছেন তাঁরা কিছুই বোঝেন না।

ক্রিকেট খেলতে গিয়ে শরীরের হঠাৎ একদিন বারোটা বাজলো। তলপেটে ছ'ইঞ্চির মতো অপারেশন হলো। খেলা বন্ধ দুবছর। কাজেই মুটিয়ে গেলুম। এখন উপায়?

স্কুল ফাইন্যাল, প্রি. ইউ. পাস করে অবসর সময় একটু লেখালেখি করবো ঠিক করলুম। যদিও গল্প কবিতা আগে লিখেছি এবং স্কুল-কলেজের ম্যাগাজিনে ছাপা হয়ে প্রচুর প্রশংসাও পেয়েছি। এই সব দেখে অনেকের ধারণা হলো আমি বোধহয় সাহিত্যিক হয়ে উঠবো। তবে যে-কোনো জিনিসে আমার এক-গুঁয়েমি অনড়ভাবকে অনেকেই সহ্য করতে পারতো না।

বি. কম. পড়ছি জয়পুরিয়া কলেজে। ইচ্ছে চার্টার্ড একাউণ্টেণ্ট হবো। বাবার কাছে আর্থিক সাহায্য চাওয়াতে প্রত্যাখ্যাত হলুম। ফলে বি. কম. মাঝ পথে মারা গেলো।

১৯৬১ সালের শেষে একদিন একটি বিজ্ঞাপন চোখে পড়লো। পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক আকাদেমীর তিন বছরের পাঠক্রমে ভর্তির জন্যে আবেদন-পত্র আহ্বান করেছে। অবিশ্যি এই সংবাদ অনেক আগেকার কাগজে প্রকাশিত। পুরোণো কাগজ ওজন দরে বিক্রি করতে গিয়ে বিজ্ঞাপনটি আবিষ্কার করলুম। লাস্ট ডেট চলে গেছে। তবুও আত্ম- প্রত্যয়ের ওপর অটুট বিশ্বাস রেখে এবং নাটকে শিক্ষাগ্রহণ বিষয়টার মধ্যে কি মজা আছে দেখার জন্যে ছুটে গেলুম জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে।

সঙ্গীত ভবনের নিচে হলঘরে সকাল এগারোটা নাগাদ গিয়ে হাজির হলুম। পণ্ডিতজী নামক দীর্ঘকায় দারোয়ান প্রশ্ন করলো:

—কাকে চাই?

—জানতে চাই।

—কি জানতে চান?

—তোমাকে বলে কি লাভ—কর্তা ব্যক্তি কেউ আছে?

—এখন ক্লাস চলছে। পরে আসবেন।

—কিসের ক্লাস ?

—নাটকের।

—নাটকের আবার ক্লাস কিসের ?

—ঐ দেখুন না।

বলেই দরজার ফাঁক দিয়ে জনা আষ্টেক ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে দিলেন এবং তার সামনে প্রায় জনা তিনেক একটু বয়স্কদের দেখালেন। বুঝলুম কিছু একটা হচ্ছে। অপেক্ষা করলুম। আমার নাছোড়বান্দা অবস্থা দেখে দারোয়ান খবর দিল ভেতরে গিয়ে। আমি অনুমোদন লাভে ধন্য হলুম।

ভেতরে ঢুকে প্রথমেই যার দিকে দৃষ্টি গেলো তিনি হচ্ছেন বাপ-ঠাকুরদার আমলের বিখ্যাত হিরো শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী। মাঝের সিটে তিনি বসে আছেন। তাঁর বাঁ দিকে বেঁটে খাটো আজকের সবচেয়ে পুরোনো অভিনেতা সন্তোষ সিংহ মশাই। দু'জনের সম্পর্কে ছায়াছবি মারফৎ পরিচিতি আছে। কিন্তু ডান-দিকে হলুদ রঙের মোটা ঢিলে পাঞ্জাবীপরা ছিপছিপে ভদ্রলোককে চিনতে পারলুম না। পরে জানতে পারলুম উনি হচ্ছেন ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য।

ছাত্ররা সবাই চলে যাবার পর আমাকে ঘিরে প্রশ্নবান প্রক্ষেপণ শুরু হলো।

—বাড়ীতে কে কে আছেন ?

—সবাই।

—নাটক শিখতে আসবে, বাড়ীতে কেউ আপত্তি করবে না ?

—করবে।

—তাহলে। গম্ভীর হয়ে রইলেন নটসূর্য।

আমি অপেক্ষা না করেই বললুম :

—আপত্তি করবে বলেই তো শিখতে আসা।

—হুম্! ঘাড়গুঁজে নটসূর্য বসে রইলেন। তারপর ডানপাশের ছিপছিপে ভদ্রলোককে বললেন :

—সাধন, কি বুঝছো ?

সাধনবাবু ঠোঁট চেপে হেসে বললেন :

—বুঝেছি স্যার।

তারপর আমার উদ্দেশ্যে বলে বসলেন :

—এখানকার খরচ চলবে কি করে ?

—বাসে কাজ করি—

—বাসে কাজ ! কি কাজ কর ?

—কনডাকটারী।

—কতো মাইনে পাও ?

—তিরিশ টাকা। বেশী কাজ করতে পারলে কমিশন নিয়ে মাসে সত্তর টাকার ওপর হয়ে যায়। তারপর খান তিনেক টিউশনি করি—চান্স পেলে চালিয়ে নেবো স্যার।

—টিউশনি আর বাসের কাজ করে তো সারাদিন চলে যায়। এখানে সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত ক্লাস—রোজ কি করে ক্লাস করবে ?

—টিউশনি সন্ধ্যা বেলায়। বাসের কাজ ফার্স্ট ট্রিপে সেরে নেবো। স্যার, আমার খুব ইচ্ছে যে নাটকে—

অহীন্দ্রবাবুর গিলে করা শৌখিন পাঞ্জাবীর ওপর দামী উড়ুনী পাট করা অবস্থায় ঝুলাছল। তিনি কি যেন ভেবে হাতের ছড়িটা ঘুরিয়ে সাধনবাবুর উদ্দেশ্যে বললেন :

—ওকে বলে দাও, কাল সকালে ১০ টায় এসে সান্যালমশাইয়ের সঙ্গে যেন দেখা করে।

তাই হলো। তিন তলায় (বর্তমান রবীন্দ্রভারতীর সংগীত ভবনে) শ্রীসুধাংশু সান্যাল মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করলুম। ফর্ম ভর্তি করে কিছু টাকা দিয়ে ভর্তি হয়ে গেলুম। ঠাকুর বাড়ীর সমস্ত পরিবেশটা তখন স্নিগ্ধ—শান্ত এবং মনোরম। পশ্চিমবঙ্গ সংগীত-নৃত্য-নাটক আকাদেমীর তিন বছরের পাঠক্রমে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে গেলুম। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। ছাত্রীদের মধ্যে শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জী নামে আর একজন পড়ছে আমাদের সঙ্গে। উঁচু ক্লাসে পড়ে কণিষ্কসেন, গীতাসেনগুপ্ত, রঞ্জিত মুখার্জী এবং গণেশ মুখার্জী প্রমুখেরা। সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত প্রতিদিন—শুধু রবিবার বাদে ক্লাস। খেলাচ্ছলে খানিকটা কৌতূহলবশে যা শুধু জানতে এসেছিলুম তার প্রায় সবটাই ওলোট-পালোট হয়ে গেলো।

প্রথমেই ক্লাসে ঢোকার সময় আদেশ পেয়েছিলুম—এখানে শিক্ষাক্রম চলার সময় বাইরে কোনো রকম অভিনয় করতে পারবে না। তাই হলো। রোজ ৮ ঘণ্টা ক্লাস। রাতে বঙ্গবাসী কলেজে বাংলায় অনার্স নিয়ে বি.এ.

পড়া—তার মধ্যে টিউশনি আর যন্ত্রদানব নিয়ে হাড় ভাঙা খাটুনির পর সময় পাবো কোথা ?

জীবনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হওয়ার বয়েস থেকে আমার একটি মাত্র রোগ ছিল। সেই রোগটা অনেকটা আত্মজিজ্ঞাসার মতন। অমুক জিনিস যখন মানুষ করতে পারে, আমি সেই জিনিস করতে পারবো না কেন ? ১৯৬১ সালে জয়পুরিয়া কলেজে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকে কেদারের ভূমিকায় অভিনয় করে শ্রদ্ধেয় ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মশাই শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার দিয়েছিলেন। সেই গর্ব খর্ব হবার উপক্রম তখনও ঘটেনি। অন্য সময় খেটে খাওয়া মানুষের মতো পোশাক-পরিচ্ছদ। আর একাডেমিতে এসেই ভোল বদল করতুম—সকালের স্নান-খাওয়া ওখানেই সারতে হতো। চার আনায় পাঁচটা বড় বড় হিংয়ের কচুরী পাওয়া যেতো। তাই খেয়ে সারাদিন চলতো। বি. কম পড়া বেশী দূর গড়ায়নি। তার কারণ—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং এ্যাকাদেমীর শিক্ষকমণ্ডলী। কারণ আরো ডেবিট-ক্রেডিট করতে গিয়ে সবই ভুলে বসেছিলুম। তারওপর বি. কম. পাস করে যদি সি. এ. না হওয়া যায় তাহলে কোনো দাম নেই। এরজন্যে সেবাজারে প্রায় ১০০০ টাকার ওপর কোনো কোম্পানিকে অনুদান দেয়ার রেয়াজ ছিল। পিতাঠাকুর সেই টাকার যোগান দান সদর্পে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সুতরাং সি. এ হওয়া শিকেয় উঠলো। উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যে যতটা সম্ভব নিয়ম রক্ষা করা !

আকাদেমীর শিক্ষাক্রমে যুক্ত হয়ে দিশেহারা হয়ে উঠলুম। প্রথম বছরে কি কি বিষয় পড়তে হয়েছিল তা বলি।

রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস, নাটকের ইতিহাস, নন্দন তত্ত্ব, বাংলা নাটকের ইতিহাস, বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাস থিওরি অব ড্রামা, ড্রইং, স্টেজক্রাফ্ট, এ্যানাটমী, মাস্টারপ্রম্পট কপি, মনোবিজ্ঞান, ইমোশন, মেকআপ, মাইম, বডি প্রিপারেশন, প্লে এ্যানালিসিস, নাট্য-বিশ্লেষণ, নাটক-কবিতা পাঠ, সাইট রিডিং, অভিনয়, মহলা, স্বদেশী-বিদেশী নাটকে অভিনয়ে অভিজ্ঞান ইত্যাদি নানা রকমের অজানা বিষয়।

স্বপ্নেও ভাবিনি নাটক করতে গেলে এতো বিষয়ে পড়াশোনা করতে হয়। প্রথম প্রথম একটু বিদ্রোহ জাগতো। তত্ত্ব তত্ত্ব আর তত্ত্ব—প্র্যাকটিশ আর প্র্যাকটিশ—এই করেই সারা দিন কেটে যেতো। মুখে রঙ মাখলেই মেকআপ নয় —বিভিন্ন বয়সে মুখের কোথায় কোন্ রেখা কেমনভাবে পরিবর্তন হয় তাও

জানতে হোচ্ছে হাতে কলমে। শুধু কি তাই? আয়নার সামনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজের মুখে গোঁফ দাড়ি ছেঁটে নানারকমের গোঁফদাড়ি লাগানোর অভ্যাস করতে হতো।

যত দিন যেতে লাগলো তত বিষয়ের গভীরে ঢুকে পড়লুম। পঃ বঙ্গ সরকার থেকে একটা মাসিক বৃত্তিও পেয়ে গেলুম। একবছর সমস্ত বিষয়টা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নেয়ার পর দ্বিতীয় বর্ষে উঠে ঠিক হতো কে কোন বিষয়ে বিশেষ-ভাবে অভিজ্ঞ (বিজ্ঞ) হবেন। তিনটি বিভাগ ছিল। যেমন অভিনয়, পরিচালনা এবং স্টেজ ক্রাফ্ট। আমি অভিনয় বিষয়টা নিয়েই পড়াশোনা করতে শুরু করলুম দ্বিতীয় বছর থেকে।

প্রথম বছর থেকে যাঁদের সান্নিধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে হাতে-কলমে পড়াশোনা এবং কাজ করার সুযোগ পেয়েছি তাঁরা হলেন:

নাম	বিষয়
স্বর্গত নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী	তত্ত্ব ও সামগ্রিক অভিনয়, ইমোশন
" ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য	নাট্যতত্ত্ব, এস্থেটিক
" সুধাংশু মোহন সান্যাল	এলোকিউশন, উচ্চারণ-ভঙ্গি
" শৈলেন গাঙ্গুলী	মেক-আপ
সর্বশ্রী রবি চট্টোপাধ্যায়	স্টেজ ক্রাফ্ট
" তরুণ দাস	ড্রইং এবং পেন্টিং
" সন্তোষ সিংহ	এ্যাকটিং প্রাকটিক্যাল
শ্রীমতি সুষিমা মুখার্জী	আবৃত্তি
শ্রীমতী নিবেদিতা দাস	নাট্যসাহিত্য ও ইতিহাস
মহঃ ফরহাদ্ হোসেন	ক্রেপ ওয়াক
শ্রী অমর ঘোষ	স্টেজ লাইট
শ্রী শ্যামমোহন চক্রবর্তী	মাইম এবং বডি প্রিপারেশন
ডঃ সি. আর. ঘোষ	এনাটমী ও ফিজিওলজি

গলদঘর্ম হয়ে তিন বছর পড়াশোনা করতে গিয়ে নাটক করা ভুলেই গিয়েছিলুম। এমনকি নাটক অভিনয় করতে ওঠার কথা ভাবলেই পা টন টন করে উঠতো। তার একমাত্র কারণ—কিছু না জেনে এতোদিন তালেবর হয়ে পড়েছিলুম। এখন চুল কোপানো তো দূরের কথা—চুলে চিরুণী দিতে ভুলে যাই। জামা কাপড়ের ব্যবহার আলগা হয়ে পড়লো। এরই মধ্যে ১৯৬৩

সালের শেষে পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত নৃত্য নাটক আকাদেমী রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় নাম নিয়ে এক নোতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিলো। ১৯৬৪ সালে বিদ্যা শেষে একটি অভিনয় হলো। নাম 'মাংকি স্প', তৎকালীন উপাচার্য ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রভারতী পুরস্কার ঘোষণা করে আমাকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার দিলেন প্রথম বছরেই।

আগে দু'একটা পুরস্কার পেয়েছি। কিন্তু সে সময়ের মনোভাব এবং উপলব্ধি এখনকার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এখন পুরস্কার পেয়েও নিজের কাছে যে নিজের সুখ অনুভব করতে পারছি না। কত হালকা কত ছোট মনে হচ্ছে। মাস্টারমশাইদের কাছে এই রকম অনুভূতির কারণ জানতে চাইলুম। তাঁদের অনেকে একটু আবছা—অবজ্ঞাভরে এই রকম জবাব দিয়েছিলেন—এইবার হবে।

১৯৬৪-তে দারুণ অর্থনৈতিক ফাঁপরে পড়লুম। তখন নাটকে নেশা রীতিমতো মনের মধ্যে বসে গেছে। ছদ্মনামের আড়ালে আমার প্রথম বই বেরিয়েছে অনেক আগেই। নটসূর্য ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। ছোট ছোট সাতখানা নাটক একসঙ্গে 'সপ্তক' নাম দিয়ে বেরিয়েছিল তদানিংতন প্রতিমা পুস্তক থেকে। বইটি দু'টি এডিশন ঐ বছরেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। অধ্যাপক শ্যামমোহন চক্রবর্তীর সং সান্নিধ্যে তাঁর একখানা চিঠির মাধ্যমেই আমি রাতারাতি নাট্যকার হতে পেরেছিলুম। এখনো দু'হাজারের ওপর সুন্দর ছোটগল্প, তিনহাজারের ওপর কবিতা পোকায় খাচ্ছে, নয়তো ইতিহাস হবার দিন গুনছে। সে যাই হোক—এদেশের শিক্ষাক্রমে কি বিষয়ে কেমনভাবে শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়েছিল এবং যে বিষয়টা খুব সহজ বলে মনে হতো—কেমন করে তা জটিল হয়ে উঠলো এবার তাই নিয়ে কিছু বলি।

ঘড়ির কাঁটা ধরে অহীন্দ্র চৌধুরী মশাই আসতেন আর যেতেন দুপুরের পরে বেলা তিনটে নাগাদ। একনাগাড়ে ২ থেকে ২½ ঘণ্টা ক্লাস নিতেন সঙ্গীতভবনের নিচে বড় হল ঘরে। তখন স্থায়ীভাবে চেয়ার ছিল বর্তমান অবন মঞ্চে আশ্চর্য লাগতো—ক্লাসের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অনেক শিক্ষকও খাতা পেন্সিল নিয়ে বসতেন। শিক্ষকছাত্রদের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান ছিল না। শুধু ঐ বিরাট ব্যক্তিত্ব যাকে আমরা শুধু শিল্পী হিসেবেই জেনে এসেছি তিনিও আমাদের মধ্যে বসে থাকলেও তাঁর ব্যক্তিত্ব, পড়ানো এমন কি ভাবলাব সব কিছু মিলিয়ে আমাদের কারোর সঙ্গে মিলতো না। সাধন বাবু কেমন দুর্ধর্ষ পণ্ডিত তার প্রমাণ পেয়েছি ক্লাসে নিয়মিত

ভাবে। তিনিও আমাদের সঙ্গে বসে ছাত্র ছাড়া কখনো শিক্ষকের ভূমিকা নিতেন না। তিনি নিজে নটসূর্যকে স্যার বলে ডাকতেন। নাট্যতত্ত্ব এবং ভরতমুনির সংস্কৃত বই খুলে লাইন ধরে ধরে নটসূর্য ব্যবহারিক তাৎপর্য বুঝিয়ে চলতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কারো মুখে হাই উঠতো না। তিনি বলতেন—'আসলে এসব নিয়ে ঘাঁটতে হবে—কিন্তু ঘাঁটার জন্যে যে প্রস্তুতি, নিষ্ঠা বা বিদ্যার প্রয়োজন তা তো সকলের থাকে না। এই যে style of acting—ভরত তাকেই তো 'বৃত্তি' নামে ভাগ করেছেন। অনেক পণ্ডিতের বই দেখেছি কিন্তু তথ্য আর তত্ত্বে অনেক জায়গায় ভুল আছে। তোমরা যারা আগ্রহী আমার বাড়ীতে এসো—আমি সব নানা রঙের কালিতে দাগ দিয়ে রেখেছি—সব বুঝিয়ে দেবো। আসলে—এ শিক্ষা সারা জীবনের শিক্ষা—বুঝলে না, এই দু' তিন ঘণ্টায় আমার কাজ শুধু বিষয়টা সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ানো। যারা শিখবে বা শিখচো তার নিজের তাগিদেই আরো বেশী করে শিখবে।'

বলতে লজ্জা নেই। তিন বছরের ক্লাসে—বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গায় আমি তিনবার মার খেয়েছিলুম। নটসূর্য তাঁর ছড়ি দিয়ে হাল্কা আঘাত করেছিলেন কাঁধের ওপর। কারণ—আমি কোনো এক নামজাদা অভিনেতার কথা এবং হাবভাব নকল করতুম বলে। ওনার মতে—'আমি অনেক দিন লক্ষ্য করেছি, সহ্য করেছি তোমার নিজের ভালো গলা রয়েছে—এখানে তা উপযুক্ত করে গড়ে তুলছো—তা নয় কোথা থেকে কি—।' বলেই নাক মুখ এমনভাবে কোঁচকালেন যা দেখে আমার চক্ষু ছানা-বড়া। এর পরেই হঠাৎ এক হুঙ্কার ছেড়ে ওনার সর্বক্ষণের সহযোগীকে চিৎকার করে ডাকলেন—

—মোহন!

মোহন এসে হাজির।

—সাধনকে বলে ঐ বদমাইশটাকে তাড়াবার ব্যবস্থা কর। সান্যাল মশাইকেও কথাটা জানিয়ে দিও।

সঙ্গে সঙ্গে কথা পাচার হয়ে গেলো। যদিও ছাত্রখাতা থেকে ছাঁটাই হবার কথা ঘোষিত হয়েছিলুম মৌখিকভাবে—কিন্তু কথার মধ্যে ঝাঁজ থাকলেও হৃদয়ের টানটা সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলুম। তার ওপর ঐ ব্যক্তিত্বের

কাছে ক্ষমা না চেয়ে উপায় ছিল না। এরপর কানমোলা আর থাপ্পড় খেতে হয়েছিল সাধনবাবুর কাছে। মাসান্তিক পরীক্ষায় যা উত্তর দিয়েছিলুম তার কোনোটাই ঠিক হয়নি। আর যা প্রশ্ন লিখতে বলা হয়েছিল তার কোনোটাই ঠিক লিখতে পারিনি। ফলে নাটকের পরীক্ষায় শূন্য প্রাপ্তিতে কারণ জানতে গিয়ে বিপদ ঘটেছিল প্রথম দফায়। প্রথমে মার—তারপর উল্লুক, বাঁদর ইত্যাদি গালা-গালি। প্রচণ্ড ক্ষেপে তিনি বলেছিলেন গোল্লা মানে শূন্য—আর শূন্যর কম নম্বর দেয়া যায় না বলেই শূন্য দিয়েছি—। দ্বিতীয়বার ক্লাসে দেরীতে একদিন ঢোকার অনুমতি চেয়েছিলুম বলে--। যাক্ সে কথা—অতীতের স্মৃতি স্মরণ করলে চোখে জল আসে—ওঁদের সান্নিধ্যে যাঁরা শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছেন—মার খেয়ে গালাগালি খেয়ে—আমি বলি তাদের অনেকের চরিত্র নষ্ট হয়েছে, মাথা খারাপ হয়েছে, আমি নিজে যার জলজ্যান্ত প্রমাণ। সাধনবাবু যখন ক্লাস নিতেন তখন কোনো সময়সীমা থাকতো না। যে বিষয়ে শুরু হতো সে বিষয় ছেড়ে তিনি যে কোন্ বিষয়ে চলে যেতেন তার কোনো ঠিক থাকতো না। সংস্কৃতের পাণ্ডিত্য—প্রাচীন ঐতিহ্যের যেমন গুরুস্থানীয় ব্যক্তিত্বের কথা মনে পড়তো ঠিক তেমনি মার্কসীয় দর্শনের আলোচনায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য সমস্ত রক্ষণশীলতাকে ভেদ করে আর এক অন্য ব্যক্তিত্বের মানুষকে দেখা যেতো। সবাইকেই গালি-গালাজ—তার মধ্যে উৎপলবাবুকে অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে কিছুটা মানতেন—সম্পূর্ণ নয়।

নাটক লেখার মূল প্রেরণা দিলেন তিনিই। যদিও আমার 'ঘটমান ভবিষ্যৎ' ছাড়া অন্যসব নাটককে 'আবর্জনা' বলে চিহ্নিত করতেন। মুখে যা আসতো তাই গালিগালাজ করতেন। গালাগালি শোনাটা যেন ক্রমে সংক্রামক ব্যাধির মতো মনে হতো। আসলে রাগটা কখনো পাঁচ মিনিটের বেশী স্থায়ী হতো না। তাই, শুনতেও ভালো লাগতো।

নটসূর্যের নিজস্ব পাঠাগারে সংগ্রহ এবং নিখুঁতভাবে তিনি যে—কীভাবে পড়াশোনা করতেন তা দেখে আশ্চর্য হতে হয়েছে। কাছে না এলে মানুষকে একটু ভেবে নিয়ে সিদ্ধান্ত করা উচিৎ নয়। অহীন্দ্র চৌধুরীর পড়াশোনার ব্যাপকতা অনেক পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যকে চূর্ণ করতে পারে।

মাইমের পায়ের পাতা থেকে চলাফেরা, গোড়ালি দিয়ে চলা, জল ঘেঁটে চলা থেকে শুরু করে বুকে হেঁটে চলা পর্যন্ত অভ্যাস করতে হতো ক্লাসে।

এ্যানাটমী পড়ে কি হবে? ইমোশন আবার একটা বিষয় হতে পারে নাকি?

পারে। কোথায় কি গ্রাও আছে তাদের কি ফাংশন, মাংসপেশী দেহযন্ত্রকে নিজের আয়ত্তে আনার জন্যেও বিষয়গুলো না জানলেভালো অভিনয় হবে না।

ইতিহাস-তত্ত্ব না পড়লে আগামী কাজের মধ্যে অপূর্ণতা থেকে যাবে। তত্ত্ব জানতেই হবে—অনেকের ধারণাকে অল্প সময়ে অনেক কিছু জানার জন্যেই তো তত্ত্বকে জানা। মেক-আপ করতে বসে রঙ নিয়ে সমস্যা হয়। নানা কোম্পানীর নানান ধরনের রঙ। শৈলেনদা বুঝিয়ে দিলেন—আরে বাবা মোটামুটি তিনটে রঙ হাতের কাছে রাখবি, ব্যস—তারপর তোর গায়ের রঙের সঙ্গে মিল খাইয়ে দরকার হলে এক রঙের সঙ্গে অন্য রঙ মিশিয়ে নিয়ে ফাউনডেশন তৈরি করে নিবি। কোন্ কোম্পানীর রঙ কত রকমের, তাদের সংখ্যা কত তা আস্তে আস্তে জানতে পারবি। আগে রঙ মাখতে শুরু কর।

তারপর কাঁচি হাতে নকল চুল কেটে নিজের মুখে নিজে দাড়ি গোঁফ লাগানো ইত্যাদি সবই করতে হতো। সময় যে কোথা থেকে কেমন ভাবে চলে যেতো তা বলা মুস্কিল।

নোভুন নামে রবীন্দ্রভারতীতে পুরোনো শিক্ষাক্রম অত্যন্ত জটিল এবং বিস্তৃত। সেদিনকার সেই অল্প বয়সের মাথায় অমন পর্যাপ্ত জ্ঞান কিভাবে যে ধারণ করে রাখতে হতো তা এখন বলা যায় না। সেদিন মাথা টন টন করতো। নাটক করতে গেলে যে অত শিখতে হয়—এত পড়তে হয়—ভা আগে জানা ছিল না বলেই আমি যেন এই খেলার ছলে পড়ার মধ্যে ডুবে গিয়ে হাবু-ডুবু খেতে লাগলুম। কাঠ কাটার জন্য বাটালি যেমন ধরতে হয়েছিল তেমনি মঞ্চ নির্মাণের জন্য পেরেক ঠোকা থেকে শুরু করে পেন্সিল রং তুলি নিয়ে রীতিমতো আঁকা-জোকার কাজ পর্যন্ত করতে হতো। শিক্ষা শেষ লেও—মনে হলো—হয়তো এখনো শুরু হয়নি। কারণ তিন বছরে যা শিক্ষা গ্রহণ তাতো প্রাথমিক ধারণা দেয়ার জন্যেই। তাহলে কি হবে?

পরে প্রতিবিম্ব গ্রুপ করে অভিনয় করতে নেবে প্রথম রজনীতেই রীতিমতো পা কেঁপেছিল। এবং অভিনয়ের ক্ষেত্রে, পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রায় সব জায়গায় পুরস্কার পেতে লাগলুম। কোনো নামজাদা প্রতিযোগিতা বাদ নেই। কিন্তু আমি নিজে যে কত বেশী নিজেকে এবং দর্শকদের ঠকাচ্ছি সে কথা ভাবতে বসলে ঐসব মানপত্রগুলো—পুরস্কারগুলো আমাকে তীব্রভাবে বিদ্রূপ করে। তাই পাওয়া জিনিস অপরকে বিলিয়ে দিতে লাগলুম—আমার ঘর খুঁজলে বর্তমানে একটিও পুরস্কার পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আসলে শিক্ষাগ্রহণ

কয়ে · ম্যাটিক করতে এসে স্বপ্নের প্রেরণায় আমি যত বেশী প্রমত্ত হতে পেরেছিলুম ঠিক ততটা বেশী উৎসাহ ঐ পুরস্কারগুলো আমাকে দিতে পারেনি।

১৯৬৭ সাল পর্যন্ত জীবন-যুদ্ধের এক কণ্টকপূর্ণ ইতিহাস। ঘর-পথ হারিয়ে যেন শূন্যতার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ইতিমধ্যে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম. এ পাস করেছি। চাকরী নেই। অধ্যাপক হবার স্বপ্ন বাসনা এখন লুপ্ত হবার পথে।

আবার এলুম রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৬৮ সালে। ঐ বছর হাতে এলো সামা· বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে একটা চাকরী—নাটকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য নাশন্যাল স্কলারশিপ পেলুম এবং ঐ বছরেই আমার জীবনে আর এক জন এলো—শর্বরী—চন্দ্রিমা নাম নিযে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে ও আমার ঘরে এলো। বন্ধু-বান্ধব ভাবতেই পারেনি আমি বিয়ে করেছি। আমি বললুম—আমি তো বিযে করিনি—বিয়ে হয়ে গেল। যেমন জন্ম হয—মৃত্যু হবে—তেমনি বিয়ে হযে গেল।

তাই বিয়ে করেও পড়াশোনা ছাড়তে পারলুম না। নাশন্যাল স্কলারশিপ পেয়ে প্রথম ব্যাচে নাটকে এম এ ক্লাসে ভর্তি হলুম। ১৯৬৮—৭০ সাল পর্যন্ত দুবছর পড়লুম। সিলেবাসের বিষয়গুলো পাল্টে যায়নি। অনেক বেড়ে গেছে অর্থাৎ আগে যা পড়েছি তার চেয়ে অনেকটা বিস্তৃত। বিশ্বনাট্যমঞ্চের ইতিহাস —বিশ্বনাট্য সাহিত্যের ইতিহাস—অনেক নাটকের বই—মনোবিজ্ঞান—সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় যোগ হয়েছে। যোগ হযেছে সমালোচনা। বেতার ফিল্ম নাটকে অভিনয ইত্যাদি বিষযগুলো। শিক্ষক হিসেবে আরো অনেক নোতুন মুখের সন্ধান পেলুম। সন্তোষ সিংহমশাই রিটায়ার্ড হয়ে গেছেন। ইতিমধ্যে নোতুন শিক্ষক হিসেবে যাঁদের মহতী সান্নিধ্যে ধন্য হলুম তাঁরা হলেন—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, দেবনারায়ণ গুপ্ত, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র, ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, ডঃ বিভূতি মুখার্জী, ডঃ মানস রায়চৌধুরী, সৌমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখেরা। সঙ্গে আছেন ডঃ গীতা সেনগুপ্ত ও রঞ্জিত মিত্র এবং গণেশ মুখার্জী। আগেই বলেছি এঁরা আগে এখানকার শিক্ষাক্রমে যুক্ত ছিলেন।

সত্যি কথা বলতে কি—নাটকে প্রথম এম এ. হওয়ার যোগ্যতা আমাদের প্রাপ্য হলেও পড়াশোনা যেন বেশী রকমের তত্ত্ব ঘেঁষা। তাই অনেক বিষয় নিয়ে সাঁতার কাটতে হলো। অভিনয় প্রযোজনা করার বিষয় নিয়ে নোতুনভাবে

না করার দ্বার উন্মোচিত হলো—কিন্তু কাজেকর্মে খুব একটা সফল নজির দেখতে পেলুম না। পরীক্ষা-পদ্ধতি আর পাঁচটা পরীক্ষার মতো। ...ত্বের আস্বাদ পেতে এম এ. পড়তে আসায় বাদ সাধলো—পুরোনো ...কেই ঝালানো হলো। এ্যানাটমী উঠে গেল। মাস্টার প্রম্পট্ কপি তুলে দেয়া হলো। সাধনবাবু মারা গেলেন। তাঁকে নিয়ে রাজনীতি শুরু হলো। ফলে নাট্য-শিক্ষকের চেয়ে রবীন্দ্রভারতীতে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষকরা নাট্য-শিক্ষার কাজ চালাতে শুরু করলেন। তত্ত্ব এবং ব্যবহার আগে যেমন পাশাপাশি চলছিল এখন ব্যবহার উঠে গিয়ে শুধু তত্ত্ব নিয়ে কাজ। শম্ভু মিত্রের সান্নিধ্য পেলেও—খুব বেশী তাঁকে কাছে পাইনি। তবে শুনেছি- এক রক্তকরবী এবং জীবন-মরণ নিয়ে তিনি নাকি আমাদের পরে অনেক কাজ করে গেছেন—বক্তৃতা দিয়েছেন। তবে কি কাজ কতোখানি করে গেছেন তা জানা নেই।

১৯৭৩ সালে রবীন্দ্রভারতীতে প্রশাসনিক দপ্তরে কাজ করতে আসায় রবীন্দ্রভারতী চত্বরে নাটক অভিনয় শুরু করার কাজটা আমি নিজের হাতেই গ্রহণ করি সহকর্মীদের সহযোগিতায়। নাট্য বিভাগের মুখ্যপাত্র হিসেবে নয়—এক্ষেত্রে সহকর্মী চিত্ত চ্যাটার্জী, শ্রীজগন্নাথ ভট্টাচার্য এবং শ্রীঅসীম ঘোষের ঋণ কোনোদিন শোধ করার নয়।

অথচ পুরোনো আমলে রবীন্দ্র নাটকের অভিনয় চলতো প্রায় নিয়মিতভাবে এবং ছাত্ররা অংশ নিতো। সে চেষ্টা সাধনবাবুর পর বন্ধ হয়ে গেছে। একদিন তৎকালীন উপাচার্য ড. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলছিলুম। তিনি বললেন - সমস্যা থাকতেই চলে আসতে হলো। ঘরে বসেই কাজ করছি। নাট্য শিক্ষা বা চারুকলা শিক্ষার একটা ধারাবাহিকতা এবং সেই সঙ্গে পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান না চললে কাজ ভালো হয় না—তা তোমরা এ বিষয়ে হতাশ না হয়ে এবিষয়ে আরো একটু ভাবো না কেন। ভাবনার পক্ষে কোনো প্রতিশ্রুতি হিরন্ময়বাবুকে আমি দিইনি।

১৯৬৯ সালে শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার (ঝি ঝি পোকার কান্না) জন্য ছবি বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কার পেয়েই—দারিদ্র্যের অভিঘাত সহ্য করতে না পেরে ভারত সরকারের সঙ এণ্ড ড্রামা ডিভিশনে চাকরী নিয়ে চলে গেলুম ওড়িশায়।

এই সুন্দর ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে নাটক দেখলুম। অজ পাড়াগাঁয়ে—জঙ্গলে পাহাড় পর্বতে ঘুরে ঘুরে নাটক দেখানোর দায়িত্ব ছিল আমার হাতে। নিজের দেশ সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত তথ্য কাছে এলো।

সামনা-সামনি মানুষ-প্রকৃতি-যন্ত্রণা এবং জীবনকে দেখলুম। বড় বড় মানুষের সান্নিধ্যেও এলুম।

ওড়িষ্যাতে আমার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নাটকে প্রশিক্ষণ দেবার কাজে ওড়িষ্যার বন্ধুদের সহযোগিতায় প্রথমে অস্থায়ী এবং পরে স্থায়ীভাবে কার্যকর হওয়ার উদ্যোগ আমিই করেছিলুম বিভিন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে রীতিমতো আলোচনা করে। সেই কাজ—ইতিহাস হয়তো স্বীকার করবে না। তবে ইতিহাস হবার লোভ নেই বলে সর্বত্রই একটা কাজ—নোতুন কিছু করার জন্যে একটা লক্ষ্য পথ স্থির করে দাঁড়িয়ে থাকি। সঙ্গে সঙ্গে কিছু কাজ করার চেষ্টা করি।

মনে হয় লক্ষ্যে অবিচল আস্থা থাকলে এবং সেই আস্থাকে পরিচালিত করার শক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা থাকলে হয়তো একদিন স্বপ্ন—সার্থক হবে। হয়তো —টাকা নয়—খ্যাতি নয়—কিন্তু কিছু কাজ করা তো যাবে। পাকা চার বছর নাটক করা—নাটক করানোর কাজে ইস্তফা দিয়ে অটুট ধৈর্য নিয়ে আরো কিছু করার জন্যে অপেক্ষা করছিলুম। অপেক্ষা শেষ হলো। সংসার-জীবন—ব্যক্তিগত-জীবন আরো জটিল হয়ে পড়লো নানা দিক থেকে। প্রথম পুত্রশোক! অনুচ্চারিত অভিব্যক্তি। সে এক কঠিন অভিনয়। তবুও পথ চলতে হবে—তাই মানুষের ভালোবাসা সম্বল করে পথ চলতে শুরু করলুম নোতুন ভাবনা —চিন্তা নিয়ে।

নিজে এবং ঘর বাঁচাতে ভারত সরকারের চাকরী ছেড়ে অনেক আর্থিক ঝুঁকি নিয়ে কোলকাতায় রবীন্দ্রভারতীর প্রশাসনিক দপ্তরে সামান্য এক চাকরী নিলুম। উদ্দেশ্য কিন্তু নাটক করা নয়—কারণ—কারণ প্রায় সবই হারিয়ে গেছে। রেডিওতে যা খালি মাঝে মধ্যে আমার ছদ্মনামে দুএকটা নাটক শোনা যায়। গ্রুপ করবো? কি লাভ! তারপর ১৯৭৪ সাল। ভারতবর্ষ—শুধু ভারতবর্ষ কেন এশিয়ার সম্মিলিত দেশ থেকে ব্রিটিশ কাউন্সিল আমাকে মনোনীত করলো নাট্য-প্রযোজনা ও প্রশিক্ষণের জন্যে উচ্চতর তালিম নেয়ার জন্যে। স্থান ইংলণ্ড।

দেশ ছাড়ার আগে গত ১৪ বছর ধরে কি শিখেছি তার তালিকা তৈরি করতে লাগলুম। আগে যা বিক্ষিপ্ত লাগছিল তাকে সাজাতে গিয়ে দেখলুম এখনো অনেক শেখা বাকী। এখন দেখা যাক পশ্চিমী শিক্ষা কি বলে?

অনেক বন্ধু, কিছু সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন—দেশে ফিরে কি করবেন?

উত্তর—অনিশ্চিত যাত্রা—শিক্ষাক্রমের পুরোপুরি প্রসপেকট না জেনে এখন থেকে কি করে বলি—কি করবো।

আমার নাট্যশিক্ষা

বিদেশে ১৪

.. ..

আমার অপরাধ আমি অধ্যাপক নই। প্রশাসনিক দপ্তরের উচ্চবর্গীয় সহায়ক। এককথায়—কেরানী। কেরানী বলেই বিলেত বা বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের অধিকার নেই। রবীন্দ্র ভারতীর অস্থায়ী চাকুরিক্ষেত্রে অবস্থানকালে এদেশের একমাত্র মনোনীত স্কলার হিসেবে নাটক নিয়ে বাইরে পড়তে যাওয়ার জন্যে প্রশাসনিক দপ্তরের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ আমার ছুটি মঞ্জুর করলেন না। ভারত সরকারের আধাস্থায়ী কর্মীদের ক্ষেত্রে এ সুযোগ পেতে পারা যায়। কিন্তু আমি ভারত সরকারের চাকুরি ছেড়ে রবীন্দ্র ভারতীতে যোগদান করেছি আইনানুগভাবেই। যার ফলে আমাকে প্রচলিত বেতনের ঊর্ধ্বে বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে। তথাপি নিয়ম বাদ সাধলো—যোগ্যতার খাঁচায় সেক্ষেত্রে আত্মহত্যার পথ খুঁজছে।

সত্যি তো—কেরানী উচ্চশিক্ষা পেতে পারে কোন্ অর্থে? শিক্ষক হলে আলাদা কথা। জানতে ইচ্ছে করেছিল—আমাকে নাটকে এম. এ. ডিগ্রি দেয়া হলো কেন? আমি ১৯৭২ সালে উজিসি প্রদত্ত ফেলোশিপ (গবেষণা করার জন্যে) পেলুম কেন? আর কেনইবা আমাকে নাটকে পি-এইচ-ডি করার জন্যে মনোনয়নপত্র দেয়া হলো? উত্তর মেলেনি। আইন নাকি কর্মক্ষেত্রে মানবিকতার দাসত্ব করে না। কিন্তু টেবিল চাপড়ে বা চোখ রাঙিয়ে অনেকেই অনেক বেআইনী কাজ করে নিচ্ছে চোখের সামনে। যা দেখতে চাই না—তবুও চোখে দেখতে হয়। সেও এক নাটক! সে যাক—অবশেষে আইনের

একটা অংশে খুঁজে পাওয়া গেলো উপাচার্য ইচ্ছে করলে তিন মাসের জন্যে ছুটি দিতে পারেন। কিন্তু আমার কাজের জন্যে প্রয়োজন হবে প্রায় এক বছর। তিন মাস একটা এ্যাডভান্স ট্রেনিং-এর পুরো সময়ের এবং তারপর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জনের জন্যে বিভিন্ন প্রান্তে যাবো—এই ছিল প্রোগ্রাম! প্রথমে কর্তৃপক্ষ নারাজ হলে কি হবে কিন্তু অবশেষে ব্রিটিশ কাউন্সিলের হস্তক্ষেপে চক্ষুলজ্জা সম্ভবত না এড়াতে পেরে ছুটি পেলুম মুচলেকা দিয়ে—'তিনমাসের মধ্যেই দেশে ফিরবো।'

নাটক নিয়ে বিদেশে কি কাণ্ডকারখানা হয় তা চাক্ষুস দেখার অভিপ্রায়টা নিজের মধ্যে এমন দানা বেঁধেছিল যে সব কিছুতেই বেপরোয়া হয়ে পড়েছিলুম।

বি. ও. এ সি.-র জেট বিমানে কোলকাতা থেকে বেইরুট, ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে হিথ্রো বিমান বন্দরে গিয়ে পৌছুলুম। গরমকালে এতো ঠাণ্ডা ভাবতে পারিনি। বন্ধুবান্ধবরা ভাবতে পেরেছিল বলেই আমাকে যে যা পেরেছে তাই দিয়ে সাধ্যমতো জামাকাপড় স্যুট করে দিয়েছে। কেউ দিয়েছে চশমা, কেউ ব্রিফকেশ, কেউ গরম জামা-কাপড়। এর আগে স্যুট পরিনি—প্রতিজ্ঞা ছিল বিদেশ না গেলে স্যুট পরবো না।

মনে আছে, এদেশে সন্তোষবাবু যেমন অভিনয়ের অংশগুলো টুকরো টুকরো করে আগেভাগে ভাগ করে বুঝিয়ে দিতেন। সেইরকম একটা কিছু কিংবা আরও কিছু পাবো—এই রকম আশাই ছিল। কেননা সন্তোষবাবু টুকরো টুকরো অংশের গুরুত্বপূর্ণ সংলাপগুলির মধ্যে কোথায় কোন্ ভাবটা কাজ করছে তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বুঝিয়ে চলতেন। তারপর ভাব অনুযায়ী কথা দিয়ে কোথায় ছবি সৃষ্টি করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের চরিত্রটাও বেশ ভালোভাবে অর্থাৎ মনোজ্ঞভাবে রূপ দেয়া যাবে তা বুঝিয়ে দিতেন এবং প্রাকৃটিশ করাতেন। ওঁর মধ্যে শিক্ষকের অহমিকা কখনো দেখিনি। কণ্ঠস্বরের ওঠানামা, আবেগ প্রয়োগে এবং পরিমিতি রক্ষায় আমি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিলুম বলে—আমাকে অনেক অকথ্য গালাগালি খেতে হয়েছে। ছোটখাট চড়চাপড় স্নেহসুলভ বকাঝকা খাওয়া তো রোজের গা সওয়া ব্যাপার হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে যা ছিল তা হচ্ছে নিয়ম—ঠিক কাঁটায় কাঁটায় আসতে হবে—শুধু যাবার সময় ঘড়ির কাঁটা বন্ধ হয়ে থাকতো। হাজার নিয়মের মধ্যে বে-নিয়ম ছিল প্রতিদিনের শিক্ষাক্রমের শেষটা কোথায় হবে—তার জন্যে কোনো বাঁধা নিয়ম নেই। উত্তরে জবাব পাওয়া যেতো—তিন বছরে কি জানবে—আমার মতো বয়েস হলে

বুঝতে পারবে শেষটুকুকে নিয়ম দিয়ে ধরতে গিয়ে কতো না ফাঁকি দিয়েছো।

গোড়াতেই মুস্কিল দেখা দিল। বিদেশে এসে ডাল ভাত খাওয়া ধুতি পাঞ্জাবী পরা মাস্টারমশাইয়ের সান্নিধ্য তো পাবো না—কাজেই শিখবো কেমন করে? দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! আর পাঁচটা সাধারণ ভারতীয় যা চিন্তা করেন আমিও সম্ভবতঃ তার চেয়ে নিকৃষ্ট চিন্তাবিদ।

শিক্ষাক্রমের প্রথম ধাপ ছিল ব্রিটিশ ড্রামা লীগে (বর্তমান নাম—ব্রিটিশ থিয়েটার এসোসিয়েশন)—সেখানে ব্যবহারিক তালিম এবং নাট্যশিক্ষণের কোর্স করে আমাকে স্কটল্যাণ্ডে আরো হাতে-কলমে কাজ করার জন্যে যেতে হবে। তারপরে বিভিন্ন স্থানে বড় বড় থিয়েটার কোম্পানীগুলির সঙ্গে হাতে-কলমে শিক্ষা নিতে হবে এবং কাজ করতে হবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ২৪টি দেশের ছেলেমেয়েরা এসেছেন এই শিক্ষাক্রমের আওতায় কাজ করতে। ব্রিটিশ ড্রামা লীগের নাম শোনা আছে। কিন্তু ক্লাসে এসে মন ভরলো না। মাত্র দু'টি ঘর শিক্ষাদানের জন্যে নির্দিষ্ট। তার চেয়ে বর্তমান ইণ্ডিয়ান থিয়েটার আর্টসের পরিবেশ এবং স্থান অনেক বেশী। কিন্তু নাটকের পাঠাগার বলতে যা বোঝায় তা ব্রিটিশ ড্রামা লীগের পাঠাগার না দেখলে বোঝা যাবে না। ৯, ১০ ফ্রিজরয় স্কোয়ারে তিনতলা পাঠাগার ও অন্যান্য বিভাগ অনেকটা স্থান নিয়ে অবস্থিত। কিন্তু শিক্ষণ কেন্দ্রের স্থান সংকীর্ণ হওয়ার কারণ প্রথমে বুঝে উঠতে পারিনি।

এখানকার শিক্ষাক্রমের শুরু কাজ দিয়ে--কথা দিয়ে নয়। যাঁরা বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন তাঁরা সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে দিকপাল। আমি সেখানে তুচ্ছাতিতুচ্ছ এক নির্জীব প্রাণ বলে মনে হয়েছে। প্রথমে বলে নিই পাঠক্রম সম্পর্কে। তারপর একে একে যে বিষয়ের ওপর আলোকপাত করবো তা হলো—

১। কাদের সান্নিধ্য পেয়েছি

২। শিক্ষণ-পদ্ধতি

৩। শিক্ষাক্রমে কোন্ কোন্ দিক ভালো লাগলো এবং কেন ভালো লাগলো।

৪। ছাত্র ও শিক্ষক সম্পর্ক

৫। নিজস্ব সিদ্ধান্ত

পাঠক্রমে দেখা গেলো নিম্নলিখিত বিষয়গুলি :

(ক) বিশ্বনাট্য মঞ্চের ইতিহাস ও বিবর্তন

(খ) নাট্য-নির্দেশনা
(গ) মূকাভিনয় ও শারীরিক গঠন এবং সমতা (Balance)
(ঘ) ইম্প্রোভাইজেশন ও গ্রুপ ইম্প্রোভাইজেশন
(ঙ) মেক-আপ
(চ) আলোকসম্পাত
(ছ) মিউজিয়াম স্টাডি
(জ) সাউণ্ড এণ্ড এফেক্ট
(ঝ) দৃশ্যসজ্জা ও আসবাব
(ঞ) ভয়েস কালচার
(ট) মঞ্চ নির্মাণ
(ঠ) আলোক-সম্পাত
(ড) প্রোডাকশন সারকেল
(ঢ) অভিনয় দেখা ও আলোচনা
(ণ) মাইম
(ত) গ্রুপ ডিসকাশন

শিক্ষাক্রমে অনুপ্রবেশের আগেই বন্ধু এবং অন্যতম নাট্যবিদ জর্জ ম্যালভিয়াসের সান্নিধ্য লাভ। যিনি বর্তমানে ইণ্টারন্যাশন্যাল এ্যামেচার থিয়েটার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী জেনারেল। শিক্ষাগ্রহণের শুরুতেই ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় আমি ইণ্টারন্যাশন্যাল কনফারেন্সে যোগদানের অনুমোদন পেয়েছিলাম ভারতবর্ষের বর্তমান নাটকের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দিতে। উনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন—ভারতবর্ষে ফিরে নাট্য উন্নয়নের যে-কোনো রকম সম্ভাব্য সাহায্য তিনি আমার দেশের স্বার্থে করবেন। আমি কিংস্‌ওয়ের 'কোরা হোটেলে'র কনফারেন্সে ভারতীয় নাট্যকলা সম্পর্কে বক্তব্য রেখে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলুম। বলতে বাধা নেই—গিরিশ কনার্ড থেকে গার্গে, তনবির থেকে তনদত্ত কর, উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কেউই বাদ যায়নি আমার আলোচনায়—এমন কি প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার ঐতিহ্য পর্যন্ত। শুধু দুঃখ বা খেদ—ওঁরা ম্যাজিক, কথক আর কুচিপুরি নৃত্য এবং লোকসংগীত ছাড়া আধুনিক ভারতীয় নাট্যবিবর্তন সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ভারত সরকারকে চিঠি লিখেও জবাব পান না। সুতরাং ঐ উচ্চবর্গীয় পরিমণ্ডলে আমার অবস্থিতি যেন নিজের কাছে একটা সার্কাসের ক্লাউনের মতো মনে হচ্ছিলো। যাক সে কথা।

ম্যালভিয়াস প্রতিশ্রুতি রেখেছেন—ফলে ইণ্ডিয়ান থিয়েটার আর্টস্ প্রতিষ্ঠিত হয়ে অন্ততঃ কিছু শিক্ষিত ছেলেমেয়ের দল এখানে এসে এক সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। ড্রামা লীগে যাঁদের শিক্ষকরূপে পেলুম তাঁরা হলেন—জন লুকাস, হিউজ মরিশন, ম্যালকাম মরিশন, মার্টিন এস্‌লিন, বেন বেনসন্, মণিকা মুরি, জিন হেলডন, এলেক ম্যাকগণ প্রমুখ শিক্ষাবিদ্ এবং পরিচালকদের।

বর্তমানে শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে অল্প কথায় কিছু বলার চেষ্টা করি। বিস্তৃত বিবরণ সম্ভব হবে না স্বল্প পরিসরের জন্য।

গোড়াতেই অবাক লেগেছিল এখানে এতো বিষয়—মাত্র কয়েকমাসের মধ্যে কেমনভাবে শিক্ষা দেয়া হবে? আর তার প্রয়োজনীয়তাই বা কতোটুকু?

প্রথমেই বলে নিই—আমরা যারা এখানে কাজ করার জন্যে এসেছি তারা সকলেই প্রায় সমস্ত বিষয় সম্পর্কে কিছু-না-কিছু জেনে তবেই এসেছি। তাহলে এখানে আসার বাড়তি কারণগুলি কি কি?

প্রথম কারণ—বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থী—যাঁরা পাঠক্রমে এসেছিলেন তাঁদের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে চিন্তাধারার এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে ভাব-বিনিময়। এখানেও জ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটছে বিভিন্ন দেশের নাট্য-কলা ও শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে।

শিক্ষাগ্রহণ করে তবেই এই শিক্ষাগ্রহণে অংশ নেয়া যায়। কারণ শিক্ষাগ্রহণ করেও অর্জিত বিদ্যাকে শিক্ষক হিসাবে কিভাবে কাজে লাগাবো বা লাগানো যেতে পারে—সেটাই ছিল এই শিক্ষাক্রমের গভীর তাৎপর্য বিষয়।

তাই ব্রিটিশ ড্রামা লীগে শিক্ষা দেয়ার চেয়ে শিক্ষাকে আরো বাস্তবায়িত এবং পরিশীলিত কিভাবে করা যায়—সম্ভবতঃ সেটাই ছিল শিক্ষাক্রমের মূল আলোকপাতের বিষয়।

প্রথম মাসটা প্রায় আমার জ্ঞাত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হলো। সুতরাং মনোজ্ঞ বলে মনে হলো না। হোটেলে ফিরে চিন্তা করেছি এবং পরবর্তীকালে একটা সিদ্ধান্তেও এসেছি—প্রাথমিক পর্যায়ে যা নাকি আমার জানা—হয়তো অন্যের না জানা থাকতে পারে—তাই ভূমিকা হিসেবে প্রথম মাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম মাসে অধ্যাপকরা এসে লেকচার দিয়েছেন—কাজ বুঝিয়ে দিয়েছেন কিন্তু পরবর্তী সময়ের জন্যে যাবতীয় কাজ আমাদের নিজের হাতে করতে হতো। শিক্ষকের ভূমিকা সেখানে আমার বোঝার স্বপক্ষে যেখানে অসুবিধা হচ্ছে সেখানে পরিষ্কারভাবে ধারণা স্থাপনা করা।

বিশ্বনাট্য মঞ্চের ইতিহাস পড়ানো হতো নোট দিয়ে বা গুরুগম্ভীর বক্তৃতা

দিয়ে নয়। সাদাপর্দার ওপর বিভিন্ন যুগের থিয়েটারের বিবর্তন ধারার রঙিন ছবি দেখিয়ে এবং তার খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে পুঁথিগত জ্ঞানের সঙ্গে চোখে দেখার জ্ঞানকেও সক্রিয়ভাবে প্রতিভাত করা হতো। কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে ক্লাসেই প্রশ্ন আহ্বান শুনতে পেতুম অধ্যাপকদের কাছে। এ ছাড়া ফটো কপি করে আলোচ্য বিষয়ের নোট হাতেনাতে দিয়ে দেয়া হতো। অর্থাৎ হোটেলে ফিরে টি.ভি. দেখা বা বিশ্রাম করার কোনো অবকাশ পাওয়া যেতো না। নোট না দেখলে যা শিক্ষা নেয়া হলো তা কখনোই মগজে অনুপ্রবেশ করতো না। আনুসঙ্গিক রিডিং মেটিরিয়াল হিসেবে রেফারেন্স বই দিয়ে দেয়া হতো হাতে হাতে। অর্থাৎ শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজে কি করে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে নির্ভরশীল হওয়া যায় তারই একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা আর কি!

শিক্ষকের ভূমিকা শিক্ষা দেয়া বা নিজে কতোটা শিক্ষিত তা প্রমাণ করার জন্যে নয়—শিক্ষকের ভূমিকা অনেকটা পর্যবেক্ষকের মতো। আমার কোথায় চিন্তা-জগতে ভাঁটা পড়েছে কেমনভাবে—আমি কোন্ জায়গা বুঝতে পারছি না এবং কোন্ জায়গায় আরো কিছু করার আছে তা বুঝিয়ে দেবার জন্যেই শিক্ষক। আমি কোনো জিনিস বুঝতে না পারলে কোন্ জায়গায় অসুবিধার জন্যে আমার বোঝাটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তাকে সঠিকপথে পরিচালিত করার জন্যেই শিক্ষক। সুতরাং কাজ শিক্ষকরা করেন না—কাজ করে ছাত্ররা। শিক্ষকরা ত্রুটি ধরান এবং কোথায় কি করলে জিনিসটা আরো ভালো হতে পারে তার সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

এরপর ব্যাপকভাবে থিয়েটার দেখা। বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহ থেকে কম দামে টিকিট সরবরাহ করা হয় আমাদের জন্যে। নাটক দেখার পরে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমরা রাত্রে চিন্তা করে রাখি। পরদিন সেই নাটকের পরিচালক আমন্ত্রিত হয়ে এসে উপস্থিত হন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। আমরা সরাসরি প্রশ্ন রাখি তাঁর কাছে। তিনি উত্তর দেন যথাযথভাবে। কোনো বিষয়ে উত্তর দিতে না পারলে সরাসরি বলেন—'আমি পরে জেনে নিয়ে উত্তর দেবো।' কপট গাম্ভীর্যতার কোনো স্পর্ধা কোনো শিক্ষককে অভিভূত করে না। বিষয় না জানা থাকলে যে-কোনো যুক্তি খাড়া করে সেই যুক্তির স্বপক্ষে কিছু বলার মতো চেষ্টা এখানকার শিক্ষকরা করেন না।

সত্যি তো—একজনের পক্ষে সবকিছু জানা কি সম্ভব? সেই জন্যে অজানা বিষয়ের স্বপক্ষে অকাট্য যুক্তি খাড়া করার চেয়ে নিজের দীনতা স্বীকার

করায় কি আসে যায়। বরং অজানা বিষয় সহজেই সেই শিক্ষক ... পারেন—জানতে পারেন নানাভাবে।

দ্বিতীয় মাসে—সপ্তাহে প্রায় তিন দিন প্রখ্যাত মিউজিয়ামে গিয়ে বিভিন্ন যুগের পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাব, অলংকার ইত্যাদি চোখে দেখে বক্তৃতা শুনে জ্ঞানার্জন কতো হতো। প্রথমে ভাবতুম ইংরেজিতে তো নাটক করবো না সুতরাং এই ধরনের স্টাডির কি প্রয়োজন আছে? তারপর এক অধ্যাপকের কাছে জানতে পেরেছি—ইংরেজি নাটক প্রযোজনা করতে গেলে যেমন এই ভাবে কাজ করতে হবে তেমনি তোমার দেশের ভিন্ন যুগের ভিন্ন বিষয়ের নাটকের ওপর কাজ করতে গেলে সেখানকার সংগ্রহশালাকে কি-ভাবে উপেক্ষিত করবে? চোখে না দেখে নাট্য-শিক্ষা কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। মনে হয়েছে এটা এদেশের প্রচারযন্ত্র হলেও এর একটা ভালো দিক আছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো—ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম বা ভিক্টোরিয়া মিউজিয়াম সত্যি কি মহত্তর কোনো কাজের জন্যে ব্যয় করা হয়? নাকি তীর্থযাত্রী বা আঙ্গুলে গোনা গবেষকদের জন্যে আমাদের দেশে ঐ সব মিউজিয়ামের অস্তিত্ব?

গোটা শিক্ষাক্রমের মধ্যে দোসিওলজি, এনাটমি, সাইকোলজি এবং মাস্টার প্রম্পট কপির স্থান রাখা হয়নি বলে আমি কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অবহিত করে এসেছি। তাছাড়া, যাঁরা শিক্ষা দিতে এসেছিলেন তাঁরা ইংলণ্ডের নামজাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক-একজন বড় বড় শিক্ষক। অর্থাৎ আমাদের কোর্সের শিক্ষক কোনো সর্ব সময়ের শিক্ষক নয়। বিভিন্ন শিক্ষণ-কেন্দ্রের যাঁরা দিকপাল তাঁদেরই নিয়ে আসা হয়েছে এই অগ্রসরসরমান শিক্ষার্থীদের তালিম দেয়ার জন্যে।

ক্লাসের মধ্যে স্কেল ধরে প্লান ঠিক করে এমনকি রঙ্ তুলি ধরে স্টেজের মডেল আমাদের তৈরি করতে হতো। এঁটেল কাদার মতো প্লাস্টিক—অফুরন্ত রঙ্ দিয়ে সেট তৈরি করতে হতো কাগজে-কলমে (নির্বাচিত নাটকের)। শিক্ষক তাঁর বক্তব্য রাখতেন সকল ছাত্রদের সামনে—তার মধ্যে কোন্টা উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হলো তিনি যুক্তি সহকারে তাঁর বক্তব্য রাখতেন। সেখানে আমাদের ভূমিকা প্রশ্নের জবাব দেয়া। আমি কেন প্রসিনিয়াম ভাঙলুম—ব্লু রঙের সঙ্গে খয়েরী রঙ মিশিয়ে ঐ উঁচু পিলারের মধ্যে কি কনট্রাস্ট দেখাতে চেয়েছি? গ্রাউণ্ড প্লানের সঙ্গে গোটা সেট এবং এলিভিশনের কোনো তফাৎ ঘটেছে কিনা—ঘটলে কেন

শরীরচর্চা ইত্যাদি সব বিষয়ে জবাব দিতে পারলে তবেই আমি সার্থক শিল্প নির্দেশক। বলেই ফেলি 'ওয়েটিং ফর গোডোট্' নাটকে দৃশ্যসজ্জা রচনায় আমি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলুম সামগ্রিক বিচারে।

শরীর গঠন, মাইম এবং ইম্প্রোভাইজেশন নিয়ে সমগ্র পাঠক্রম জুড়ে ক্লাস হতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এই বিষয়গুলি আগেও বলেছি ভীষণ ইনটারেস্টিং—তাই এবিষয়ে পরে আলোচনা করছি।

ড্রামা লীগে লাইটিং ক্লাস করার জন্যে কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এর জন্যে বিভিন্ন স্টুডিওতে গিয়ে কাজ করতে হতো—এমনকি বিভিন্ন প্রযোজনা দেখে নেপথ্য শিল্পীদের বক্তব্য শুনে জ্ঞানার্জন করতে হতো। শহরের বিভিন্ন স্থানে হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়ার জন্যে ছোট ছোট স্টুডিও ভাড়ায় পাওয়া যায়। সেখানে লেকচারারও থাকেন। তিনি সাউণ্ড দিয়ে এবং স্টুডিওর মধ্যে ছক কাটা প্লানিং দেখিয়ে এবং বাস্তবে বিভিন্ন আলোর প্রয়োগ পদ্ধতি বুঝিয়ে যথাসম্ভব হাতে-কলমে প্রাথমিক শিক্ষা দিতেন। সঙ্গে ছাপা বা সাইক্লোস্টাইল করা কাগজ দিতেন পরবর্তী সময়ে অধ্যয়নের জন্যে। এমনকি রঙিন ছবি পর্যন্ত।

নেপথ্যে আবহসংগীত বিষয়টির ওপর প্রাথমিক ধারণা ক্লাসে দেয়ার পর—টেপ কাঁধে ঝুলিয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে শব্দ সংগ্রহ করতে হতো। একটা নাটকের প্লানিং-এর সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে বিভিন্ন ধ্বনিকে যন্ত্রের সঙ্গে এবং যন্ত্রের সাহায্যে নিজে নিজে আলাদা করতে হতো। এছাড়া টেপ এবং লাইব্রেরী থেকে বিভিন্ন সাউণ্ড ধার করে আবহসংগীত সৃষ্টির কাজে তা হাতে-কলমে কাজ করে দেখাতে হতো। এমনকি মিক্সিং এবং ডাবিং পর্যন্ত। শেষে সাউণ্ড এফেক্ট একত্রিত করার পর আমি যা কাজ করেছি তার একটা গোটা হিসাব দাখিল করতে হতো ক্লাসে সকল ছাত্র এবং শিক্ষকদের কাছে। আমার কোনো বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যা হলে—একটি সামান্য কাগজ উড়ে যাবার শব্দটির তাৎপর্য পর্যন্ত ব্যাখ্যা করতেন, শিক্ষক মশায়। এমনকি আমি যতক্ষণ না খুশী হতুম ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আমাকে তাঁর বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করতেন। উল্টোদিক থেকে আমার কাছে যদি ভালো কাজ পাওয়া যেতো তাহলে ভালো কাজটি আদায় করার জন্য সরাসরি প্রশংসা করা হতো। যদিও কাজ করানোর দায়িত্ব নির্দিষ্ট শিক্ষকদের হাতে ন্যস্ত থাকতো।

নির্দিষ্ট কোনো দিনে ওল্ডভিক, চ্যারিং ক্রস কিংবা পিকাডালী সার্কাসে

কোনো বড় পরিচালকের প্রযোজনার প্রস্তুতির সময়ে আমাদের সদলবলে নিয়ে গিয়ে হাজির করা হতো। সেই নোতুন প্রযোজনায় কি ব্যাপকভাবে একটা তার সার্থক রূপায়ণের স্বার্থে সকলে কেমনভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তার চাক্ষুস ধারণা দেয়ার জন্যে।

বড় বড় থিয়েটার কোম্পানীগুলোর সঙ্গে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কর্মীদের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং কিভাবে নিয়ম বেঁধে তাঁরা কাজ করেন তার প্রায় সবটুকুই খুঁতিয়ে নাতিয়ে জানতে পারা যায়। প্রতি থিয়েটারে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কাজ করার জন্যে যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। থিয়েটারের উন্নতির জন্যে, আর্ট কাউন্সিল, মিউনিসিপালিটি কর্তৃপক্ষ, সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যেন টাকার যোগান দেবার জন্যেই বসে আছে। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার ঐতিহ্য যেন ঐ দেশের মানুষদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে।

এরপরে প্রপসমেকিং এবং মঞ্চে রঙের ব্যবহার বিষয়ে তালিম। কাগজ কেটে, ক্লে-মডেলিং করে নানান ধরনের প্রপস তৈরি করতে হতো হাতে-কলমে। মঞ্চে রঙের ব্যবহার সম্পর্কে এপিডায়েস্কোপের সাহায্যে রঙিন ছবি সাদা পর্দায় ফেলে বিভিন্ন রকমের দৃশ্যসজ্জার প্রতিবেশে চরিত্রদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদের রঙ কেমন হবে বা হওয়া উচিৎ তা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে এবং দেখিয়ে দেয়া হতো।

মাইম বিষয়টা নিয়ে নিজের দেশে বেশকিছুটা চর্চা থাকার ফলে আমি ঐ বিষয়ের ওপর অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলুম। শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সমতা রক্ষার জন্যে একনাগাড়ে দুমাস প্রায় তিনঘণ্টা করে শরীর নিয়ে নানান ধরনের ব্যায়াম করতে হলো। শরীরের ব্যায়ামের সঙ্গে কণ্ঠস্বরের উচ্চারণ-ভঙ্গিমার এবং বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ শেখানো হতো একটি ঘরে কিন্তু যৌথভাবে। কখনো টেপ রেকর্ডিং চালিয়ে শরীরকে বাজনার তালে তালে ঘোরপাক খায়ানো—ধীর থেকে দ্রুত লয়ে চলা পর্যন্ত অভ্যাস করতে হতো।

ওদেশে প্রায় সকলেই স্ব-নির্ভর বলে কোনো কিছু জানার বিষয়টা অন্যের ওপর নির্ভর না করে নিজের নির্ভরতার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হয় আগে। নইলে লাইন ধরে শিক্ষাক্রম এগিয়ে চলবে—আর পরনির্ভরশীল হয়ে অপেক্ষা করলে অনেক কিছু, অনেক সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যাবে। শিক্ষার্থী নিজে নিজেই পিছিয়ে পড়বে নিজের অজান্তে।

এখন বলি ওদেশে শিক্ষাক্রমে কোন্ কোন্ দিকগুলো আমার ভালো লাগলো—সে বিষয়ে টুকিটাকি কিছু কথা।

সমস্ত শিক্ষণ-পদ্ধতির মধ্যে তিনটি বিষয় ছাড়া আমার কাছে অন্য বিষয়গুলি খুবই গতানুগতিক বলে মনে হয়েছে। আলোকসম্পাতের কাজ শিখতে গেলে তিনশো স্পট না পেলে শিখতে পারবো না—সেটা খুব একটা যুক্তিপূর্ণ কথা নয়। মাইম থেকে স্টেজক্রাস্ট—নাট্যবিশ্লেষণ, ইতিহাস তত্ত্ব—সবই এদেশে বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা আছে। তিনটি বিষয় যা সত্যি আধুনিক শিক্ষাক্রমের একটা বিশিষ্ট—বিশেষ করে অভিনয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট দ্বার উন্মোচিত করতে পারে বলে মনে হয়—তা হলো :

a) Improvisation and Group Work

b) Production Circle

c) Outdoor Work

যদিও তত্ত্বকে আমি ব্যবহারের বাইরের জিনিস বলে মনে করি না। ইংলণ্ডের প্রায় খান পঞ্চাশেক নাট্যপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ঘুরে দেখেছি এবং অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা করেছি রীতিমতো—নাট্যশিক্ষণের উন্নয়নের কোনো পথের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা এই নিয়ে। প্রশ্ন করেছি—তত্ত্ব না শিখিয়ে এতো প্র্যাকটিশের দিকে ঝোঁক দেন কেন?

জবাব পেয়েছি অনেকটা এই রকম—দুটোকে আলাদা করে দেখার মানে হয় না জানি। তবুও আমরা যেটা প্র্যাকটিশ করানোর চেষ্টা করি সেটা কিন্তু সুপরিকল্পিত চেষ্টার ফল হিসেবে—নিয়ম ধরে। সুতরাং সুপরিকল্পনার বিষয়টার মধ্যে তত্ত্ব লুকিয়ে আছে, আসলে তত্ত্বটা তত্ত্বকে বোঝানোর জন্যে বিশেষভাবে প্রয়োগ না করে—কোন্ তত্ত্বটা দিয়ে কতোটা বেশী কাজ করানো যায় সেই দিকেই ঝোঁক দিই বেশী। ফলে তত্ত্ব শক্ত না হয়ে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ও জিনিসটা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহজ এবং খুব কাছের জিনিস বলে মনে হবে। আর এই মনে হওয়া বিষয়টা শেষ হলে তত্ত্ব আর ব্যবহার কখনো আলাদা বলে মনে হবে না।

মনে মনে ভেবেছিলুম—আধুনিক প্রয়োগে বিজ্ঞানের প্রচলিত ধারা নিয়ে বেশ কিছু শিখতে পারবো। ওমা! আমেরিকান এবং কোনো এক ব্রিটিশ শিক্ষক স্তানিস্লাভস্কির প্রয়োগ পদ্ধতির কথা শুনে তো লাফিয়ে উঠলেন। তবে কি রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব? না, ওঁরা মনে করেন স্তানিস্লাভস্কির মেথড বলে

কিছু নেই—যা মেথড তা হচ্ছে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত কিছু বিষয় নিয়ে জাবর কাটার মতো। যে মেথড ফলো করে আয়ত্ত করা যায় না সে মেথডে কি লাভ? আমি খুব বড় পণ্ডিত নই বলে—এ নিয়ে তর্কে মন দিতে চাইনি। তবুও স্তানিস্লাভস্কিকে খুঁজে পেয়েছিলুম—ইমপ্রোভাইজেশন আর গ্রুপ ওয়ার্কের মধ্য দিয়ে। খুঁজে পেয়েছিলুম ভরতের নাট্যশাস্ত্রে।

এখন সেই প্রসংগেই আসি অর্থাৎ সেই ইনটারেশটিং বিষয়ে।

…রেডি, প্রস্তুত আছো? · একশান। আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই রইলুম।

—কি হলো action বললুম, দাঁড়িয়ে আছ কেন? তোমরা কি জড় পদার্থ না মূকবধির!

আমরা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছি রীতিমতো। যা কবি বা অভিনয়ের জন্যে যা করা উচিৎ তা তো ভেবেচিন্তেই করি। কিন্তু হুট করে যদি কেউ কোনো action করতে বলে আমরা স্বভাবতই থেমে থাকবো। কারণ, কি করবো তা তো জানি না। আর নির্দিষ্ট সূত্র না থাকলেও ভূমিকা বলে যদি কিছু থাকতো তাহলে অন্তত কিছু একটা করা যেতো। কাজেই প্রায় সকলেই খানিকটা নির্বোধের মতো নির্বিকার হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। এর মধ্যে নাই-জেরিয়ার বন্ধু ম্যাট, আর নিউজিল্যাণ্ডের বান্ধবী লিজ একটু নড়াচড়া করার চেষ্টা করলেন।

ম্যালকাম -মানে আমাদের ইনস্ট্রাকটরের ঠিক ওদিকে লক্ষ্য পড়েছে। আঙুল তুলে লাইন থেকে ওদের দুজনকে আলাদা করে দিলেন। তার ধমক। নিশ্চয়ই তোমরা কোনো প্রশ্ন রাখতে চাও? কিন্তু আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রশ্ন চাই না—আমি চাই তোমরা কিছু করো।

আমি তখন বিষয়টার গভীরে চলে গেছি। আসলে আমার প্রতিক্রিয়াহীন নিস্তব্ধতা দেখে আমাকেও ম্যাট আর লিজের দলে টেনে আনা হলো। প্রায় একই রকমের প্রশ্ন—পিকে (ওদেশে আমার তাৎক্ষণিক পরিচিতি) তুমি action বলার সময় কিছু করলে না কেন? আমি কিন্তু তোমার কাছে কিছু প্রত্যাশা করেছিলুম।

আমি রথম্যান সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিজের ঠোঁটে লাগিয়ে আর একটা সিগারেট ম্যালকামের দিকে এগিয়ে দিলুম। উনি স্বচ্ছন্দে তা নিলেন। সিগারেট ধরালেন। অনেকটা ধোঁয়া ছেড়ে আবার

বললেন, কৈ আমার কথার জবাব কথায় দিলে না তো ? আমি খুব গম্ভীরভাবেই জবাব দিলুম—I am still in action—আমি সিগারেটটা খাচ্ছি—কিন্তু এরই ফাঁকে আমি আমাদের দেশে আমার স্ত্রীর কথা ভাবছি—ভাবছি আমার দুষ্টু মেয়েটার কথা—'হেয়ার ইজ দি ফটোগ্রাফ উইথ অটোগ্রাফ অব মাই হাফ এণ্ড কিড।' আমার কথা শুনে ক্লাসে সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

কয়েক মুহূর্তের পর হাসি থামলো। জবাব পেলুম—You know humour but you are so cleaver. ঠিক আছে এখন পাঁচ মিনিট বিশ্রাম। তোমরা যেখানে খুশী যাও আর ঠিক পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এসে প্রত্যেকে শোনাবে কে কতো রকমের শব্দ করতে পার। ম্যালকামও বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু শব্দ করার বিষয়টা কি শুধু মুখ দিয়ে না অন্য কোনো উপায়েও করতে পারি তার সম্পর্কে তিনি কিছুই বললেন না। এই বিশ্রামের অবকাশে আমি একবার বিষয়টা সম্পর্কে সচেতন হবো বলে এগিয়ে গিয়েছিলুম। তিনি কপালে ভাঁজ কেটে বললেন—পিকে আমাদের যা বিষয় তা হচ্ছে unlimited—please don't try to make you study limited.

ম্যালকম সাহেব ঘুরে ঘুরে লক্ষ্য রেখে চলেছেন—এ বিষয়ে কেউ কারোর সঙ্গে আলোচনা করছেন কি না। না সবাই আলাদাভাবে ভাবছেন—কেউ সিগারেট খাচ্ছেন—কেউ কফি—কেউ টিনের সিল খুলে লাগার খাচ্ছেন—কেউ আবার চোখ বুজে ভাবছেন। অন্যদূর ঘর থেকে কারো একক কণ্ঠস্বর ভিন্ন ধ্বনিতে উচ্চারিত হয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। পাঁচ মিনিট অতিবাহিত হবার পর সবাই একটা ঘরে এসে জমা হলুম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেল—সকলেই মুখ দিয়ে ঝড়, বাঘের ডাক, পাখা, কাকের আওয়াজ, মোটর রেল গাড়ী, ইত্যাদি নানা প্রকারের শব্দ করছে। আমি আর অস্ট্রেলিয়ান এবং ইজরায়েলীর বান্ধবী কিছু অভিনবত্ব দেখাতে পেরেছিলুম। ওরা বিভিন্ন বস্তু সহযোগে শব্দ করেছিল। আমি মুখ, হাত, পা, দেহ ইত্যাদি সব মিলিয়ে প্রায় ৫০ টির বেশী রকমের ধ্বনি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলুম।

তারপরেই এলো একক নয় যুগ্মভাবে—এক সারিতে দাঁড়াতে বলা হলো। একজন একটি লাইন বলে থেমে গেল। তারপর অন্যজন আর একটি লাইন বললো আগের জনের কথার সঙ্গে মিল রেখে। এইভাবে চব্বিশ জন চব্বিশটা লাইন বলে একটা সুন্দর নাটকীয় গল্প সৃষ্টি করে ফেললো মুহূর্তের মধ্যে।

শিক্ষকমশাই সারির প্রথমজনকে প্রশ্ন করলেন—এই যে গল্পটা রচনা বা সৃষ্টি করা হলো এর জন্যে তুমি কি প্রস্তুত ছিলে? উত্তর—না।

এইভাবে তিনি সকলকেই একই প্রশ্ন করলেন। সবাইকার জবাব এক—না। তা হলে সৃষ্টি হলো কি করে? প্রথম কারণ—তোমরা স্রষ্টা। দ্বিতীয় কারণ—যা আজকে আমার বিষয় অর্থাৎ ইম্প্রোভাইজেশন তা হলো—আগে ভাগে কোন কিছু ঠিক না করে নিজের আত্মশক্তির ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখে নোতুন কিছু সৃষ্টি করা। মঞ্চের ওপর এমনটি করা হয়তো চলবে না কিন্তু যখন নাট্যশিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং শেখাবে তখন তাদের মধ্যে প্রতিভা কতখানি আছে তা জানার জন্যে এইটা একটা উৎকৃষ্ট পন্থা হিসেবে ধরে নিতে পার। চলতি অভিনয়ে এজাতীয় কাজ করার অসুবিধা যেখানে হোচ্ছে সেখানে দর্শককে পরোক্ষভাবে জবাবদিহি করার একটা বিষয় আছে।

এই নিয়ে বহু ক্লাস হয়েছে। দশ হাজারের ওপর একসারসাইজ করা চলতে পারে। এখন স্বাভাবিকভাবে বর্তমান লেখকের লেখার প্রতি যাঁরা একটু মনোযোগ দিয়েছেন তাঁদের কাছে নানারকম প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। প্রশ্নগুলির বিষয়ে একটু আলোকপাত করি।

…তাহলে 'ইম্প্রোভাইজেশন' বলতে এক কথায় কি বুঝবো? উত্তর—পূর্ব প্রস্তুতি না নিয়ে কোন কিছু সৃষ্টি করা। কিন্তু সেই সৃষ্টির উৎস—শুধু কি মুখ দিয়ে সৃষ্টি অর্থাৎ নোতুন শব্দ সৃষ্টি করলেই ইম্প্রোভাইজেশন হবে? আমাদের দেশের হরবোলা কি ইম্প্রোভাইজেশন করেন? না; তা বলছি না। হরবোলাদাদা তো সাইন করছেন দক্ষতা অর্জন করে। কিন্তু সৃষ্টির শুরুতে তিনি হয়তো অজান্তে অনেক ইম্প্রোভাইজেশনের আশ্রয়ে আশ্রিত ছিলেন—যে সব খুঁটিনাটি হিসেব কোন সৃষ্টিশীল সৃষ্টিকর্তার পক্ষে এক নিমিষে দেয়া সম্ভব নয়।

ইম্প্রোভাইজেশন একক হতে পারে। আবার গ্রুপও হতে পারে। নাটক অভিনয় শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রুপ ইম্প্রোভাইজেশন খুব একটা উৎকৃষ্ট পন্থা।

তাহলে সেই একই প্রশ্ন—শুধু ধ্বনি বা শব্দ দিয়ে কি ইম্প্রোভাইজেশন? এককথায় জবাব—না। শরীর দিয়ে হয়। শরীরের সঙ্গে কথা যুক্ত করে। শরীরের সঙ্গে শব্দ বা বিভিন্ন ধ্বনি যুক্ত করে। এমন কি লেখালিখি করে এবং শরীরের সাহায্যে শুধু ভাবের অভিব্যক্তি ঘটিয়ে।

এককভাবে এই শাস্ত্র-অধ্যয়ন করলে আত্মগত উপলব্ধির বিষয়টিকে জাগরিত করতে পারে। কিন্তু অভিনয় যখন দলীয় স্বার্থের সঙ্গে সংপৃক্ত তখন গ্রুপ

ইম্প্রোভাইজেশনের উপযোগিতা যে কি সাংঘাতিকভাবে নাট্যশিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে সে সম্পর্কে দু'একটা কথা উদাহরণ সহযোগে বলার চেষ্টা করি।

ধরুন—'ক' 'খ' 'গ' বাবুকে চিঠি লিখতে বলা হোলো। তাঁরা চিঠি লিখবেন তাঁদের কোন দূর প্রবাসের প্রিয়জনকে—বন্ধু, প্রেমিকা, মা, বাবা, ভাই, বোন শিক্ষক যাকে খুশী। তাকে অবশ্যই বাস্তবের মানুষ হতে হবে। চিঠি এমনভাবে লিখতে হবে যাতে ভাষায় বোঝা যায় যাকে চিঠি লিখছে সে কোন্ প্রকৃতির মানুষ, আচার-আচরণ, বয়েস ইত্যাদি অর্থাৎ গোটা মানুষটার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আভাষ থাকে যেন। এখন 'ঘ' 'ঙ' 'চ' বাবু সেই চিঠি পড়বেন। চিঠি যখন পড়বেন তখন 'ঘ' 'ঙ' বা 'চ' বাবুকে আমরা যেভাবে রোজ দেখি সেভাবে দেখতে চাই না। তাঁরা চিঠি পড়বেন চিঠির অন্তর্গত ভাববৈশিষ্ট্যকে অনুধাবন করে যাদের চিঠি লেখা হয়েছে ঠিক তাদের মতন। যদি চিঠি পড়ায় আচার-আচরণ ভুল হয় তা হোলে যাঁরা চিঠি লিখেছেন তাঁরা সংশোধন করবেন। যদি চিঠির লেখক সংশোধন করতে অক্ষম হন এবং পাঠকের পড়া, আচার-আচরণ সম্পর্কে বক্তব্য না রাখতে পারেন তা হোলে বুঝতে হবে চিঠিটি বাস্তবের কোনো মানুষকে লক্ষ্য করে লেখা নয়—চিঠিটি সম্পূর্ণ বা অংশতঃ কাল্পনিক।

এরপর ধরুন, সাতজনের একটি গ্রুপকে বলা হোলো—কথা না বলে সমুদ্রে পালতোলা নৌকা হয়ে যাও। অথবা গভীর জঙ্গলে ঝড় উঠেছে—বৃষ্টি এসেছে—কাঠ কেটে ফেরার পথে গোরিলার সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ।

অথবা একটি পার্কের দৃশ্য। এখানে উপস্থাপনার জন্যে সময়-সীমা নির্ধারিত করে দেয়া যেতে পারে। এইসব সৃষ্টিশীল অভ্যাসের জন্যে বিষয়টাকে সুপরিকল্পিত করার পক্ষে মোটামুটি একটা সামান্য ধারণা নির্ধারণ করে নেওয়া যায় অনায়াসে।

এই জাতের নানা ধরনের অভ্যাসের পর শুধু ভাব নয় ভাষা বা শরীরের কৌশলের সঙ্গে কথার সংযোগ ঘটিয়ে বিভিন্ন অভ্যাস এমনকি একদল মানুষকে আলাদা আলাদা করে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে কোনো একটা ঘটনা দিয়ে দিন—গল্প হিসেবে। পনেরো মিনিট সময় দেবেন।তারপর তারা •নিজেরাই এসে নাটক করবে পাঁচমিনিটের মধ্যে। এই বিষয়টি অবিশ্যি আমি বিদেশে শিখিনি কিন্তু মাথা খাটিয়ে এদেশের স্বল্প-মেয়াদী শিক্ষাক্রমে কাজে লাগিয়ে অসম্ভব রকমের ভালো কাজ পেয়েছি।

এই অপ্রচারিত এবং অপ্রচলিত (এদেশে) বিষয়কে নাট্যশিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কাজে লাগালে একটা দ্রুত সম্ভাবনাময় প্লাটফর্ম গড়ে তোলা যেতে পারে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

কেননা, এই শিল্পের বেশ কয়েকটি উপযোগিতা আমি হাতেনাতে প্রমাণ পেয়েছি। প্রথমত, সৃষ্টিশীল মনকে তীব্রভাবে কার্যকর করা যায়। দ্বিতীয়ত, মনোযোগ শক্তি বাড়ে। তৃতীয়ত, কল্পনাশক্তি সংগঠিত ও সম্প্রসারিত হয়। চতুর্থত, এইস্থেটিক সেনস্ বাড়ে। পঞ্চমত, আবেগের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির একটা সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপিত হয়। ষষ্ঠত, সৃষ্টির ক্ষেত্রে নোতুন অবদান সম্পর্কে অবহিত হয়ে ভবিষ্যতে আরো সম্ভাবনাময় কিছু করা যায়। সপ্তমত, একসঙ্গে একটা সার্থক সৃষ্টির জন্যে সবাই মিলে-মিশে কাজ করা যায়। অষ্টমত, একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ বেশী বলে ভাব-বিনিময়ের সুযোগ খুব বেশীভাবে কার্যকর হয়—অন্য কথায় বিভেদহীন নীতিতে বিশ্বাসী হওয়া যায়।

এই বিষয় নিয়ে আরো কিছু লেখার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু প্রকাশক পাতার সংখ্যা সম্পর্কে একটু সচেতন এবং সাধারণ ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতার বিষয়ে আগেভাগে অভিজ্ঞান দেয়ার জন্যে এ বিষয়টি সম্পর্কে এইখানেই ইতি টানলুম।

এখন 'প্রোডাকশন সারকেল' নিয়ে কিছু কথা। প্রথমে 'Production Circle' কথাটা শুনে একটু ভেবাচেকা খেয়ে গিয়েছিলুম। এদেশে ফিরে এ পর্যন্ত অনেক মাস্টারমশাইকে ঐ বিষয়টির তত্ত্ব সম্পর্কে বোঝাতে চেষ্টা করেছি—কিন্তু কেউ বুঝতে চাননি—যাঁরা বুঝতে চেষ্টা করেছেন তাঁরা আর কিছু না পারলেও যে কিছুটা অভিনবত্বের স্বাদ পেয়েছেন সেকথা আমি তাঁদের নিজের মুখেই শুনেছি। এদেশে মুস্কিল হোচ্ছে—বাংলায় বা সাহিত্যে এম. এ. পাস করে—কিংবা কিছু প্রযোজনায় বা অভিনয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে কিছু ব্যক্তি নাট্য-শিক্ষকের খাতায় নিজেদের নামটা বেশ রমরমা করে জাহির করতে চান। কিন্তু অভিনেতা, পরিচালনা বা নিয়মমাফিক পড়ানোর চেয়ে নাট্য-শিক্ষকের দায়িত্ব সম্পর্কে কোনো সহজাতনীতি তাঁরা পোষণ করেন না বলেই নাট্যশিক্ষা এদেশে বিস্তৃত হোতে পারছে না—ভবিষ্যতে এর সফলতা কতোদূর এগুবে সে সম্পর্কে শিক্ষকদের আনাড়িপনা নীতি এবং বর্তমান কর্মপন্থাই আমাদের সজাগ করে দেবে। সে যাই হোক—Production Circle নিয়ে এখন কিছু বলা যাক।

উল্লিখিত কথায় যতটা গাম্ভীর্য আছে—সেবিষয়ে তাৎপর্য বিশ্লেষণ না করেই বলা চলে—একটি যে-কোনো নাটক বা তার ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ অংশকে বিভিন্ন পরিচালকদের মধ্যদিয়ে আংশিকভাবে প্রযোজনা করিয়ে গোটা নাটক-টার প্রযোজনাগত ব্যবহারিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করাই হচ্ছে প্রোডাকশন সারকেল। অর্থাৎ ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দৃশ্য বিভিন্ন পরিচালক কিভাবে তাঁর কারুকৃতি দেখাতে সমর্থ হোচ্ছেন তার বিশিষ্ট প্ল্যানিং, ক্রিয়েটিভিটি ইত্যাদি লক্ষ্য করাই হোচ্ছে এই শিক্ষাক্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারিক।

যে সব শিক্ষার্থী শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত তাদের নিয়েই রচিত হয় কার্যক্রম। কিন্তু কার্যক্রম নির্ধারিত করেন অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীরা সম্মিলিতভাবে। একটা শিক্ষাক্রমের পঁচিশজন শিক্ষার্থী যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই নাটকের বিভিন্ন অংশ অভিনয় করবেন তার কোনো মানে নেই। নির্বাচিত অংশটি এমনভাবে স্থির করা হয় যা গোটা নাট্যবস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

শুনে আশ্চর্য নিশ্চয়ই হবেন না যে আমাকে মোট ২৫টি নাটক ক্লাসের মধ্যে প্রযোজনা করতে হয়েছিল হাতে-কলমে। প্রাচীন গ্রীস থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের বিখ্যাত সব নাট্যকারের নাটক নির্বাচিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য অতীত থেকে আজ পর্যন্ত ঐতিহাসিক বিবর্তনকে ব্যবহারিকভাবে জানা। এই জাতীয় প্রযোজনায় শিক্ষকের ভূমিকা অনেকটা সমালোচকের মতো। আসলে কাজ করবে শিক্ষার্থীরা—গ্রুপ ওয়ার্কের মধ্য দিয়ে।

এই জাতীয় পাঠক্রমের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক দিক আছে। তা হলো—

১। যে-কোনো অংশ প্রযোজনা করতে যাই না কেন তার জন্যে গোটা নাটক পড়তে হবে এবং নাটক সমালোচনা করে যে অংশটুকু প্রযোজনা করা হবে তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে হবে।

২। নাটকটির বিষয়, উপস্থাপনা রীতি, নাট্যকার এবং চরিত্র-চিত্রণ সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে হবে। এই বক্তব্য রাখার বিষয়ে—একসপ্তাহ আগে নির্বাচিত অংশ এবং প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করা যেতে পারে এবং প্রোডাকশন করার সময় কাগজে আমার বক্তব্য লিখেও আনতে পারি।

৩। নাটকের গ্রাউণ্ড প্লান এবং দৃশ্যসজ্জার খুঁটিনাটি এঁকে ছোকে আনতে হবে। বিচার করবেন উপস্থিত সকলে।

৪। পোশাক-পরিচ্ছদ মেকআপ ইত্যাদি বিষয়ে এঁকে বা বিবৃতি লিখে জমা দিতে হবে।

৫। যাঁরা অভিনয় করবেন তাঁরা সকলেই একই পাঠক্রমের ছাত্রছাত্রী —প্রযোজনার সুবিধার জন্যে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকেই অভিনেতা নির্বাচিত করতে হবে এবং তাদের হাতে নির্বাচিত অংশ তুলে দিয়ে কেমনভাবে প্রযোজনা করতে চাই সে সম্পর্কে ধারণা প্রতিটি শিল্পীকে দিতে হবে।

৬। চলাফেরা এবং টোটাল এক্সপোজিশন সম্পর্কে গোড়াতেই ধারণা দিতে হবে।

৭। প্রতিটি চরিত্র সম্পর্কে প্রত্যেককে ওয়াকিবহাল করতে হবে।

৮। যে-কোনো শিল্পী বা শিক্ষক নিজে প্রযোজকের স্বপক্ষে-বিপক্ষে মন্তব্য বা বক্তব্য রাখলে তার যথাযথ উত্তর দিতে হবে।

৯। আলোকসম্পাত ও আবহ-সংগীত সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা শিল্পীদের প্রথমেই দিতে হবে —এমনকি এ বিষয়ে কিছু করার না থাকলেও তাও জানাতে হবে।

১০। শিল্পীরা অভিনয় শুরু করলে—কোনো সময় ইচ্ছামতো বাধা দেওয়া চলবে না। শিল্পীদের দোষ-ত্রুটি যা হচ্ছে তা লিপিবদ্ধ করে কিংবা মনে রেখে নাটকের দেয় গুরুত্বপূর্ণ অংশের কোনো একটা অংশ পছন্দ না হলে আমার ব্যাখ্যাটুকু আমি বোঝানোর অবকাশ পেতে পারি মাত্র। কারণ শিল্পীরা যেমন প্রতিভাবান—পরিচালকও তেমনি সৃষ্টিশীল সত্তা। কাজেই—আমার চিন্তাসংক্রান্ত কোনো ধারণা যাতে শিল্পীদের প্রভাবিত না করে—শিল্পীরা যাতে নিজস্বপথে এগিয়ে যেতে পারেন সেদিকে নজর দেয়া প্রতিটি পরিচালকের কর্তব্য।

১১। পরিচালনা করার সময়—পরিচালক যেন একাডেমিক না হওয়ার প্রশ্রয় পায় নিজে। পরিচালক যেন সমস্ত সৃষ্টিরএ কটি অন্যতম লক্ষ্য বলে মনে হয়—তিনি 'একাডেমিক' না হয়ে 'হিউমান' হলে তাঁর পক্ষে শিল্পীর কাছ থেকে কাজ আদায় করা খুবই সুবিধার হবে। দূরত্ব নয়—কাছে আসার জন্যে যতরকম চেষ্টা—ঠিক ততরকম চেষ্টা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হলে পরিচালক সার্থকভাবে কাজ করতে পারে না।

প্রোডাকশন সারকেলের সময় আমি মিঃ মরিশনের কাছ থেকে বারবার

ব্যাখ্যাপ্রাপ্ত হয়েছে। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছেন—'শিল্পীরা যখন কাজ করছে তখন তাদের বিরক্ত করছো কেন?' আমি সাফ জবাব দিয়েছি—'আমি কখনোই ইংলণ্ডে ট্রেণ্ড আর্টিস্ট নিয়ে নাটক করবো না। আমাকে নাটক যদি করতেই হয় তাহলে করতে হবে আনট্রেণ্ড ভারতীয় শিল্পীদের নিয়ে। সুতরাং আমি এখানকার প্যাটার্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করতে চাই বটে কিন্তু দেশে আমি যেভাবে কাজ করবো বা করতে চাই প্রোডাকশন সারকেলে আমি সেটুকুকেই ব্যক্ত করতে চাইছি। কারণ আমাদের দেশের শিল্পীরা সবাই ট্রেণ্ড নয়। যেদিন সবাইকে একইভাবে পাবো সেদিন তোমার ইচ্ছাকে নিশ্চয়ই কার্যকর করার চেষ্টা করবো। অতএব—তুমি আপাতত আমার বর্তমান কাজে আমাকে বিরক্ত কোরো না। কারণ মাত্র দশ পনের মিনিটের নাটক উপস্থাপনার জন্যে গোটা বিষয়টির স্বপক্ষে দেয়া আছে মাত্র ৪০ মিনিট। অতএব আমার মর্জি অনুযায়ী কাজ করতে দাও।'

হিউজ মরিশন মাথা চুলকে বললেন—ও. কে.—পিকে, গো এহেড।

মনে আছে সবাই মিলে প্রায় ৫০টি নাটকের গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য প্রযোজনা করেছি। ফলে এক জায়গায় বসে বিভিন্ন দেশের পরিচালকরা কি ভাবছেন—নাটক সম্পর্কে, চরিত্র-চিত্রণ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন—কসটিউম দৃশ্যসজ্জা সম্পর্কে কি ভাবছেন তার চাক্ষুস প্রমাণ আমরা হাতে-নাতে পেয়েছি। ফলে বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হচ্ছে—একজায়গায় বসে অনেকের চিন্তাভাবনাকে অল্প সময়ের মধ্যে জানতে পারছি। অর্থাৎ নাটকের শুরুর যুগ থেকে আজপর্যন্ত কতো খুঁটিনাটি বিষয়ে কতো অল্প সময়ে জানা—এটা আমার কাছে অভিনব বলে মনে হয়েছে রীতিমতো। আর প্রযোজনায় ত্রুটি—নোতুন ব্যাখ্যার বিষয়ে নোতুন নোতুন তথ্য ইত্যাদি সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক মশাই ধরিয়ে দিচ্ছেন। ভাবনার অবকাশ পাচ্ছি। একই নাটক অন্যে যখন করছে তখন আমার চিন্তার সঙ্গে অপরের চিন্তা মেলানোর চেষ্টা করছি। সত্যি এ এক অদ্ভুত বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করলুম নিজের দেশে যদি কোনোদিন নাট্য-শিক্ষানিকেতন খুলি তাহলে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো পরিশোধিত-রূপে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবো।

বাংলা নাটক করার কোনো অবকাশ ছিল না বলে, গ্রীসের ইউরিপিদিশ থেকে মার্লো, সেক্সপীয়র, শেকভ, আয়েনেস্কো, ওনীল, ব্রেশট, অসবর্ন ইবসেন সবাইকার বিশিষ্ট নাটকগুলি প্রযোজনা করতে হয়েছিল।

'আউট ডোর ওয়ার্ক' বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে খুঁটিনাটি অনেক বিষয়ে আলোচনা করতে হয়। কিন্তু সম্ভব নয়। কারণ দীর্ঘ। অতএব শুধুমাত্র ধরণা দেয়ার জন্যে যতটুকু বলা কেবল সেইটুকুই বলবো। আর যদি কিছু বলার থাকে তা বলবো অন্যত্র—অন্য কোনোখানে।

বহিঃবিভাগীয় কার্যক্রমে বেশ কয়েকটি বিভাগ রয়েছে। যেমন—

১। বিভিন্ন থিয়েটারে গিয়ে অভিনয় দেখা এবং পরবর্তীকালে কেন্দ্রে এসে সেই নিয়ে একে একে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা

২। মিউজিয়াম স্টাডি

৩। বেতার কেন্দ্র ও টেলিভিশন কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে হাতে-কলমে তালিম নেয়া এবং টেলিভিশনের নেট ওয়ার্ক সম্পর্কে ব্যবহারিক একটা ধারণা পাওয়া

৪। বিভিন্ন থিয়েটারে গিয়ে হাতে-কলমে কাজ করা এবং কোনো নির্দিষ্ট প্রযোজনা দেখে তাকে নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করা

৫। বহিঃবিভাগীয় কার্যক্রমে থিয়েটার শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক এবং শিক্ষকদের সান্নিধ্য লাভ করে তাঁদের চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেদের চিন্তাধারার বিনিময় করা

৬। কঠিন নিয়ম ও শৃংখলাবোধের সঙ্গে কোন্ বিষয়টি শিক্ষাক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয় শুধু চোখে দেখিয়ে মিউজিয়াম ঘুরিয়ে নয় তার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিটির সঙ্গে কোথায় কতোটুকু খাপ খাচ্ছে বা খাওয়া উচিৎ—না খেলে কতোটুকু ফাঁক থেকে যাবে তারজন্যে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রাপ্ত গাইড সবসময় সহযোগিতা করার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

অমুক ব্রাদার্স বা অমুক কোম্পানীকে বলেছিলুম আমার এই নাটক। সুতরাং বেশ বুঝেসুঝে কসটিউম সাপ্লাই করবেন। দর্শক যেহেতু গতানুগতিক চিন্তাধারায় অভ্যস্থ সুতরাং প্রশংসা পাওয়া খুব একটা অস্বাভাবিক বিষয় নয়। কিন্তু কোনো যুগের অর্থনৈতিক, যোগসূত্র এবং সামাজিক তাৎপর্য কি ছিল এবং দৃশ্যসজ্জা, আসবাব, অলংকার এমনকি সাজপোশাকে কি বৈচিত্র্য এসেছিল তা না জেনে ঐতিহাসিক আর সামাজিক এবং যুগবিচার বিশ্লেষণ

না করে একই বস্তু এর ঘাড়ে ওকে ওর ঘাড়ে ওকে চাপিয়ে দিয়ে অহেতুক কেন মামুলি প্রশংসা পাওয়ার চেষ্টা করবো ?

এদেশের বড় বড় পরিচালকরা কি আত্মশক্তির ওপর নির্ভর করেন না ? কোন কোম্পানীর থোড়বড়ি খাড়া আর খাড়াবড়ি থোড়ের ওপর নির্ভর করে প্রযোজনার প্ল্যানিং ঠিক করেন ? আদৌ কোনো প্লানিং করা হয় কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মনে হয়—তা করেন না। অন্ততঃ দুএকজনকে জানি—যাঁরা রীতিমতো লাইব্রেরীর বই ঘেঁটে গাদা গাদা কিতাব হয়ে হয়ে খোঁজেন—মিউজি'যমে গিয়ে রীতিমতো অধ্যয়ন করে তবেই একটা ক্লাসিক প্রযোজনায় অংশ নেন। কিন্তু অধিকাংশ ? ঐ শ্লোগানের মতন—চলছে—চলবে। আন্দোলন করতে গেলে আন্দোলন কথাটা না উপলব্ধি করে শ্লোগানের ঝনঝনানির ওপর আমরা বেশী নির্ভর করি—যার ফলে নিজস্বতা খুইয়ে অপরের অদৃশ্য হাত ন্যায় কণ্ঠস্বর খোঁজার চেষ্টা করি নিজেদের অজান্তে। ওমুক দাদা 'র' চা বা কফি খান শারীরিক কারণে—সুতরাং আমাকে না খেলে চলবে না। আমার দাড়ি আছে প্রথম বয়েস থেকে—ঘড়ি পাল্টানো আমার রীতিমতো একটা হবি। এছাড়া অন্য বিশেষ কোনো হবি নেই। অনেককে বলতে শুনেছি—দাদা আপনি না ঠিক উৎপল দত্তের মতো। আমার জিজ্ঞাসা : কেন ? তার উত্তর : আপনার দাড়ি রয়েছে। বুঝতে কষ্ট হয় না—উৎপলবাবু হয়তো কোনো এক সময়ে দাড়ি রেখেছিলেন—তারপর থেকে ঐ নির্দিষ্ট দাড়ি সম্ভবতঃ তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে তিনিও বোধহয় দাবী করেন না। আমি এক বছরের মধ্যে দুবার দাড়ি কামিয়েছি পিতৃমাতৃ বিয়োগ হেতু—তারপর দাড়ি ঠিকই রয়েছে—কিন্তু সেই দাড়ি উৎপলবাবুর সম্পত্তি হলো কি করে বুঝে উঠতে আজো পারিনি।

যাই হোক, উৎপলবাবুর সিনেমায় অভিনয় আমি দেখেছি। ছেলেবেলায় ওনার ছায়াছবিতে কিছু অভিনয় দেখেছি—সে হিসেবে ওঁনার অভিনয়, বয়েস, অভিজ্ঞতা এবং কর্মকাণ্ডের দিক থেকে আমি যে অনেক স্থূলকায় তা হলফ করে বলতে পারি। ওনার মতাদর্শের সঙ্গে আমার মিল হলো কিনা সে বিষয়ে ভাবার চেয়ে—দাড়ির সঙ্গে মিল আছে কিনা সেটা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করার চেয়ে—তিনি যে শিল্পী এবং ভারতীয় নাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব এ ছাড়া অন্য পরিচয় আমার কাছে বড় নয়।

কথা প্রসংগে কথা বাড়বে—এটাই স্বাভাবিক। এখন ওদেশে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের কথা স্বল্প কথায় অল্প অবকাশের মধ্যে বলে আমার নিজস্ব মতামত কিছু থাকলে তা ব্যক্ত করার চেষ্টা করবো।

প্রথমেই বলে নিই—আমি যে দেশের মানুষ তার অতীত-বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা আমার আছে। সুতরাং ওদেশের শিক্ষকদের বড় করে এদেশের শিক্ষকদের ছোট করবো এ রকম স্পর্ধা আমার মোটেই নেই। এখনো যিনি আমাকে ছেলেবয়েসে জ্ঞানার্জনের প্রথম আলোর সন্ধান দিয়েছিলেন বা আমার চেয়ে বয়েসে বড় এমন কোনো মানুষের সান্নিধ্যে আমি যদি আমার জানার অতিরিক্ত কিছু পেয়ে থাকি তারজন্যে সেই মানুষটির প্রতি আমার মেরুদণ্ড স্বাভাবিকভাবে নিচু হয়ে—আমার হাত তাঁর পায়ের দিকে আপনা হতেই নত হযে—নিজের মাথার নিচে কপালের কাছে উঠে আসে। এ বিদ্যে আমাকে কেউ শেখায়নি। অজানাকে জানার আত্যন্তিক লোভ থেকেই আমি যার কাছে যতটুকু পাই তার জন্যে মাথা নিচু করতে আমার এতটুকু মাথাব্যথা করে না। বরং তাঁদের সম্মান জানালে তাঁদের আশীর্বাদে আমি নিজে যেন অনেক বেশী সম্মানিত হই।

ওদেশে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে কোনো গুরুগম্ভীর সম্পর্ক আমার চোখে পড়েনি। কে ছাত্র আর কে শিক্ষক তা বোঝা বড় মুস্কিল। শিক্ষক কোনো নিশানাজাত গুরুগম্ভীর পোশাক পরেন না—মোটা ফ্রেমের চশমা পরে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের বিদ্যে গেলানোর কোনো মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন না। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটা বন্ধুর মতো। শিক্ষককে বোঝা যায় তিনি যে বিষয়ে পড়াচ্ছেন বা হাতে-কলমে কাজ করাচ্ছেন সেই বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং অতিরিক্ত জ্ঞানের মহিমায়।

ছাত্রকে পুঁথিগত বিদ্যা হাঁ করা মুখে গিলিয়ে খাওয়ানোর চেয়ে ছাত্র কিভাবে কতোটুকু খেলে হজম হবে সেদিকে শিক্ষকরা দৃষ্টি দেন বেশী। পড়ানোর চেয়ে কিভাবে নিজে আরো বেশী পড়াশোনায় আত্মনিয়োগ করা যেতে পারে—সে সম্পর্কে ধারণা দেয়াই মূল উদ্দেশ্য। ছাত্র শিক্ষককে কতোটা জ্ঞানী ভাবলো এটা কখনোই বিবেচনার বিষয় হতে পারে না। ছাত্রের অসুবিধা কোন্ দিক থেকে কোন্ বিষয়ের ওপর কতোটা হচ্ছে তাকে বুঝে নিয়ে কোন্ পথে বিশ্লেষণ করলে ছাত্র মূল বিষয়টা বুঝতে পারবে সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন বিশেষভাবে। আসলে ছাত্র কাজ করবে—শিক্ষক তার পাশে

ব্যাক্তরে বন্ধুর মতো বন্ধুর পথ থেকে সহজ পথের নিশানা দেখাবেন। ছাত্রশিক্ষকের এই যে বন্ধুভাবাপন্ন দৃষ্টিভঙ্গি—এটুকু আমার খুবই ভালো লেগেছে। যে-কোনো বিষয় আলোচনা হোক না কেন—সে বিষয়ে শিক্ষকরা একটু বক্তব্য রেখে বা কাজ করে বলে বসেন—any question ? এদেশে বস্তুকে জটিল এবং অবোধ্য করা এবং ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের দূরত্ব বজায় রাখার একটা ব্যাপার আছে—পণ্ডিতির চেয়ে পাণ্ডিত্যের জাহির করার ব্যাপারটা যেন এদেশের শিক্ষকদের মজ্জাগত স্বভাব। অন্য বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে হয়তো এটা স্বাভাবিক হতে পারে। কিন্তু নাট্য-শিক্ষার বিষয়ে তা স্বাভাবিক হবে—আমি তা কিছুতেই মানতে পারি না। এখানে সম্পর্কটা নিকট না হলে—দূর থাকলে প্রযোজনার ক্ষেত্রে যে তা এলোমেলো হতে পারে এ ধারণা করা কি খুবই অনুচিত হবে ?

নীতিগতভাবে এ দেশে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বন্ধুর মতো হলে অনেক অসুবিধাও আছে। অন্য শাস্ত্রের কথা বাদ দিয়ে নাট্যশাস্ত্রের পঠনপাঠনের বিষয়ে বন্ধুত্ব বজায় রাখার বিষয় নিয়ে একটু যদি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যায় তাহলে কেমন হয় ?

বন্ধুত্ব অর্থে—উচ্ছৃঙ্খলতার কথা বলতে চাই না। সহমর্মিতা। তথাপি অবুঝকে শায়েস্তা করার জন্যে সহমর্মিতা যদি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তখন দুর্দমতার প্রশ্রয় নেয়ার কথা ভাবা যেতে পারে। যিনি সাধারণভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে নাটকের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে নাটক শেখাতে আসবেন বা জানতে আসবেন তাকে যে জুতো খেয়ে—গালিগালাজ খেয়ে শিক্ষা নিতে হবে এযুক্তি ব্যক্তিভেদে রকমফের হতে পারে। তবে হ্যাঁ—নিয়মনিষ্ঠা ভঙ্গকারীকে জুতো কেন—নাটকের ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ডের আদেশ বলবত থাকলেও তাকে কার্যকর করতে কোনো বাধা আসা উচিৎ নয়।

কিন্তু যিনি স্ব-ইচ্ছায় আরোপিত দাম্ভিকতার খোলস খুলে নাটকের জন্যে কাজ করতে আসবেন তিনি তো নিয়মনিষ্ঠা সঙ্গে নিয়ে তবেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষকের কাছে আসবেন—এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং গালিগালাজ, লাথি জুতোর প্রশ্ন কেন ?

আমরা যখন প্রোডাকশন সারকেলের কাজ করি—তার আগে ভাগে অন্ততঃ এক হপ্তা আগে—নির্দিষ্ট বই, এবং কোন দৃশ্যটুকু আমাকে করতে হবে তা বলে দেওয়া হয়। ফলে কাজ করতে হয় সপ্তাহ ধরে। বাড়ী বা হোটেলে

ফিরে টিভি লাউঞ্জে বসে বা বারে গিয়ে মদ্যপান করার কোনো অবকাশ থাকতো না। সারাদিন ক্লাসে কাজ। বাকী সময়ের অধিকাংশ সময় প্রোডাকশন সার্কেলের জন্যে ঘরে বসে কাজ করতে হতো। বিভিন্ন রেফারেন্স বই ঘাঁটতে হতো। গ্রাউণ্ড প্ল্যান এমন কি গোটা নাট্য-বিষয়ে ভাবনাকে সুচিন্তিত এবং মনোজ্ঞভাবে দাখিল করার কাজ সেরে—কাজের চূড়ান্ত ফলাফল জানানোর জন্যই ক্লাসে যেতে হতো—লিপিবদ্ধ কাগজ ও প্ল্যান হাতে নিয়ে।

অনেকটা আগে স্তানলিস্লাভস্কির মেথড সম্পর্কে পশ্চিমীদেশে যে অনীহার দেখার ইংগীতের কথা উল্লেখ করেছি—ইম্প্রোভাইজেশন শাস্ত্র দিয়ে ঐ রীতি বা প্রচেষ্টাকে আরো স্বল্প সময়ের এবং ব্যবহারিক করে তোলার বিষয়টি স্পষ্টভাবে এখানে প্রযুক্ত। বেশ খানিক জায়গায় স্তানলিস্লাভস্কির সঙ্গে এর প্রকৃতিগত অনেক মিল আছে। সে থাকুক। সে নিয়ে তর্ক না করে—কাজটা যদি ভালো লাগে বা ভালো হয় তা হলেই ভালো। কাজটা যদি সত্যি কাজের হয় তা হলে আরো ভালো।

আসলে যে শিক্ষক বিষয়গুলির ওপর শিক্ষা দেবেন তিনি এই জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে কতোখানি জ্ঞানার্জন করেছেন বা জানেন সেটুকু না জেনে ছাত্রদের নিয়ে কাজ করতে গেলে পণ্ডশ্রম হবে। ছাত্ররা যেমন মানসিক, শারীরিক এবং একটা বেসিক স্টাণ্ডার্ড নিয়ে শিক্ষাকেন্দ্রে আসবেন—শিক্ষককেও শিক্ষাদানের সেই বেসিক স্টাণ্ডার্ড সম্পর্কে অবহিত হতে হয়। কিন্তু এদেশে কতোজন ভালো প্রশিক্ষক আছেন? লক্ষ লক্ষ ছেলে কাজের চেয়ে ডিগ্রির প্রত্যাশায় ঘুরছে পথে পথে —ডিগ্রি পাবার পর চাকরী—যে-কোনো চাকরী—পেটটাকে চালাতে হবে তো! নাট্য-শিক্ষা এখনো সার্বিকভাবে সরকার কর্তৃক মনোনীত নয়। এই শিক্ষায় অনুপ্রবেশ করার সময় ছাত্রদের পক্ষে হতাশার অনেক কারণ আছে। কারণ —এই শিক্ষা শেষে এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করার সুযোগ কম। তারপর শিক্ষাকেন্দ্রে এসে ছাত্র-শিক্ষক দূরে বসবে—বক্তৃতা করবে আর পাঁচটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেমন শিক্ষা দেয়া হয় ঠিক তেমনিভাবে। তা হবে কেন? নাট্য-শিক্ষা আর সাধারণ শিক্ষা এক জিনিস নাকি?

এদেশের মাটিতে একটা নরম আকর্ষণ আছে—আর সেইজন্যে সময়ে সময়ে ক্রোধ হিংসা একই মাটির ওপর যে কী ভীষণভাবে গরম হয়ে ওঠে তার প্রমাণ অহরহ পাচ্ছি। বিচিত্র-বিরাট মানুষ, বিরাট প্রকৃতি, নানারকম বৈচিত্র্যময় সংস্কার, লোকাচার যেখানে রয়েছে—সেখানে নাট্যশিক্ষার জন্যে

চার দেয়ালে ঘেরা—অনেকটা খাঁচার মধ্যে বসে পুঁথি গেলার মতো কাজ করলে এই শিক্ষার বিশেষ সম্প্রসারণ ঘটবে বলে মনে হয় না।

তাই Human এবং Nature Study-র জন্যে পথে-ঘাটে গ্রামে-গঞ্জে বেরিয়ে পড়তে হবে সম্মিলিতভাবে। মানুষ প্রকৃতিকে বুঝে তার সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী কেন শহুরে জনমতার বাইরে স্থাপন করলেন ?

নাটকের ছাত্র-শিক্ষকরা পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করার রেয়াজ তো এদেশে দেখি। কারণ হয়তো অনেক। ছাত্রবা কেউ শিশু নয়। যারা পডতে আসছে তারা কিছু কাজ করতে চায়—ভালো নোতুন কিছু পেতে চায়। কিন্তু শুধু মঙ্গলকাব্য আর মানধাতার আমলের নোট দেয়ার প্রথা ছাত্রবা মানবে কেন ? থিয়েটার আজ Non-verbal Communicative Art. এই শিক্ষাব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দৃশ্যমান কি কি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে—আধুনিক নাট্য-শিক্ষায় কতোটা অগ্রগতি হয়েছে এবং তাকে প্রয়োগগতভাবে কতোটুকু ছাত্রদের দিয়ে তাদের নিজস্ব চলার পথকে শক্ত করতে পারছি সেটুকু না ভাবতে পারলে ছাত্র অশান্তি শিক্ষকদের ফেস করতেই হবে। ছাত্রও তাদেব কথা খুব একটা নোতুন করে বলতে পারবে না। শিক্ষকরা থেমে থেমে দোষ দেবেন। তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কি ? ডিফারেন্স অব ওপিনিয়ন হবে না ? কেন হবে না। যে-কোনো কাজ করতে গেলেই তা হয। কিন্তু ডিফারেন্স অব ওপিনিয়নকে মেনে নিয়ে নির্ধারিত কার্যক্রম কেন বন্ধ করা হবে ? কাজ চলতে চলতে নোতুন ভাবনা আসবে—আসবে নোতুন ওপিনিয়ন। কিন্তু কাজ থামবে কেন ?

ইংলণ্ডে কাজ করার সময় আমার সঙ্গে অনেক বিষয়ে অনেক মতবিরোধ হয়েছে কিন্তু কাজকে উপেক্ষা কবে নয়।

এই শিক্ষাক্রমে অনুপ্রবেশ করাব সময় কি শিক্ষক কি ছাত্র কাউকে কোনো বিষয়ে একগুঁয়ে হতে গেলে চলে না।

লণ্ডনের ব্রিটিশ ড্রামা লীগে 'নাট্যশিক্ষণে' সম্ভবতঃ আমি প্রথম অভিজ্ঞান পত্র পেলুম ভারতীয়দেব মধ্যে। এবপর কাজ করতে যেতে হলো স্কটল্যাণ্ডে নিউক্যাসল ইউনিভার্সিটির টাইনি সাইড থিয়েটারে। সারা পৃথিবীজোড়া অনেক বন্ধুদের হারিয়ে স্কটল্যাণ্ডের পথ ধবলুম। ওখানে গাডী লেট হয় না। সব সময় advance আর advance পৌছুলে তার জন্যে বাসট্যাণ্ড সংরক্ষিত স্থান, খাবার, শৌচাগার, বিশ্রামাগার ইত্যাদি সব রকমের ব্যবস্থা আছে।

বাস বা মোটর ১২০ কিলোমিটারের কম স্পীডে চলবে এ কথাতো ভাবাই যায় না।

সে যাক। এবার টাইনি সাইডে এসে কি কাজ করলুম তাই বলি। এখানে এসে প্রথমেই প্রেক্ষাগৃহের অভিনবত্ব দেখে শুরু হয়েছি। এঁরা প্রসিনিয়াম ভেঙে দিয়েছেন। এ্যাকটিং এরিয়া দর্শকের সন্নিকটে নিয়ে এসেছেন। ডানদিক, বাঁদিক, পেছনে এবং উঁচুতে বিভিন্ন স্থানে, অভিনয়ের জায়গা স্থির করেছেন। তবে সর্বত্র শিল্পীরা যাতে যাতায়াত করতে পারে তার সুব্যবস্থা আছে। আলোকসম্পাতের জন্যে যেমন বিভিন্ন কোণ থেকে আলো ফেলার ব্যবস্থা, ঠিক তেমনি 'লাইটিং বার' রেয়েছে দর্শকের মাথার ওপর। ঐ বারে প্রায় ২০০টি স্পট লাইট বিভিন্ন ভাবে রয়েছে—কনট্রোল বোর্ড ইত্যাদি সবকিছুই রয়েছে। একজনমাত্র কিউ সিট নিয়ে বসে সেই বারকে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যেতে পারবেন এবং আলোকসম্পাতের কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারবেন।

টাইনিসাইড থিয়েটারে যে কর্মযজ্ঞের সঙ্গে আমি যুক্ত হয়েছিলুম—তাঁর প্রধান ছিলেন অধ্যাপক মুর্গান। এখানে গ্রীষ্মাবকাশ পালনের জন্যে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় শ দেড়েক ছেলেমেয়ে এসেছে নাটক নিয়ে কাজ করার জন্যে। বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েরা কাজ করছে। এক কথায়—বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটারের চত্বরে রীতিমতো নাট্য-মেলা বসে গেছে। বারো বছর বয়স পর্যন্ত একটা গ্রুপ। ১৮ বছর পর্যন্ত আর একটা গ্রুপ এবং ১৮ বছরের পর আর একটা গ্রুপ। আসলে ভিন্ন বয়সের ছেলেমে৻ দর নিয়ে প্রায় ১২টি গ্রুপ কাজ করছিল একই চত্বরে।

নাটক লেখা থেকে শুরু করে রঙ তুলি নিয়ে সেট তৈরি করার ভিন্ন বয়সের অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ ডিজাইনাররা বসে গেছে নিজেদের কাজে। তাদের সহযোগিতা করছেন—পাকাপোক্ত পুরোসময়ের ডিজাইনাররা।

নাটক লেখা মহলা, আলোক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সব কাজ করছে সবাই বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে।

অভিনয় আসর বসার নির্ধারিত সময় সূচি আছে। সেই অনুযায়ী বিকেল থেকে প্রতিদিন ভালোমন্দ মিশিয়ে ছোট বড় নানা ধরনের মঞ্চাভিনয়ের পরীক্ষানিরীক্ষা চলে। তালিম দিচ্ছেন গ্রুপ ভাগ করে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রতিভাবান শিক্ষিত শিল্পীরা। এদের সবার ওপরে একজন আছেন—

তিনি হচ্ছেন ডিরেক্টর মিঃ মুর্গান। তিনি খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়ে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখছেন। শৃংখলা অটুট—নিষ্ঠা অনুচ্চারিত। কাজ—কাজ—কাজ। আমার কর্মসীমা এক্ষেত্রে নির্ধারিত ছিল না। কাজেই আগে ডিরেক্টরের সঙ্গে আমাকে আলোচনায় বসতে হলো। তিনি জানতে চাইলেন—আমি কোন্ বিষয়টা জানতে বিশেষভাবে আগ্রহী। আমি এক কথায় আমার জবাব রাখতে পারিনি। শেষে বললুম—আমি পনের দিন পনেরটা গ্রুপে ঘুরে ঘুরে কাজ করে দেখবো এবং ভাববো—পরামর্শ করবো। ডিরেক্টর সাহেব রাজি হলেন। আমার কাজ মূলতঃ অধ্যাপক মুর্গানের নেতৃত্বেই ছিল। কিন্তু সমস্ত বিষয়টা জানার স্বাধীনতা আমি পেয়েছিলুম। কোনো সমস্যা দেখা দিলে তিনি আমাকে যথাযথভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেন। সবশেষে —আমি বিরাট এই কর্মযজ্ঞের প্রয়োজনীয়তার কথা জানতে চাইলুম।

মুর্গান সাহেব জবাব দিলেন—এর প্রয়োজন দু'টি, একটি স্রেফ এক্সপেরিমেণ্ট আর অন্যটি ভবিষ্যৎ কর্মনির্ধারণ তথা ট্যালেণ্ট ফাইণ্ডিং।

প্রশ্ন : এই ধরনের রিপ্রেটরী কোর্সে কি কোনো সার্থক কাজ হয় ?

: কেন হবে না। না হলে এত ছেলেমেয়ে এক জায়গায় জড় হয়ে এত কাজ করছে কেন ?

: এ ধরনের কোর্সের কি কোনো রেকগনাইজেশন আছে ?

: আর্ট বা আর্টিস্ট কোন রেকগনাইজেশনের অপেক্ষা রাখে না। এই আয়োজনের মধ্যে—যেমন শিল্পী সৃষ্টিশীল মানসিকতাকে যাচাই করতে পারে তেমনি এই ধরনের শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে অসংখ্য শিক্ষিত নাট্যপিপাসুদের মধ্যে আগামী দিনের কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন করা যায়। বলা যায় না তো—কার মধ্যে কে কোথায় লুকিয়ে আছে। আর কাউকে আবিষ্কার করতে গেলে কিছু-না-কিছু কাজ করতে হয়। আমি জানি না—এ ধরনের কোনো শিক্ষাক্রম তোমার দেশে আছে কি না।

: আমাদের দেশটি আয়তনে যে-কোনো দেশের চেয়ে বড়, জনসংখ্যা আরো বেশী বড়। কাজেই কোথায় কতোটুকু কাজ হচ্ছে তা এই মুহূর্তে বলতে পারিনে—এছাড়া—একই দেশে অনেক সংস্কৃতি—অনেক ভাষা—কাজেই আমাদের দেশ আমার কাছেই এক পরম বিস্ময়।

উনি আমার কথা শুনে আগ্রহ সহকারে অনেক কিছু জানতে চাইলেন। আমিও বললুম প্রাণখুলে। তবে যা বলেছি—তা সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-

সূত্রে আমার অভিজ্ঞতাজাত কিছু কথাকেই। দৈন্যতার কথা জানতে চাননি তিনি। তাই আমার পক্ষে কোনো কিছু বলাও সম্ভব হয়নি।

এবার শেষ করি। বিদেশে অভিনয় শিক্ষার ক্ষেত্রে আমার যা ভালো লেগেছে তা অল্প কথায় ব্যক্ত করে।

প্রথমত: সকলেই নিষ্ঠাবান—শৃংখলাবোধে অবিচল।

দ্বিতীয়ত: সকলেই কাজ করায় আগ্রহী।

তৃতীয়ত: পারস্পরিক বোঝাপড়া করে কাজ করার নিজস্ব চেষ্টা।

চতুর্থত: সবাই কাজ করে।

পঞ্চমত: কাজের ভান বা মিথ্যার আশ্রয় কাউকে নিতে দেখিনি।

ষষ্ঠত: সকলে পড়াশোনা করে।

সপ্তমত: নোতুন সৃষ্টির নেশা।

অষ্টমত: থিয়েটার আর কাজ একাকার হয়ে মিশে গেছে।

নবমত. টেকনিক্যাল এডভান্সমেণ্ট।

দশমত: সরকার উজাড় করে পয়সা দিচ্ছে থিয়েটার উন্নতির জন্য।

যা ভালো লাগেনি তা হলো:

১। মেকানিক্যাল এ্যকটিং।

২। নিয়মমাফিক কাজ করা—মেশিনের মতো।

৩। পুরানো—ক্লাসিক্যাল বিষয়কে আধুনিক ফর্মে এনে সম্পূর্ণ ওলোট পালোট করার ঐকান্তিক নিষ্ঠা।

৪। একাংক নাটকের নিঃস্তব্ধ অস্তিত্ব।

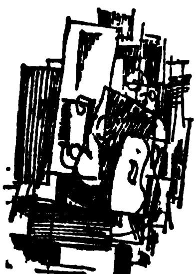
৫। অত্যধিক স্বাবলম্বন শক্তি।

৬। সব কাজেই—আগে পয়সার হিসেব।

৭। কারচুপিহীন উলংগতার প্রকাশ।

দোহাই আমার মতের সঙ্গে কোনো অমিল হলে নিজেরাই কাটাকুটি করে ক্ষমা-ঘেন্না করে নিন। কারণ—যা বললুম—সবই আমার অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। ব্যক্তিগতভাবে আমি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ১৫০টি নাটকের অভিনয় দেখেছি। 'হেথার' থেকে 'ও ক্যালক্যাটা'—'পিগমিলিয়ান' থেকে 'মাউ-সট্রাপ' 'ক্লিওপেত্রা'থেকে 'রিচার্ড দি সেকেণ্ড'আর 'ঐদিপাউস' থেকে 'ওয়েটিং ফর গোডো' পর্যন্ত। বিমুগ্ধ হয়েছি টেকনিক্যাল বিষয় দেখে—হতাশ হয়েছিছকে বাঁধা গভীর আর গম্ভীর অভিনয়ে অগভীর আত্মউপলব্ধির আত্মপ্রকাশ দেখে।

তবুও তারই থেকে লাভ হয়েছে অনেক—অনেক অজানাকে চাক্ষুষভাবে দেখে। লাভ হয়েছে, দেশে ফিরে কি করবো—সে সম্পর্কে নোতুন ভাবে চিন্তা-ভাবনা করার একটা সূত্র খুঁজে বের করার। স্বজন-প্রিয়জন হারিয়ে বেশ কয়েক-মাস নোতুন অনেক বিদেশী বাবুদের খুব কাছে এসে পড়েছিলুম। কাজের মধ্যে সবাই কেমন আপন হয়ে উঠেছিলুম থিয়েটারের সূত্রে। কিন্তু কাজের বাইরে যখন এখনো নাটকের শিক্ষা আর নাটক নিয়ে চিন্তা করি তখন পবিচিত অপবিচিত অনেক দূর দেশের সেই চুয়াত্তরের বন্ধু-বান্ধবীদের কথা মনে পড়ে। কাজের চাপে তাদের ভুলে গেলেও—একান্ত ব্যক্তিগত অবকাশে অতীতেব এক সঙ্গে কাজকরার স্বপ্নময় স্মৃতিগুলো মনে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন আরো কাজ চাই—আরো কাজ কবি—কাজ কবি আমাদেব দেশেব সব অহেলিত-অপরিচিত নাট্য-প্রেমিকদের জন্য। কিন্তু সুযোগ? তার জন্যে অর্থহীন অলস ভাবালুতার আশ্রয় করে কতোটুকু কাজ কবা যায়? তবুও চেষ্টা করছি—দেখা যাক কি হয়।



FROM THE PAINTINGS OF GEORGES BRAQUE

প্রসংগ ঃ ব্যবহারিক কিছু অনুশীলনী

১৫

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। খুলে দিলুম।

—কি চাই?

—আপনাকে।

—অস্থন। বস্থন। বলুন কি দরকার।

—অভিনয় বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল।

—বলুন।

—একটু বুঝিয়ে দেবেন?

—আপনি কে? অর্থাৎ আপনার নাম?

—সঞ্জীব চৌধুরী।

—কি করেন?

—নাটক।

—আর কিছু?

—চাকরী খুঁজছি।

—পেয়েছেন?

—খুব শিগ্গির একটা পাবার সম্ভাবনা আছে।

—বাড়ীতে কে কে আছেন?

—মা বাবা ভাই বোন সবাই।

—কতোজন?

—বাবা মা ছাড়া আমাকে নিয়ে ভাই বোন মোট আটজন।

—আপনি ?

—বড়।

—বয়েস ?

—আঠাশে পড়েছি।

—শিক্ষা ?

—গ্রাজুয়েট্। কমার্শ—অনার্স নেই। তবে পারসেণ্টেজ ভালো, ফিফটির ওপর।

—সংসার চলে কি করে ?

—বাবা চালায়—আমিও দু' একটা টিউশনি করি।

—তবে যে বললেন নাটক করি।

—ওটা তো হবি।

—বোন কটি ?

—তিনটি।

—সবাই ছোট বুঝি ?

—না না। দু জনের কুড়ি পেরিয়ে গেছে—পাত্র পাচ্ছি না।

—জীবনের উদ্দেশ্য ?

—চাকরী পাওয়া।

—দায়িত্ব ?

—সকলের প্রতি কিছু কর্তব্য করা।

—চরিত্রের অন্যান্য কিছু বৈশিষ্ট্য ?

—নিজে জানি না।

—থাকেন কোথায় ?

—ট্যাংরা।

—প্রেম প্রীতি সামাজিক অবস্থার প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি ?

—কি বললেন স্যার ?

—আপনার চরিত্রের আচার-আচরণ এবং সামাজিক প্রতিবেশের কথা জানতে চাইচি।

—নাটক করতে এসে এসব ব্যক্তিগত প্রশ্ন কেন করছেন ?

—আপনি এতক্ষণ যে কথা বললেন সে সব কথা কার ?

—কেন আমার নিজের।

—দুর মশাই। আমি প্রশ্ন করছি আপনি যে চরিত্রে অভিনয় করবেন সেই চরিত্রের বিষয়ে।

হয়তো ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন। কিন্তু আপনি কি করবেন?

জবাব আপনি দিন। এটাই আমার প্রথম প্রশ্ন। অর্থাৎ, অনুশীলনী : ১

অনুশীলনী : ২

মাথায় কোন ঝামেলা বা দুশ্চিন্তা নেই তো? যদি ক্লান্তি বোধ করেন তা হলে একটু বিশ্রাম নিন। যে কোনো কাজ করার আগে আপনি যেমন সুষ্ঠুভাবে মানসিক প্রস্তুতি নেন—ঠিক সেইভাবে কোনো একটা কিছু করতে যাচ্ছেন, এমনটি যদি কোনো পরিস্থিতির উদ্ভাবন হয় তা হলে—concentration অর্থাৎ কিছু করার জন্যে স্থির হয়ে মনোযোগ দিন। যা করবেন তা তো দেহের মধ্য দিয়েই। সুতরাং ধরে নিন মনোযোগের স্থান আপনার গোটা দেহটা।

ওকি পা দোলাচ্ছেন কেন? অযথা নিজের হাতের আঙুল মটকাচ্ছেন যে? আমি মনোযোগ অভ্যাস করতে বলছি। হাতের সামনে ম্যাগাজিনটা টেনে ওলটাচ্ছেন কেন? ওটা রাখুন। এ আচ্ছাই মুস্কিলে পড়া গেল তো। দেশলাইয়ের বাক্সটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন যে। ও বাবা—এরই মধ্যে হাই তুলে নিলেন!

দুপাটি দাঁত খুলে এক ঝলক হেসে নিলেন দেখতে পাচ্ছি। ওটা কি?

—মানে?

—আমেজ?

—ঠিক হয়ে যাবে। বলুন এখন কি করবো।

—সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন।

—আমার অন্যায় হয়েছে।

—কেন?

—এ সব করা উচিৎ নয়।

—কোন্ সব?

এই যে ম্যানারিজিম।

—জানেন তো সবই। কিন্তু বদ অভ্যাসগুলো খাতায় না করে এগুলো ত্যাগ করতে পারেন না?

—চেষ্টা করি। তাছাড়া আপনা হতেই হয়ে যায়।

—না হবে না। ওদের থামাতে হবে। এমনিতে না হলে শাসন করে থামাতে হবে। ওটা কি করলেন?

—চুলগুলোর ভাঁজ এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল তাই চিরুনী দিয়ে—

—অসম্ভব। আপনি আপনার দেহ মনকে নিজের আয়ত্তে রাখতে পারেন না—অভিনয় করবেন কি করে?

—মুড নেই—রিহার্সালে ঠিক করে নেব।

—বেরিয়ে যান। উঠুন—কি হলো বসে আছেন কেন—বেরিয়ে যান।

—ক্ষমা করুন।

—ঠিক আছে—দু'মিনিট সময় দিচ্ছি। নীরবে ভেবে নিন। একটু পরে একটা কাল্পনিক কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে নিজে খান এবং তারপর কুঁজোর ওপর গ্লাসটা রেখে দিন।

দু'মিনিট পর আমার কথামতো আপনি কাজ করলেন। আবার জিজ্ঞাসা করছেন—

—ভালো হয়নি?

—এর উত্তর আমি দেবো না। আপনার কাজ করার সঙ্গে আমার কয়েকটি প্রশ্ন আপনি মিলিয়ে নিন। প্রয়োজনে যদি বোঝেন আমার প্রশ্নের সব কটি শর্ত আপনি পালন করতে পেরেছেন যথাযথভাবে তাহলে বলবো ভালোই হয়েছে। তা না হলে আবার অভ্যাস করুন।

প্রশ্ন: ১. কুঁজোটা কতো বড় ২. কুঁজোতে কতোটা জল আছে ৩. কুঁজোর আকারটা কেমন ৪. গ্লাসটা কোথায় ছিল ৫. গ্লাসটার সাইজ কতোটা ৬. কুঁজো থেকে গ্লাসে যে জল ঢাললেন তা কতোটা পরিমাণ? ৭. কুঁজোর উচ্চতা ৮. কুঁজোটা কোথায় ছিল ৯. কুঁজোর কোন্ জায়গাটা কোন্ হাতে ধরে গ্লাসে জল ঢাললেন এবং গ্লাসটাই বা কোন্ হাতে ছিল এবং তার কতোটুকু ঘনত্ব ছিল। ১০. হালকা গ্লাসে জল ঢালার পর ভারী গ্লাস নিয়ে হাতের গতিপ্রকৃতি কি বদলেছে ১১. গ্লাসে জল নিয়ে মুখের সঙ্গে গ্লাসের বা মুখের দূরত্ব কি ঠিক ছিল ১২. জল এক চুমুকে খেলেন না পরিমাণ অনুযায়ী পরিমিতিবোধ বজায় রেখে ক্রমান্বয়ে জল পান করলেন ১৩. গ্লাসটা

কোথায় রাখলেন। ১৫: কুঁজো যেখানে আছে অর্থাৎ জল যেখান থেকে নিয়েছেন ঠিক সেই জায়গায় গ্লাসটার একই উচ্চতা, পরিমিতি, কোণ এবং ওজন মাফিক রেখেছেন তো?

অনুশীলনী : ৩

একটি গোলাকৃতি প্লেটে রুটি মাংস খান।

কুয়ো থেকে দড়ি ঝুলিয়ে বালতি দিয়ে জল তুলুন।

ঘুঁড়ি ওড়ানোর বিষয় নিয়ে আগে একটা সুন্দর নাটকীয় গল্প বেঁধে নিন মনে মনে। তারপর একলা সেই গল্পকে সংলাপহীন অবস্থায় মনোরম করে ফুটিয়ে তুলুন আপনার শরীর যন্ত্র দিয়ে। আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে গল্প প্রকাশ করার পর যা করলেন নিজে নিজে তার হিসেব করুন। প্রয়োজনে পরে যখন আবার একই রকমের অভ্যাস করবেন তার পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবে পরপর প্রতিটি Action লিপিবদ্ধ করে রাখুন। Action করার পর লেখার সঙ্গে সবটুকু মিলিয়ে নিন।

অনুশীলনী : ৪

শুয়ে পড়ে কোমরের ওপর ভর দিয়ে দু'পা নিয়ে সাইকেল চালানোর মতো অভ্যাস করুন। পা মাথার দিকে আনুন। সোজা হয়ে দু' পা ফাঁক করুন বিস্তৃতভাবে।

শুয়ে হাত এবং পাকে যতটা সম্ভব হালকা হয়ে—দীর্ঘ করার চেষ্টা করুন নমনীয়ভাবে। মনে করুন নিজের কোনো ওজন নেই।

শোয়া অবস্থায় হাতের সাহায্য না নিয়ে উঠে বসুন। তারপর শুধু দেহকে নিজের আয়ত্তে রেখে দু'পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ান। হাত তুলুন। পা ওঠান এবং লম্বা হবার চেষ্টা করুন।

অনুশীলনী : ৫

দুপায়ে স্বচ্ছন্দে শরীর না হেলিয়ে দুলিয়ে যতক্ষণ পারেন দাঁড়িয়ে থাকুন।

একপায়ে ভর দিয়ে অনুরূপ অভ্যাস করুন—ক্রমে দেহকে কাত করে বা সামনে পেছনে আনুন।

একপায়ের গোড়ালী ক্লান্ত হলে শুধু আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকুন।

পরবর্তী সময়ে পা বদল করে একই রকমের অভ্যাস করুন।

এরপর এক পায়ে ভর দিয়ে দেহকে পায়ের দিকে এবং বিপরীত দিকে যতটা সম্ভব হেলানোর চেষ্টা করুন।

সামনে পিছনে আসুন অনুরূপভাবে।

গোড়ালীর ওপর ভর দিয়ে সমস্ত দেহটা একপাক ঘুরিয়ে ঠিক সেই জায়গায় ফিরিয়ে আসুন।

একপায়ে ভর দিয়ে অন্য পা প্রথমে সামনে—পরে পেছনে নিয়ে যান এবং শেষে দেহটাকে কনুইয়ের ওপর স্থাপন করে দুহাত ছড়িয়ে ওপর নিচে ওঠান এবং নামান।

অনুশীলনী : ৬

দুহাত আড়াআড়িভাবে মাথার ওপর তুলে রাখুন দীর্ঘ সময়।

হাতের প্রতিটি অংশ পুতুল নাচে যেমন দেখা যায়—বুদ্ধি খাটিয়ে তেমনি-ভাবে হাতকে বিভিন্ন দিকে ছড়ান—গোটান—ওঠান এবং নামান।

দুহাত ঘুরন্ত চাকতির মতো সামনে এবং পাশে নিয়ে গিয়ে ঘোরান। ক্রমে ধীর থেকে দ্রুত লয়ে।

দেহ থেকে হাতকে বিচ্ছিন্ন ভাবার চেষ্টা করুন। তারপর কারোর সাহায্য নিয়ে হাত তুলতে বলুন এবং সহযোগী সতীর্থ আপন শক্তিমতো হাত তুলে ছেড়ে দেবেন। হাত মৃত মানুষের মতো—অনেকটা জড় পদার্থের মতো হয়ে মনে হবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যেন গ্রাস করছে।

ঘুষী পাকিয়ে প্রথমে শূন্যে—পরে দেয়ালের ওপর প্রচণ্ড আঘাত করুন। (দোহাই আঘাত করবেন কিন্তু হাতের মুঠো যেন দেয়াল স্পর্শ না করে)

হাতের আঙুলকে নমনীয় এবং সক্রিয় করার জন্য নিজে নিজে সম্ভাব্য অভ্যাস সম্পর্কে প্রস্তুতি নিন। শক্ত করুন—কাঁপান—স্বাভাবিক করুন।

অনুশীলনী : ৭

শরীর এক জায়গায় রেখে মুখের থুতনী সামনের দিকে এনে বুক পর্যন্ত স্পর্শ করুন। পরে কাঁধ এবং মুখকে যতটা সম্ভব মাথার পেছনের অংশ—পিঠের দিকে স্থাপন করুন।

এরপর কাঁধ ঘাড়কে ডান থেকে সোজা এবং বাঁদিকে আনুন।

কাঁধকে সামনের দিকে নিচু করে বাঁ দিক পেছন হয়ে ডান দিক পর্যন্ত অনবরত ঘোরান।

দেহ ঠিক রেখে কাঁধ এবং গলা ঘুরিয়ে বিভিন্ন দিকে দ্রুত কোনো এক কাল্পনিক বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

অনুশীলনী : ৮

দেহকে শুয়ে স্বাভাবিকভাবে গড়ান—ঠিক যেন মনে হবে একটি গোলাকার বস্তুকে কেউ ঠেলে দিল।

পা ফাঁক করুন, যতটা সম্ভব—আর সেই ফাঁক অংশটুকুর মধ্যে সমস্ত দেহটা প্রবেশ করান এবং সেই অবস্থায় ক্রমে বসে পড়ুন এবং শেষে শুয়ে পড়ে রিলাক্স করুন।

গোটা দেহটা নিয়ে যে দিকে খুশী ঘোরান—শুয়ে—বসে—দাঁড়িয়ে।

দু'পায়ের ওপর ভর করে কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত অন্য অংশ সামনে পেছনে, বাঁয়ে ডাইনে যতটা সম্ভব ঘোরান।

একপায়ে ভর দিয়ে দেহকে নিয়ে চলুন বিভিন্ন ভঙ্গিমায়—কোমরের ওপর থেকে অন্য অংশ বিভিন্ন দিকে সম্প্রসারিত করুন।

বসে উবু হয়ে শুয়ে, চিৎ হয়ে শুয়ে দেহকে নিয়ে সাঁতার কাটুন। কোনো বস্তুর সাহায্য নেবেন না দয়া করে।

দেহ, হাত, পা, মাথা নিয়ে আরো বলবো—কি লাভ? নিজে চেষ্টা করুন —স্বনির্ভর হতে পারবেন।

কিছু কথা : (প্রাসংগিক বিষয়ে)

গান শেখার অনেকগুলি সুবিধা আছে। গানের স্বরলিপির সম্বন্ধে পরিচিতি থাকলে এবং সুরতাল ও হারমোনিয়ামে তার প্রয়োগরীতি বিষয়ে ধারণা সজ্ঞান হলে ঘরে বসে প্রাথমিকভাবে সাধনা এবং অনুশীলনে অংশ নেওয়া যায়। তাছাড়া —প্রথমে একজনের সাহচর্যে তালিমের সঙ্গে সংপৃক্ত হওয়া যায়। একটু নিঃস্তব্ধ পরিবেশে এককভাবেই সাধনায় উত্তীর্ণ হওয়ার পথ রচনা করা যায়।

নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে ইদানীং গুরুমুখী বিদ্যার কথা অনেকে মানছেন—অনেকে আবার মানছেন না। আমার মতে—অভিনয় শাস্ত্রকে আয়ত্ত করার জন্যে প্রথমে গুরুর আশ্রয় গ্রহণ এবং পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেয়াই ভালো। প্রাথমিকভাবে কণ্ঠস্বর—শরীর চর্চার ও প্রয়োগের দিক থেকে সঠিক

তবে পেলো আত্মনির্ভরশীলতায় সুত্র পেয়ে পরের ধাপে ইন্‌স্‌টিটিউট্-এ শিক্ষার প্রয়োজন হবে। কারণ—অভিনয় বা নাট্যশাস্ত্র শুধু কণ্ঠস্বর প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে না। অনেক শিল্প নিয়ে নাট্যশিল্পকে চলতে হয়—কাজেই একক ভূমিকার চেয়ে সামগ্রিক ভূমিকার মূল্য—এক্ষেত্রে অনেক বেশী।

একক অভিনয় করলেও কে পর্দা টানবে—মেক-আপ কেমন হবে—নেপথ্যে শব্দক্ষেপণ কে করবেন ইত্যাদি সবাইকেই কাছে রাখতে হয়। তার ওপর বলা চলে—অভিনয় একক হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একাধিক চরিত্র নিয়ে নাটক করার রেয়াজ খুবই বেশী। এদিক থেকে অভিনয়-শিল্পী গুরুর কাছে প্রাথমিক তালিম নেয়ার পর একাধিক অভিনয়-শিল্পীর সঙ্গে আর এক ধাপ তালিম নিতে হবে। নাট্যাভিনয় যৌথ-শিল্প বলে এবং প্রয়োগের দিক থেকে এর সার্থকতার প্রকাশ বলে সম্মিলিতভাবে অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ নিতে হবেই। সেখানে নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরার জন্য গুরু বা পরিচালক তার নিজস্ব প্রতিভা নিয়ে এগিয়ে আসবেন তার নিজস্ব ভূমিকা পালনের জন্যে। কিন্তু যৌথ শিল্পের কথা বিবেচনা করে ইন্‌সটিটিউশ্যানাল ট্রেনিং-এর কথা অন্ততঃ আজকের যুগে বসে ভাবতেই হয়।

প্রথমে এককভাবে নিজে নিজে তালিম নেয়ার জন্যে এবং শরীর মন মস্তিষ্ককে সক্রিয় এবং নিজের অধীনে রাখার জন্যে নিয়মিতভাবে কিছু অভ্যাস করলেই হবে। এর সঙ্গে কণ্ঠস্বরকে বাদ দিলে হবে না। কণ্ঠস্বর বিষয়ে আগে বহুবার আলোচনা হয়েছে ব্যবহারিক কার্যক্রম নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে।

শরীর মন মস্তিষ্ককে নিজের আয়ত্তে রাখার কৌশল বিষয়ে এতদিনে আপনি নিশ্চয়ই কুশলী হয়ে উঠেছেন—কিছুদিন অভিনয় করে এবং অভ্যাস করে এবং এটাও বুঝতে পেরেছেন নিজের ত্রুটি কোথায় কতোটুকু আছে। এটুকু না পারলে অভিনয়-শিল্পী হিসেবে ঝুঁকি নেয়া আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না।

এ পর্যায়ে আরো অনেক কিছুই বলা যায়। কিন্তু বলার চেয়ে করার বিষয়টাই যেখানে বড় সেখানে কাজের জন্যে আগে ভেবে নিন। নিজেকে তৈরি করার কাজটা অবশ্যই প্রাথমিকভাবে নিজেকেই সারতে হবে। সুতরাং আবার কাজের মধ্যে ফিরে আসতে চেষ্টা করবো। অতএব আবার অনুশীলন।

অনুশীলনী : ১

শরীরে একটি হাড় অন্যের সঙ্গে যে জায়গায় যুক্ত হয়েছে সেগুলো একটু লক্ষ্য রাখুন। পায়ের আঙুল থেকে—মাথা পর্যন্ত প্রতিটি গাঁট (Joint) ভাঙুন।

মানে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা নয়। প্রতিটি ছোট বড় হাড়কে বিভিন্ন দিকে ঘোরান—সামনে—পেছনে—পাশাপাশি আনা-নেয়ার আবার অভ্যাস করুন। বয়েস, চরিত্রজ্ঞান, প্রয়োজন ইত্যাদি মনে রেখে প্রতিটি প্রত্যঙ্গকে প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিন।

অনুশীলনী : ১০

পর্যবেক্ষণ এবং মনোযোগ বাড়ানোর জন্যে দশ ফুট দূরে বসে বা দাঁড়িয়ে দেয়ালে কিংবা কাগজে একটা বড় বৃত্ত আঁকুন এবং বৃত্তের মধ্যে একটি শূন্য বৃত্ত স্থাপন করে ঐ দিকে অর্থাৎ গোটা বৃত্তকে দেখার চেষ্টা করুন একটু দূরে স্থাপন করে। দেখবেন আপনি প্রথমে তা করতে পারছেন না। আরো পরে বৃত্তের মধ্যেকার শূন্যটার দিকে লক্ষ্য করার চেষ্টা করুন—এতেও দেখবেন আপনি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছেন। পরের দিন এবং ক্রমান্বয়ে বৃত্তের আকার ছোট করুন। দেখবেন দৃষ্টি দিলেই আপনার অন্তর্জগতের চিন্তা থেকে মুক্ত হচ্ছেন আপনার অজ্ঞাতেই। বৃত্ত আরো ছোট করলে আপনি দেখবেন ঐ ছোট বৃত্ত এবং শূন্যকে আপনার দৃষ্টিশক্তির বাইরে নিয়ে যেতে পারছেন না। অভ্যাসের সময় মনে রাখতে হবে—আপনি দৃষ্টিস্থাপন করার সময় চোখের পাতা ফেলবেন না। প্রথম প্রথম চোখের পাতা পড়বে—এবং কষ্ট হবে—চোখের জলও পড়তে পারে। চোখের জল পড়লে আপনি চিন্তিত হবেন—বিচলিত হবেন। ক্রমান্বয়ে অভ্যাস করলে তবেই এই অভ্যাসে অভ্যস্থ এবং নিজের ওপর বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে উঠবেন।

অনুশীলনী : ১১

রঙিন বিভিন্ন রকমের ছবি সংগ্রহ করুন। লক্ষ্য করুন কোন্ স্থানে রঙের রেখা চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছে। মানুষের ছবি সংগ্রহ করে বিভিন্ন রেখা—বিশেষভাবে মুখের কোন্ অংশে কিভাবে শেড পড়েছে—কোথায় কতোটুকু উঁচু নিচু ইত্যাদি সবকিছু খুঁটিনাটি বিষয় লক্ষ্য করুন। রূপসজ্জা অঙ্গ রচনায় এগুলি বিশেষভাবে কাজে লাগবে।

অনুশীলনী : ১২

—দৃশ্যত্ব নিয়েতো অনেক বললেন? এবার কথা নিয়ে কিছু বলুন?
—কোথায় আপনার অসুবিধা?
—আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না।

—তা হলে—অভিনয়-শিল্প আপনার জন্যে নয়। গোড়ায় কণ্ঠস্বর নিয়ে অনেক কিছু বলা হয়েছে। আপাততঃ সেগুলোকে ধাতস্থ করার চেষ্টা করুন। আপনার কি বক্তব্য ভাই ?

—আমার উচ্চারণে মাঝে মধ্যে দোষ দেখা যায়।

—আর কিছু ?

—নাটকে অনেকখানি অংশ থাকলে, অনেকে বলেন 'একঘেঁয়ে হয়ে যাচ্ছে'। কি করি বলুন তো ?

—মাইকেলের মেঘনাদবধকাব্য, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও নাটকের বড় বড় অংশ বাছাই করে আগে মুখস্থ করে ফেলুন। তারপর প্রতিটি শব্দ যাতে সবাই শুনতে পায় সেই চেষ্টা করুন নিয়মিত আবৃত্তি করে। তারপর অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ে এক একটি বাক্যে যা বিষয়, আইডিয়া বা ভাব লেখক ব্যক্ত করতে চেয়েছেন সেই অনুযায়ী আবেগের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নোতুনভাবে আবৃত্তি করা শুরু করুন।

—কিন্তু উচ্চারণে দোষ সারবার বিষয়টা কি হবে ?

—বিশিষ্ট সজ্জনদের সঙ্গে মেলামেশা করে ঠিক উচ্চারণ ভঙ্গিমা জেনে নিতে হবে। রেডিও খুলুন (যদিও সেখানে উচ্চারণে অপকতার চাল খুবই বেশী দেখা যায়) তবুও নাটকগুলো শুনুন তাতে অন্তত উচ্চারণ সম্পর্কে কিছুটা সচেতন হতে পারবেন। তাতেও যদি মন না ভরে তবে বই ছেড়ে আমার কাছে চলে আসুন। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি নিমতলার ইলেকট্রিক চুল্লি আমাকে আমন্ত্রণ জানায়! তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। আমি উচ্চারণ ঠিক করার জন্যে কিছু উদাহরণ সামনে রাখছি। অভ্যাস শুরু করে দিন। তবে মনে রাখবেন—আঞ্চলিক ভাষায় অভিনীত নাটক সম্পর্কে আমার নিয়ম কাজে লাগবে না, এবিষয়ে আপনি পরিচালকের ওপর নির্ভর করতে পারেন। এবং নিজে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরেও ভাষা নিয়ে স্টাডি করতে পারেন। আমি বর্তমানে কানে শোনা যে চলতি ভুল-ভ্রান্তি হয়—বিশেষ করে সাহিত্যিক ভাষায়—সে বিষয়েই কিছু দৃষ্টান্ত রাখছি।

প্রথমে 'ক' 'খ' ঠিক করুন :

এক ॥ খবর শুনে কবে কোথা কখন কার খিদে বেড়েছে ?

দুই ॥ কাক খায় খাবার—'কা' 'কা' শব্দে 'খা' 'খা' করে খিট খিটে

কাকগুলো কাকিমার খয়েরী কাপড়ের ওপর বসে খরচ কমার চেয়ে খরচ বাড়িয়েই চলে।

'গ' 'ঘ' ঠিক করুন :

এক ॥ গলদা চিংড়ি ঘাসে ঘোরে
লাফায় বড় বেশী।
বাগদি পাড়ার বাঘা উকিল
বাগিয়ে মারে ঘুশী ॥

দুই ॥ গাধার পিঠে ঘুমিয়ে আছে
গাঁদাল পাতার গন্ধ।
ঘুঘুপাখি গিলছে তখন
ঘুম ভাঙানো ছন্দ ॥

শুধু 'ঙ' ঠিক করুন :

বাঙলা ভাষায় অজ্ঞ আমি বাঙ্ময় আমার বঙ্গ (বংগ)।

'চ' 'ছ'—ঠিক করুন।

এক ॥ চাচা চাচি ছায়াছবি দেখে তাড়াতাড়ি চাবিছড়া চট্ করে ছুঁড়ে ছোটায় চারিধারে।

দুই ॥ ছাতার তলায় ছড়িয়ে আছে ছাতু বাবুর ছেলে।
চাওয়া পরে, ছায়া দেখে সব যায় সে যায় ভুলে।

'ট' 'ঠ' ঠিক করুন।

এক ॥ টাট্টু ঘোড়া ঠনেঠনে যায় সটান ঠন ঠন শব্দে।

দুই ॥ টাটায় যাব ঠাট্টা করে কেন 'টা—টা' বলে দূরে ঠেলে দিলে ?

'ড, 'ঢ' ঠিক করুন।

এক ॥ ডাব কিনে ঢাক নিয়ে মুখ ঢেকে, ঢাক্কি ঢোকে ডেকে ডুকে

দুই ॥ ঢাকনা খোলা ডাল্ডা নিয়ে ঢলতে ঢলতে ফুলের ডালি নিয়ে ডালিম বাবু ঢুকলো।

'ন' 'ণ' ঠিক করুন।

এক ॥ নানা লোকে নানা কথা বলে নানা রকমে—নরম গদিতে নিচের ঘরে বসে।

দুই ॥ ঘরনী রান্না করে ঘৃন তেল ছাড়া নারিকেল দিয়ে আর নবনীর গুণে।

'প' 'ফ' ঠিক করুন।

এক ॥ পায়রা ওড়ে ফর ফরিয়ে

দুই ॥ পাখী পাকা পেঁপে খায়, ফকির পাড়ায় ঘুরে

'জ' 'ঝ' ঠিক করুন।

এক ॥ জলদা: পাড়ায় ঝর্ণা নেই জল ঝড়, ঝাউ গাছ—ঝোপ ঝাড় আর জলাভূমি ঝিলিক মারে জলের ওপর।

দুই ॥ ঝাড় দিলে ঝর ঝর করে চোখের জল জল জল করেবে।

'ব' 'ভ' ঠিক করুন।

এক ॥ বাবলা গাছে ভাল্লুক নাচে।

দুই ॥ ভালোমানুষ বাগলবাবু ভয় পেয়ে ভীত হয়ে বেলুনের মতো চুপসে যায়।

'ম' ঠিক করুন।

এক ॥ মানিকবাবু মানিকতলায় মান্‌কের সঙ্গে দেখা করছে।

দুই ॥ মধ্যিখানে—মাঝপথে—মলিন বদনে মাখন যায় মামলা সেরে মদন মল্লিককে নিয়ে।

'য' 'র' ঠিক করুন।

এক ॥ যাযাবর যদি রবিবার রাজধানীতে যেমন তেমনভাবে যায়!

দুই ॥ যদি রবীন্দ্রনাথ যেখানে সেখানে যেত আর যাতায়াত করতো তা হলে যারপর নাই লেখা রক্ষা করা যেত না।

'ল' ঠিক করুন।

এক ॥ লালচে নীল লাল হরলালের নিচু জমিতে—লিচু বাগানের—লাগোয়া বাগানে লাবণ্য—ললিতাকে নিয়ে লালপাড়ি পরে লাফাতে লাফাতে ঢুকলো।

দুই ॥ ভুল ভুল তাক ভুল ভুল ভুল তুলছে।

'র' 'ড়' ঠিক করুন।

এক ॥ বরেন বাবু জোর করে লাঠিতে ভর দিয়ে পরজনের ভরসা না করে ভরতপুরে চৌরঙ্গীর ভীড় কাটিয়ে সকলের চোখ ধাঁধিয়ে বাড়ী ফিরলো।

দুই ॥ রাগ করে বাড়ীর বড়বৌ বরকনে সমেত বাপের বাড়ী রিক্সায় চড়ে বড়রাস্তা পেরিয়ে সোজা বড় বাড়ী ফিরলো।

তিন ॥ হাওড়ার বাগদিপাড়ার বড়বৌ রবিবার রাতারাতি বাড়ীঘর ছেড়ে বেড়াতে বেরুলো রাখাল বুড়োকে নিয়ে।

'স' 'শ' ঠিক করুন।

এক ॥ সারি সারি পাঁচিলে শাড়ি পরে সবাই সেবাড়ীতে সাজগোছ করে বসেছিল সকলের আসার আশায়।

দুই ॥ সেদিন সজনীবাবু শ্যামবাজার সাতগাছি হয়ে সোদপুরে সন্ধ্যে সাতটার সময় সাতকড়িবাবুকে নিয়ে শাদাগাড়ি চড়ে এসেছিল।

'প্র' ঠিক করুন।

প্রকাশবাবু প্রত্যেকের জন্যে প্রত্যহ প্রভাতে পথে পথে ঘোরে।

'ম্ব' ঠিক করুন।

পিতৃ-মাতৃহীন মৃত্যুঞ্জয় মালিক পৃথিবীর মালিক হয় প্রতি মুহূর্তে এবং এই মৃত্তিকার কোলে।

মিশ্রিত কিছু বর্ণের উচ্চারণ।

পৃথিবীর রূঢ় স্বরে প্রতিধ্বনিত হয় আকাশের মেঘের গর্জন, তবুও সকালে সঘন বৃষ্টির আশা বাড়ীর সকলের কাছে তখনও বিষণ্ণ।

'দ্ধ' ঠিক করুন।

বুদ্ধদেববাবু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে উপলব্ধির অধ্যায় পদ্ধতি বিষয়ে বিশেষভাবে জ্ঞাত।

'জ্ঞ' ঠিক করুন।

অজ্ঞ মানুষের অজ্ঞাতসারে অঞ্জনবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

'পূ' এবং 'র্ণ' ঠিক করুন।

পূর্ণ অপূর্ণতার মাঝে সম্পূর্ণতা পেতে চাই।

'সং' ঠিক করুন।

সন্ধ্যাবেলায় সংবিদ রচনায় সংপৃক্ত হওয়ায় কারো সংগ লাগে না।

আর নয়। এইখানেই ক্ষান্ত হলুম। এ যা বলা হলো তা কিন্তু অধিকাংশই নিজের রচনা এবং খুবই প্রাথমিক স্তরের। ছন্দ মেলানো বা ভাষাতাত্ত্বিক কোনো গোলযোগ নিয়ে কেউ নিজস্ব বুদ্ধিক্ষেপণে প্রয়াস পাবেন না—দোহাই!

অনুশীলনী : ১৩

নির্দেশিকা :

এক ॥ উচ্চারণের গোলমালে নিষ্পত্তির জন্যে বাক্—প্রতিমা কিংবা 'ব্যাকরণ' বা 'ভাষাতত্ত্ব' জাতীয় বহু পুস্তক বাজারে আছে—তা আগ্রহীদের দেখে নেয়ার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি।

দুই ॥ উচ্চারণে সুর, স্বরগাম্ভীর্য আনার জন্যে এবং শব্দদ্বারা চিত্রপট রচনার জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের, মোহিতলালের, যতীন্দ্রমোহন, এবং অমৃতলাল প্রমুখের কবিতা ভালোভাবে অধ্যয়ন করলে ভালো ফল পেতে পারেন।

তিন ॥ অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত নামজানা প্রায় সব নাট্যকারদের নাটক পড়ার অভ্যাস করুন—আপনমনে। প্রয়োজনে যেখানে খটকা লাগবে সেখানে সাহিত্যবিদ বা অভিজ্ঞব্যাক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ গ্রহণ করুন।

অনুশীলনী : ১৪

যতরকমের ভাব আছে—এবং যতরকম সম্ভব আচার-আচরণের কথা মনে রেখে কেবলমাত্র মাথাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যান এবং ঘোরান। দ্বিতীয়ত ভাব অনুযায়ী কাঁধ ও মাথা বিভিন্ন স্থানে নিয়ে গিয়ে নানান ভঙ্গিমার অভ্যাস করুন। যেমন—গভীরভাবে বই পড়ছেন। কেউ এসে একটা আনন্দের সংবাদ দিলো। কোনো কাজে অগ্রসর হওয়ার আগে আত্মপ্রত্যয়ে মাথা নাড়লেন, আবার প্রিয়জনের বিচ্ছেদে মাথার স্থান পরিবর্তনের স্থানটির মৌলিকত্ব খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। চেষ্টা করবেন মাথা বা কাঁধের অভ্যাস যখন করছেন তখন দেহকে নীরব রাখতে। সব রকমের অভ্যাস শেষ হলে দেহের কোন্ অংশের কি কাজ তা যেন আপন নিয়মে স্বাভাবিক ভাবে সংঘটিত হয়।

-আমি কথা মনে রাখতে পারি না।

—মানে?

—মুখস্থ করতে পারি না।

—চেষ্টা করুন মনোযোগ বাড়াতে। চেষ্টা করুন স্মৃতিশক্তিকে সক্রিয় করতে।

—কিন্তু কিভাবে করবো?

—না, ডাক্তারখানায় কোনো ওষুধ পাওয়া যায় কি না জানি না। তবে কয়েকটা অভ্যাসের কথা বলছি। চেষ্টা করে দেখুন।

এক ॥ এককভাবে করলে। প্রথমে কিছু পংক্তি—তা কবিতা হোক কিংবা গদ্যের হোক, অবশ্যই মুখস্থ করে রাখুন। মুখস্থ করতে অসুবিধা হলে একটা লাইনের আদ্যক্ষর মনে রেখে পর পর লাইনের আদ্যক্ষর এক জায়গায় জড় করে—আদ্যক্ষর থেকে পর পর অক্ষরগুলি মনে করার চেষ্টা করুন। তারপর চোখ বুজে এক একটি অক্ষরকে ইংগিত হিসেবে ধরে নিয়ে সঙ্গের পংক্তিকে মনে করার চেষ্টা করুন। দেখবেন আস্তে আস্তে সব পংক্তিগুলি ক্রমান্বয়ে মনে পড়ছে।

দুই ॥ এরপর নাটকের কোনো মুখস্থ করা অংশ বা কবিতা জোরে জোরে আবৃত্তি করুন। আপনার সতীর্থ বা পরিবারের পরিজনদের নানাভাবে বিরক্ত করতে বলুন। বিরক্ত যেন শব্দ, চিৎকার বা ধ্বনির সাহায্যে হয়। গায়ে হাত দিলে চলবে না। আপনি ঐ বিরক্তিকর পরিবেশের মধ্যেই আবৃত্তি করে যান।

তিন ॥ কোনো একটা বিষয় নিয়ে ভাবতে শুরু করুন একাগ্রচিত্তে। বন্ধুরা আপনাকে হাসাতে চেষ্টা করবে—আপনার মুখে বিরক্তি বা অন্য কিছু পরিবর্তিত ভাব দেখার চেষ্টা করবে নিজেদের বানানো চাতুরী বা কৌশল দিয়ে। আপনি একই ভাবে অনড় অবস্থায় থাকুন বেশ কিছুক্ষণ—সঙ্গে থাকবে আপনার নিজস্ব জগতের সেই একান্তভাবনাটি।

চার ॥ কোনো ছোট ছেলে বা মেয়েকে নিজের ভাই বোন এমনকি পুত্র-কন্যা হলেও আপত্তি নেই—তাদের কাছে ডেকে এনে গল্প শোনানোর প্রতিশ্রুতি দিন। তারপর বলুন—আপনার ক্ষুদে ভক্ত আপনার কাছে কি ধরনের গল্প শুনতে চায়। কেউ হয়তো বলে বসলো—বাঘের গল্প শুনবো।

আপনি গল্প বলা শুরু করুন। কিন্তু আপনি কিভাবে শুরু করবেন?" আপনি ভাবতে থাকুন—সঙ্গে সঙ্গে ওদেরও ভাবতে দিন। আপনার স্মৃতির থলি ঘাঁটতে শুরু করুন। আগে ওদের বলুন, একটু অবকাশ নেয়ার জন্যে —ভাবার জন্যে—গল্পতো শুরু করবো—কিন্তু কেমন করে বলতো? একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দাও, তারপর আমি শুরু করবো। ইতিমধ্যে বাঘ সম্পর্কে অতীতের সব ধারণা একত্রিত করার চেষ্টা করুন। হয়তো অতীতের কোনো ছবি দেখেছেন। কারোর কাছে গল্প হয়তো শোনা আছে কিংবা চিড়িয়াখানা অথবা সিনেমায় ছবি দেখেছেন, তারসঙ্গে অর্থাৎ অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে কিছু কল্পনা মিশিয়ে কখনো গুরুগম্ভীর কখনো হালকা চালে গুছিয়ে কথা বলতে শুরু করুন। মনে রাখবেন—গল্প যখন শুরু করবেন তখন সেই সব অভিজ্ঞতা চিন্তা-জগতে যেমন এলোমেলো হয়ে গেছে সেই এলোমেলো বিষয়কে ঠিক সেইভাবে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করবেন না নিশ্চয়ই। সাজিয়ে নেবেন—গল্প মনোজ্ঞ না হলেও ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বলার বিষয়টা যেন রসালো হয়—সে দিকে দৃষ্টি রাখবেন।

অনুশীলনী : ১৬

মাথা বাঁচিয়ে শরীরকে খুব স্বাভাবিকভাব বিভিন্ন প্রকারে মেঝেতে ফেলার অভ্যাস করুন। উঠুন—বসুন—চলুন।

অনুশীলনী : ১৭

চোখ বুজে ক্রমান্বয়ে তা বিস্তারিত করুন—কাঁধ মাথা একজায়গায় রেখে দৃষ্টি প্রসারিত করুন বিভিন্ন স্থানে কাছে দূরে—পাশে—ওপরে নিচে।

অনুশীলনী : ১৮

নাক সংকুচিত—প্রসারিত করুন মুখের অন্য মাংসপেশীর সাহায্য না নিয়েই এবং একে একে ঠোঁট, গাল, কপাল, থুতনি প্রভৃতিকে নিজের আয়ত্তে রাখার বিভিন্ন কৌশল আয়ত্ত করুন—এমন কি সরু থেকে মুখের গহ্বর গোল করে যতটা সম্ভব বড় করুন এবং ওপরে নিচে প্রসারিত করুন। যদি মুখের মাংসপেশী কারো শক্ত বা অনমনীয় হয় তাহলে মৃদু উষ্ণ গরম সরিষার তেল দিয়ে তা মালিশ করুন নিয়মিত।

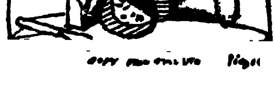
অনুশীলনী : ১৯

হাসপাতালে যান। এমারজেন্সি থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকারের

রুগীদের পর্যবেক্ষণ করুন। অনেক অজানা বিষয়ে জ্ঞান [illegible] পারবেন। নিওরলজি থেকে শুরু করে হার্ট এবং সাইকিক—ডিপার্টমেন্টেও ঘুরবেন। সম্ভব হলে বাজার থেকে শুরু করে থানা প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করুন।

অনুশীলনী : ২০

প্রচলিত দিশি-বিদেশী কিংবদন্তীকে জানুন—কিন্তু কখনো প্রচলিত কিংবদন্তীর আশ্রয়ে আশ্রিত হবার কথা ভাববেন না। একগুঁয়ে মানুষদের জানুন কিন্তু নিজে একগুঁয়ে হবার আগে অন্তত—একবার ভাবুন। বাস্তব-বুদ্ধি চেতনাসর্বস্ব মানুষের সঙ্গে আপনার দূরত্ব যেন প্রভাবহীন পথের একটা সীমানা চিহ্নিত করতে পারে—সেদিকে নজর রাখুন তীক্ষ্ণভাবে। এর জন্যে বুদ্ধিবৃত্তিকে সবশে পুরোমাত্রায় প্রভাবমুক্ত করার জন্যে সব রকমের শাস্ত্র সম্পর্কে পড়াশোনা করুন—বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সময় পেলেই আলোচনায় বসুন। অন্যকথা—আপনাকে যে-কোনো বিষয়ে প্রভাবমুক্ত হওয়ার জন্য নিজের ব্যক্তিত্বকে আগে জেনে নিন—নানা ভাবে নানা রূপে। এরজন্য নিজের জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রকে বিশেষভাবে প্রসারিত করতে হবে খুঁতিয়ে নাতিয়ে। এক কথায়—আপনি সবার মধ্যে থেকেও স্বরূপে—স্বজিজ্ঞাসায় এবং আপন সৃষ্টিতে—স্বতন্ত্র হবার চেষ্টা করুন সব দিক থেকে।



অভিনয় ও শিক্ষা : বিভিন্ন দিক—বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ১৬

ম্যাকরেডি :

চরিত্রের অন্তর্দেশে প্রবেশ করে, তার মনের গভীরে যে সব আশা আকাংখা রয়েছে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়—চরিত্র মানসে যে সব সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ভাবের আলোড়ন এবং দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাত হচ্ছে তাকে নিবিড়ভাবে অনুভব করবার প্রচেষ্টা, সংলাপের ভেতর লুকিয়ে থাকা চিন্তাধারাকে প্রকাশ করা, অর্থাৎ যে চরিত্রে অভিনয় করছি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যাওয়া তারপর চরিত্রটিকে মঞ্চাভিনয়ে ফুটিয়ে তোলা। এই হলো অভিনয়-শিল্প।

ম্যাকরেডি সাহেবের কথাটি খুবই মুখরোচক। কিন্তু একটু ভাবুনতো—এত অল্প কথার মধ্যে কত বড় কাজের কথা লুকিয়ে আছে? আর সেই কাজকে উপলব্ধি করতে পারলে নাট্য-শিক্ষার প্রশ্নটি কি শিক্ষা-নিরপেক্ষ বিবেচিত হবে?

গর্ডন ক্রেগ্‌ :

শিক্ষানবিশীকালে মঞ্চ এবং অভিনয় সম্বন্ধে পরিচালক যা কিছু বলবেন বা দেখিয়ে দেবেন তা মন দিয়ে শুনবে, দেখবে এবং নিজে আরো এগিয়ে যেতে চেষ্টা করবে যা তিনি দেখাননি তাও জানতে বা বুঝতে চেষ্টা করবে নিজে।

ঐ যে আত্মসমীক্ষা—জেন্স্ সাহেব সচেতনভাবে শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে অভিনয়-শিল্পীদের আরো একধাপ এগিয়ে যাবার কথা বলেছেন। নইলে শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে নকলনবিশ হওয়ার প্রবণতা বাড়বে—সৃষ্টির আপন বৈচিত্র্যকে খুইয়ে।

স্তানিস্লাভস্কি :

> অভিনেতাকে বুঝতে হবে সবাই তার কাছে কি প্রত্যাশা করছে। জানতে হবে সে নিজে কি চায় এবং কিসের দ্বারা তার কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে সৃজনশীল করে তোলা যায়—কারণ এই সব বিবিধ সমস্যা এবং প্রশ্নের সমাধানেই, যে চরিত্রে অভিনয় করা হচ্ছে তাকে প্রাণবন্ত মানুষ হিসেবে মঞ্চে প্রতিফলিত করা যায়।

YOTI LANE :

> No teacher can teach a student to act, in the sense that a teacher can teach a student geometry or mathematics. A teacher can act as a guide and put up some very useful signposts but that is all. Also, a student can learn how to speak, how to move, both as an individuals and as part of stage picture, but these things, although absolutely essential as part of an actor's stock-in-trade, are not acting.

সত্যিই তো। শিক্ষক অভিনেতাকে কি ভাবে শিক্ষা দেবে ? অভিনেতা নিজে শিখবে—সেই শিক্ষালাভের পথে শিক্ষক 'বলা' 'করা' এবং আত্ম-শক্তি বিকাশের বিভিন্ন দিক তুলে ধরবেন—কিন্তু কখনো শিল্পী—নিজে শিক্ষকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না। শিল্পীকে নিজে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ক্ষমতা এবং শক্তি সম্পর্কে স্ব নির্ভর হতে হবে।

SAMUEL SELDON :

> What the performer seeks from the audience, then, is not a blind, hundred-percent identification, but a

pleasurable sharing in his action. Between complete identifications and effective sharing lies a margin of difference which leaves the play-goer space for the movement of his own personality. Thus he can retain some freedom of choice as to how he will handle his game of make-believe.

অভিনেতা কি করতে যাচ্ছে, দেখাতে চাইছে তা স্বচ্ছ এবং পরিচ্ছন্নভাবে দর্শকের সামনে না তুলে ধরতে পারলে সব ব্যাপারটাই গোলমেলে হয়ে যাবে। শেলডন সাহেব শিল্পীদের পক্ষে মঞ্চে বিশ্বাসযোগ্যভাবে চরিত্র রূপায়ণের কথাই বলতে চাইছেন।

CHERKASOV :

It is the only basis on which an artist can develop his power of observation, his interest in people. his ability to penetrate the depth of human character. It is the world outlook that guide him in his receptivity, his thoughts and his creative imagination.

অভিনেতার দায়িত্ব সম্পর্কে, নিজেকে তৈরি করে নেয়ার বিষয়ে যে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন আছে—তার স্বপক্ষে চেরকাশভ সাহেবের উল্লিখিত উক্তি অস্বীকার করি কি করে ?

হেলেন ভাইগেল : (ব্রেশ্‌ট্‌-পত্নী)

স্তানিস্লাভস্কির পদ্ধতির সঙ্গে ব্রেশ্‌ট্‌-এর তত্ত্বের মিলের দিকটাও বুঝতে হবে। তাঁর কাছ থেকেই আমরা শিখেছি জীবনকে পর্যবেক্ষণ করার দৃষ্টি, দলগত অভিনয়, সত্যবাদিতা এবং মঞ্চে উদ্বেগমুক্ত ও শিথিল থাকার কৌশল। সবচেয়ে দরকারী জিনিস শিখেছি ঐ দলগত অভিনয়।

যাঁরা স্তানিস্লাভস্কির সঙ্গে ব্রেশ্‌ট্‌-এর সঙ্গে আকাশ-পাতাল পার্থক্য খুঁজে বেড়ান—কিন্তু তত্ত্বগত অমিলের মধ্যেও যে অনেক মিল আছে দুই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মাঝে—তার প্রমাণ মেলে ব্রেশ্‌ট্‌-পত্নীর জীবন সাধনাতেও।

আঁদ্রে এনটনি :

> যিনি নাটকের একটি প্রধান চরিত্র নাট্যকারের ব্যক্ত ইচ্ছানুসারেই যার ওপর দর্শকদের সমস্ত মনোযোগ ও ঔৎসুক্য কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে, তখন যদি আপনি চরিত্রটির বাস্তবতা ও সামগ্রিক সমতা ভুলে গিয়ে আপন অভিনয় ক্ষমতা এবং অতিরিক্ত অভিব্যক্তি প্রদর্শন করতে থাকেন--তা হলে হয় নাট্যকারকে চরিত্রটির রূপ পরিবর্তিত করতে হয়—না হয় দর্শকের থিয়েটারে আসাই বন্ধ করতে হয়।

আনাড়ী, দর্শকসচেতন এবং অতিরিক্ত চাতুর্যশক্তিক্ষমতার অধিকারী শিল্পীদল সম্পর্কে ওপরের কটাক্ষ আগামী দিনে আমাদের অভিনয়-শিল্পের এক নতুন দ্বার উন্মোচিত করতে পারে—যদি উক্তিটি সংগ্রাহে হজম করার ক্ষমতা আমাদের থাকে।

জন গিলগাড :

> আমার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং আমার মন অত্যন্ত পর্যবেক্ষণধর্মী। অভিনয় সম্পর্কে সতর্ক না থাকলে মঞ্চ থেকে প্রেক্ষাগৃহে বসে থাকা আট দশ সারি পেছনের লোককেও চিনতে পারি। যে সব দর্শকরা অভিনয় শুরু হবার পর আসছেন, যাঁরা ফিস ফিস করে কথা বলছেন বা চুক চুক করে চকোলেট খাচ্ছেন অথবা ঘুমিয়ে পড়ছেন তাঁদের প্রত্যেককেই আমি দেখতে পাই—ফলে আমার অভিনয় মার খায়। সেইজন্যে আমি একবার ম্যারিয়ন টেরিকে আমার অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং তিনি বলেছিলেন—যখন সামনে তাকাবে তখন তোমার চোখকে প্রথম সারির দর্শকদের ওপর নিবদ্ধ রাখবে। তাঁর এই উপদেশ আয়ত্ত করতে আমার বেশ কয়েক বছর সময় লেগেছিল।

গিলগাড সাহেবের কথাগুলি তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নেয়া—কিন্তু উপেক্ষা করার নয়। যে-কোনো শিল্পীর ভালো দিক যদি আমাদের ভালো দিক হয় এবং যদি আমাদের ভালো কিছুর সন্ধান দেয় তা হলে আমরা তা উপেক্ষা না করে তার অন্তরাশ্রিত স্বাদটুকু গ্রহণ করবো। বলা যায় না—অনেকের অভিজ্ঞতা একজায়গায় মিলিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার সূত্রের পরিমাণ যাচাই করে হয়তো নোতুন আবিষ্কারের কোনো এক নোতুন পথের সন্ধান পেতে পারি।

> কি করে সৃষ্টি করতে হয় সেটা কাউকে শেখানো সম্ভব নয়। কা.ণ সৃষ্টি করার পদ্ধতিটা একটা অবচেতন প্রক্রিয়া অথচ এ ব্যাপারে শিক্ষাদানটা একটা সচেতন প্রক্রিয়া যা একজন অভিনেতাকে সৃষ্টিমূলক কাজে মনোনিবেশ করার ব্যাপারে প্রস্তুত করে মাত্র।

ভক্তানগভ যা বললেন পরে এবং আগে অনেকেই এই রকম কথা বারবাব বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমরা কি করবো?

আলেকজাণ্ডার নক্স :

> অভিনয় এবং অনুকরণের পার্থক্য শুধুমাত্র নন্দনতত্ত্বের পরিধির মধ্যেই নয়—এই দুটো জিনিসের পার্থক্য মনোস্তাত্ত্বিকও বটে। এই পার্থক্যের ক্ষেত্রে আচরণ; আঙ্গিক এবং মঞ্চের কলাকৌশলের বিশেষ ভূমিকা আছে। অবিশ্যি পারদর্শী ব্যক্তিত্বের কাছে বিশেষতঃ নির্দেশক অভিনেতাদের কাছে এই দু'টো জিনিসের কোনো বিশেষ পার্থক্য নেই।

শিক্ষাদীক্ষায় প্রতিভা স্ফুরিত হয়ে উঠলে প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো বিশেষ বিষয়ে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এক দীর্ঘ সুভাবিত রচনা করা যায়। আমি প্রচলিত সাধারণ কয়েকটি বিষয়ে কয়েক জন মুখপাত্রের রচনার অংশবিশেষ থেকে উদ্ধৃতি রাখছি সরাসরি। কারণ—আরো অনুসন্ধানের পথে পা বাড়ানোর জন্যে।

A. NICOLL :

Performance which reaches its effects almost always by crude and generally physical means, which never seeks to persuade an audience that the actors and actions are related to life outside the theatre walls.

NANCY KING

Movement is man's most fundamental means of communication. We move before we talk we see before we hear. Our impressions of what we see remain with us long afterwords are forgotten. For this actor should learn to use his body to reinforce the word he speaks.

LAURENCE OLIVIER :

I go to a gym twice or three times a week, not merely to look tremendously muscular, but I have to keep fit for my job. I love it. But it's no use pretending it doesn't involve a certain amount of over work, beacuse it does······I must say that the nature of the work as I said before, dees demand physical—not perfection, but p' 'sical process.

ব্রেশ্‌ট্‌ :

থিয়েটারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি বিশেষ অবস্থায় শিক্ষাগত প্রতিটি অগ্রগতি, অন্যদিকে আমাদের অংশটিকে দুর্বল করে তোলে [সেটি আর থিয়েটার থাকছে না, হয়ে উঠছে পাঠশালা !] অন্যকথায় যতই দর্শককে নাটকে আবেগপ্রবণতার খোরাক যোগান হবে, ততই তাঁরা শিক্ষণীয় বিষয় কম গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন, অর্থাৎ যতই দর্শকদের সঙ্গে ঘটনার সহানুভূতি দেখা দেবে, যতই একাত্মতার প্রশ্ন উঠবে ততই সে শিক্ষাও আমাদের পরস্পর সম্পর্কে কম বুঝতে চাইবে।

এবারে এদেশের নোতুন পুরাতন যুগের নাট্যবিদদের কিছু কথা বলবো। যাঁরা কোনোদিনই মঞ্চাভিনয় শিক্ষা নিরপেক্ষ হিসাবে স্বীকার করেননি। তাহলে প্রশ্ন—শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা হলো না কেন? হয়েছে। কিন্তু—Institutional Training-এর তেমন কিছু ব্যাপ্তি ঘটেনি। কারণ? অনেক—কারণ।

য়ুরোপীয় ধারায় প্রভাবিত হয়ে এদেশে যে সময় থেকে নাট্যকলার সূচনা হলো ঠিক সেই সময়টা থেকে—অর্থাৎ শ'দেড়েক বছর আগে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল তা একবার জেনে নিতে হয়। প্রথম যুগের সূচনাতে নাটককে আমরা কয়েকজন গুণগ্রাহী ছাড়া অন্যেরা বরদাস্ত করতে পারিনি। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পর দর্শক কিছু পেয়েছি—কিন্তু সংখ্যায় তেমন বেশী নয়। নাট্যকার—শিক্ষিতসজ্জনদের নাট্য-উন্নয়ন ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যাও হাতের আঙুলে গুণে বলা যায়। বিজ্ঞানেও তেমন অগ্রগতি হয়নি। কিন্তু কাজ শুরু হয়ে গেল নানা দুর্যোগের মধ্যে, দুটি মহাযুদ্ধ যেন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অপেক্ষা করছিল কিন্তু বিপ্লব না হয়ে ফলশ্রুতিতে মঞ্চ গন থেকে নব-নাট্য নিয়ে ভাবনাচিন্তার কাজ শুরু। লোকজন আসতে লাগলো। দর্শকও বাড়তে লাগলো—বাড়লো রঙ্গালয়ের সংখ্যা। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাটক নিয়ে কাজ করার বিষয়টিতে ধুমধাম পড়ে গেল মানবমুক্তি আর সমাজসচেতন করার তাগিদে। ফলে এত কাজের ফাঁকে যাদের নিয়ে কাজ করবো বা যাদের দিয়ে কাজ করানো হবে তাদের কর্মক্ষেত্রে দক্ষতাঅর্জনের যে একটা বিশেষ বিষয় আছে সেটা আমরা ভুলে গেলুম। তাই যতটুকু প্রয়োজন অর্থাৎ কিনা কাজ চালানো গোছের করে নিয়ে কাজ চলতে লাগলো এবং কাজ চলছেও।

সাধারণ রঙ্গালয়ে ব্যবসায়িক সাফল্য আসার পর থেকেই নাট্য-শিক্ষার বিষয়ে প্রায় সবকটি স্থায়ী রঙ্গালয়ে নাট্যশিক্ষক নিযুক্তকরণের একটা বিষয় লক্ষ্য করা গেছে। এর পেছনে একটা মাত্রই কারণ—তা হলো সাধারণ শিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি না ঘটায় নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে নাট্যশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে মেনে নিয়েই রঙ্গালয়েই শিক্ষার বিষয় নিয়ে যে আদপে ভাবা হয়নি বা গুরুত্ব দেয়া হয়নি তা বলা যায় না। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়। তাছাড়া শিক্ষাদানের উপযুক্ত শিক্ষক কোথা? একালে ন্যাশান্যাল স্কুল অব ড্রামা প্রতিষ্ঠিত হলো দিল্লীতে। ভালো কথা। কিন্তু এত বড় দেশে যেখানে নানা ভাষা

সেখানকার নাট্যপিপাসু—সর্বভাষাভাষি মানুষদের জন্যে জাতীয় স্বার্থে সরকার কি ভাবলো ?

আমার কথা না হয় ছেড়ে দিন।

ভারতবর্ষের আধুনিক নাট্য-আন্দোলনের অন্যতম শরীক হাবিব তন্‌বির যখন বলেন :

> ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা নামটাই গোলমেলে।…কিন্তু সেখানে কেবলমাত্র হিন্দিভাষাতেই অভিনয় শেখানো হয়। কিছু কিছু ব্যাপারে তো সেখানে ভালোই কাজ হচ্ছে। কিন্তু একটি বিষয়ে প্রাথমিকভাবে খুব ভুল করা হচ্ছে। আমাদের প্রয়োজন চোদ্দটি ভাষার স্কুল। এটা খুব খারাপ ব্যাপার যে পশ্চিম বাংলা, গুজরাট, কেরল, মহারাষ্ট্রের ছাত্ররা এখানে আসে আর হিন্দিভাষায় নাটক শেখে। যখন কিনা মাতৃভাষার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এই সব ক্রিয়েটিভ বিষয়ের, ওই সমস্ত সংস্কৃতি একমাত্র ভাষার ভেতরেই লুকিয়ে আছে। সেভাবে দেখতে গেলে ওর মধ্যে তফাৎও নজরে আসে।

এদিকে পশ্চিম বাংলায় জোছন দস্তিদার মশাই এক সাক্ষাতকারে বলে বসলেন :

> শুনেছি যাঁরা এগুলির সঙ্গে জড়িত তাঁরা নাটকের খুব 'দামী' লোক। শুনেছি আকাদেমী নাকি নাটককে পুরস্কৃত করেন—উন্নত করার চেষ্টা করেন। কে করেন ? এঁরা কারা ? কী উপায়ে করেন ? আমরা, যারা নাটকের সঙ্গে জড়িত তারা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 'তিন পয়সার পালা' পুরস্কৃত হয়েছে শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা হিসেবে। কিসের মানে হয়েছে ? বিচারকগণ কি কি দেখলেন, অন্য নাটকগুলির সঙ্গে এটির গুণগত মানগত কি তফাৎ তা জানবার অবকাশ নেই। যদিও নাটকের উন্নতি কল্পে এই সব Institution গুলি রয়েছে তবুও নাটকের জন্যে এরা কতটা কি করছেন তা বলা শক্ত।

জোছন বাবুর কথায় উত্তাপ আর খোঁচা দুইই আছে। উৎপলবাবুও উল্লেখ করেছেন যে পশ্চিমী সাহেবের জুতো খেয়ে তিনি নাট্য-শিক্ষাগ্রহণ করেছেন অথচ বিপ্লবী চেতনায় সমৃদ্ধ এই সকল মানুষ নাটক নিয়ে নিজেরা কাজ করছেন ঠিক—কিন্তু পাশাপাশি দেখা গেছে অপরশিল্পীদের অকথ্যভাষায়

গালাগালিই করে যাচ্ছেন। আর আমরা—যাঁদের আত্মশক্তিতে কত সৃষ্টি হয়েছে তাঁরা সেই সব গালিগালাজ এবং তির্যক কথা শুনে এই জাতীয় নিষ্ঠাবান মনীষীদের কত বড় করে দেখি—গর্ব করে বলি—'কিরকম দিয়েছে, দেখেছিস।'

কিন্তু আমরাও তাঁদের প্রগতিশীলতার পেছনে যে আপাতবিরোধী নেপথ্য ক্রিয়াকলাপ রয়েছে তার জন্য কিছুই বলি না। তা হলে কি—ওনারা যা কিছু বিপরীত কাজ করেন বা মতাদর্শের পেছনে ঘোরাফেরা করেন তাকে চাপা দেয়ার জন্যে এত চোখা শানিত শব্দ ক্ষেপণ? নাকি একমাত্র এই রকম দুর্ধর্ষ প্রতিভাধর মানুষই কি এ দেশের নাট্য-আন্দোলনের ধ্বজা ধরার অধিকারী? এঁদের কাছ থেকে কি শিখলুম—এঁরা কি দিলেন? মার্কশীয় দর্শন এবং ব্রেশ্‌ট্‌কে জানার সুযোগ? সেটি এনারা না জানালে কি জানা যেতো না? দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে ভাবীনাট্যকর্মীদের জন্যে ভালো একটা প্লাটফর্ম কি তৈরি করতে পারতেন না? নিজেরা শিখেছেন—অন্যদের শেখানোর বিষয়ে স্থায়ী ভাবে কিন্তু ব্যবস্থা নিতে পারতেন না? পারতেন—কিন্তু করলেন না কেন? সে সব অনেক কথা। আসলে সবাই এক সঙ্গে কাজ করার মতো মনোভাব তৈরি করার চেয়ে ব্রেশ ট্‌ মতাদর্শের 'এলিয়েনেশন'কেই যেন আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে নানা কাজে কর্মে—আর নিজেদের বিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যকে সুকুমারমতি ভক্ত জনেদের গুরু গম্ভীর কথা বলে মাথা গুলিয়ে দিচ্ছেন। সেই কথা মাঝে মধ্যে বাণী হয়েও প্রকাশিত হয়। আমরাও লাফালাফি করি। ড্রামা বোর্ড, আর্ট কাউনসিল, থিয়েটার গিল্ড করার মতো ক্ষমতা এবং ব্যাপক কর্মসূচীকে সেই সব সংস্থার মধ্য দিয়ে কার্যকর করতে পারলে তাঁরা আরো সম্মানিত হতেন অসংখ্য মানুষের কাছে এবং ভাবী কালের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে অপরের মতাদর্শের ওপর আস্থাহীন হয়ে অপরকে গালিগালাজ করার আগে—নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ যে কাজগুলো অনেকের জন্যে করা যায়—এমন কথা ভেবে এবং নিজেদের মধ্যেই যে বিরুদ্ধবাদী কার্যাবলী দানা বেঁধে রয়েছে তাদের ধিক্কার জানিয়ে না হয় একটু মিহিকণ্ঠে নিজেদের প্রতি নিজেরা একটু গালিগালাজ করুন না। হয়তো তাতে ভক্ত বেশী জুটবে না—কিন্তু ভবিষ্যৎ নাট্যজগতের জন্য আজকে পজুবেদীমূল আরো অনেক বেশী শক্ত হবে।

যাক সে সব কথা। এখন নাট্যশিক্ষা এবং অভিনয় শিল্প নিয়ে এদেশে

যিনি যতটুকু আলোচনা করেছেন এবং কাজ করার উপদেশ দিয়েছেন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তার কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে এ পর্যায়ের আলোচনা শেষ করবো। আপনারা যাঁরা কাজ করবেন তাঁরা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে নিয়ে খুঁতিয়ে দেখে যেটুকু মানার তা মেনে যা বাদ দেয়ার তা বাদ দিয়ে কাজ শুরু করবেন—এই আশা রেখেই আরো কিছু বলি। আর একটি কথা বলি—আমরা এমনিতেই একটু বেশীমাত্রায় স্পর্শকাতর। তাই রঙ ঢঙ ভুলে নিজের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে আগে থেকেই তৈরি হয়ে নিন।

গিরিশচন্দ্র ঃ

> নটের সাধনায় সিদ্ধ হওয়া বড অল্পায়াসসাধ্য কাজ নহে। যাঁহার পূর্বো[illegible]শিক্ষিত ধ্যান-ধারণা শক্তি নাই তাঁহার রঙ্গালয়ে প্রবেশ করা বিড়ম্বনা। অভিনয়ের পন্থা কঠোর, সুকুমারবৃত্ত নহে। নটের কণ্ঠস্বর লইয়া কাজ। অন্তর্দৃষ্টি করিতে হইলে অন্তর্বৃত্তি সকল তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ না করিলে দৃষ্টিতে অনেক ভ্রম-প্রমাদ ঘটে। এই বিশ্লেষণ কার্যে মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা তৎসম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা বুঝিয়ে আপনার মনোবৃত্তির সহিত মিলাইয়া দেখিতে পারিলে কার্যের বিশেষ সহায়তা হয়। নাটকে ভূমিকা কোথাও ক্ষুন্ন থাকিলে তাহা অভিনয় কালে অক্ষুন্ন করিয়া প্রদর্শন [illegible]া যায় কিনা সে বিষয়ে নিয়ত চেষ্টা না করিলে নট-নাট্যকারের যোগ ভাবপ্রকাশক হন না।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় :

> কিন্তু কেবল উচ্চারণই অভিনয়ের সবটা নহে। চরিত্রের conception এবং তাদশ্রিত রসের বিকাশই অভিনয়ের প্রাণ। সুমিষ্ট স্বর—যে স্বর ইচ্ছামতো ও সহজে উচ্চ ও নিম্নক্রমে আনা যায়, সেই স্বরই বহুরস বিকাশের উপযোগী। এই রূপ গলা তৈয়ারি করিতে রীতিমতো সাধিতে হয়, সংস্কৃত স্তবাদি পাঠ ও আবৃত্তি করিয়া যেমন দম বাড়াইতে হয়, তেমনি উচ্চ স্বরে মেঘনাদবধ, পলাশী র

যুদ্ধ বা ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা কোনো নাটক হইতে উত্তেজনাপূর্ণ কোনো অংশ বাছিয়া নিয়মিতরূপে নির্দিষ্ট সময়ে আবৃত্তি করিবার সময় ভাব ও সু-উচ্চারণের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন। কিছুদিন এইরূপ অভ্যাস করিলে গলাও সহজে তৈয়ারী হইয়া যায়।

অপরেশচন্দ্রের উপদেশ খুবই কার্যকর। এ বিষয়ে আগে অনুশীলনীতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এখন দেখা যাক অন্যেরা অন্য বিষয়ে কি বলেন।

বিনোদিনী:

গিরিশবাবু আমাকে পাট অভিনয়ের জন্যে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষা দিবার প্রণালী খুবই সুন্দর ছিল। প্রথমে তিনি পাটগুলির ভাব বুঝাইয়া দিতেন তাহার পর পাট মুখস্থ করিতে বলিতেন। তাহার পর অবসর মতো আমাদের বাড়ীতে বসিয়া অমৃত মিত্র, অমৃত বসু আরোও অন্যান্য লোক মিলিয়া নানাবিধ বিলাতী অভিনেত্রীদের, বড় বড় বিলাতী কবি সেকস্‌পিয়ার, মিলটন, বায়রণ, পোপ প্রভৃতির লেখা গল্পাচ্ছলে শুনাইয়া দিতেন। আবার কখন তাঁহাদের পুস্তক লইয়া পড়িয়া পড়িয়া বুঝাইতেন। এইরূপ তাঁহার যত্নে জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা অভিনয় কার্য শিখিতে লাগিলাম।

যদিও উক্তিটির মধ্যে গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাদানের প্রণালীর কথা বিশেষভাবে প্রতিভাত হয় কিন্তু তবুও উল্লেখযোগ্য যে বিনোদিনী নিজে শিক্ষিতা ছিলেন না—এবং সমাজে অবহেলিতা কিন্তু বঙ্গরঙ্গমঞ্চের জন্য তাঁর অবদান ও আত্মত্যাগ আজও এক ইতিহাসের ঐতিহ্য বহন করছে। তিনি অশিক্ষিতা হলেও নাট্য শিক্ষাছাড়া কি মঞ্চে অবতীর্ণা হয়েছেন না—তাঁকে শিখে এবং রীতিমতো অনুশীলন করে তবেই মঞ্চে আসতে হয়েছে। সুতরাং নাট্যশিক্ষা সেকালেও স্বীকৃতি পেয়েছিল। প্রতিভা থাকলে তবেই নাট্যশিক্ষা গ্রহণের প্রশ্ন। প্রতিভা ছিল বলেই বিনোদিনী নাট্য-শিক্ষায় শিক্ষিতা হয়ে এ দেশে রঙ্গমঞ্চে মহিলা-শিল্পীর অবদানের ক্ষেত্রে তিনি নোতুন যুগ ও ভাবনার প্রবর্তনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ :

অভিনয় জিনিসটা যদিও মোটের উপর অন্যান্য কলাবিদ্যার চেয়ে সকলের দিকে বেশি ঝোঁক দেয়, তবু তাহা একেবারে হরবোলার কাণ্ড নহে। তাহাও স্বাভাবিকের পর্দা ফাঁক করিয়া তাহার ভিতরের দিকের লীলা দেখাইবার ভার লইয়াছে। স্বাভাবিকের দিকে বেশি ঝোঁক দিতে গেলেই সেই ভিতরের দিকটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়। রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা কণ্ঠস্বরে ও অঙ্গভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায়, সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মতো বাড়াইয়া বলেই, সংযম আশ্রয় করিতে তাহাদের সাহস হয় না।

রবীন্দ্রনাথ কবি-নাট্যকার এবং কি নয়, সেটাই অন্যতম বিস্ময়—শুধু এক রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই তা উপলব্ধি করা যায়। শান্তিনিকেতন গড়ার পেছনে শিশু-শিক্ষা থেকে শুরু করে কাব্যচর্চা, সংগীত, নৃত্যশিক্ষাকে গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত করে প্রকৃতির সম্মিলনে নোতুন দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। তার থেকে নাট্য-চর্চা বা শিক্ষা মোটেই বাদ ছিল না। নিজে অভিনয় করতেন—শেখাতেন। প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের জন্যে ইন্দ্রিয়চর্চার স্থান তিনি প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে চারুকলার উন্নয়নের জন্যে এবং নাট্য-শিক্ষাকে কিভাবে অন্তরের সঙ্গে উপলব্ধি করতেন তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ উল্লিখিত উক্তির মধ্যে। তবে শান্তিনিকেতনে নাট্য-শিক্ষা সম্প্রসারণের কোনো ব্যবস্থা বর্তমান কর্মসূচীতে নেই।

তাতে দুঃখ করার কিছুই নেই। অতীত বর্তমান দীনতাকে স্বীকার করে নিয়ে যদি প্রতিভাকে সুমার্জিত করে তার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ চেতনাকে কাজে-কর্মে রূপ দিতে পারা যায় তা হলে রবীন্দ্রনাথকে আর এক নোতুন চেতনায় সম্মানিত করে গোটা জাতিকে সম্মানিত করা যায় সহজেই।

এরপর দেখা যাক তারপরে আরো কতটা চিন্তাভাবনা হয়েছে।

বাস্তব জীবনরূপের কোনো কোনো অংশ সম্পূর্ণ বর্জন করে এবং কোনো কোনো অস্পষ্ট ও গুহাহিত অংশ আবার বিশদভাবে পরিস্ফুট করে শিল্পের মধ্যে প্রকাশ করা হয়। নাট্যশিল্পের প্রয়োজনেও বাস্তব জীবনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়তো সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়। এবং আপাত তুচ্ছ দিক হয়তো ফলাও করে তুলে ধরা হয়।

· সক্রিয়তা, আবেগধর্মিতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাদি গুণগুলি নাট্য চরিত্রের সঙ্গে দেখাতে পারলে সেই চরিত্রও সংবেদনশীল হতে পারে। এমন কি জীবন থেকে আইডিয়া যেখানে বড় হয়ে ওঠে, সেখানে চরিত্রের প্রাণময় ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়।

মূলতঃ চরিত্র চিত্রণ প্রসংগে অজিতবাবু দৃষ্টিপাত করতে চাইলেও প্রচ্ছন্নভাবে তা নাট্যশিক্ষা-নিরপেক্ষ কোনো অস্তিত্বকে প্রশ্রয় দিয়ে নয়।

অন্যদিক থেকে গোটা অভিনয়তত্ত্বকে বাস্তবে মূর্ত করার উদ্দেশ্যে এদেশের আর একজন তত্ত্ববিদ বললেন—

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য :

ভাবাবেগের ওপর প্রভুত্ব যিনি করতে পারেন না তাঁর পক্ষে আর যাই হোক সুদক্ষ অভিনেতা হওয়া সম্ভব হবে না। এই প্রভুত্ব করতে হলে অভিনেতাকে অবিরাম এবং নিরলস অভ্যাস-অনুশীলনে মগ্ন থাকতে হবে, নৃত্যশিল্পীর মতো দেহচর্চা করতে হবে। সংগীত-শিল্পীর মতো স্বরসাধনা করতে হবে। বক্তার মতো বাক্-সাধনা করতে হবে এবং সাধকের মতো সমাধি সিদ্ধ হতে হবে। সার্থক অভিনয়—অশিক্ষিতপটু অভিনেতার অনুকরণ কর্ম নয়—অভিনয় কবিকল্পিত চরিত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা—কবির ধ্যানকে মূর্ত করা।

সাধনবাবু তত্ত্ববিদ হলেও তিনি অভিনয়-শিল্পী এবং শিল্পকে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্ত করলেন? সাধনবাবুর অভিনয়-প্রতিভা সম্পর্কে কোনো বাস্তব ধারণা হয়তো আমাদের কাছে নেই—কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য এবং নাট্য-

শিক্ষার স্বপক্ষে যে উক্তি তা প্রতিভাজাত হলেও—অভিনেতা শিক্ষা ছাড়া কোনো বরপুত্র জাতীয় সৃষ্টিশীল অস্তিত্ব নয় তা সে কথা নিজেই বলে গেছেন। তিনি বড় অভিনেতা না হয়েও তাঁর গবেষণার মধ্য দিয়ে অভিনয়-শিল্পীকে উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া কখনোই কামনা করতে পারেননি। অভিনয় প্রতিভা-বান শিল্পীরা করবেন কিন্তু ব্যাকরণ না জেনে নয়। প্রতিভাকে পরিমার্জিত এবং পরিশিলীত করার জন্যে অভিনয়-শিল্প বিষয়টি উপলব্ধি করে শিল্পীদের তৈরি হওয়ার স্বপক্ষে যা বলে গেছেন তা কি উপেক্ষা করার বিষয়?

সতু সেন:

> সুরুচি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা একজনের পক্ষে যে-কোনো বিষয়কে করায়ত্ব করা সম্ভব। লিখে রাখলে দিনের পর দিন তার সঞ্চয় বাড়তে থাকবে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে অনুভূতির এক দীর্ঘ তালিকা তৈরি হবে। এরপর তালিকার প্রথমটির দিকে তাকিয়ে সে হয়তো নিজেকে প্রশ্ন করবে—'কেমন করে আমি এই অনুভূতিগুলকে ফিরিয়ে আনব?' একাকী তাকে অনুভূতির 'কারণ' নিয়ে ভাবতে হবে, নিছক অনুভূতিকে নিয়ে ভাবলে চলবে না।

সতু সেন ভারতীয় আধুনিক নাট্য-আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। তিনি মূলতঃ মঞ্চ শিল্পী হলেও—বিদেশে তাঁর কার্যক্রম এবং শিক্ষাপ্রণালীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি যা বললেন তা অভিনয়-শিল্পের অতি মূল্যবান এক সংযোজন। কিন্তু কে শোনে কার কথা!

এত সব কথার ফাঁকে যিনি নাকি শুধু সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেই আমাদের কাছে স্মরণীয় এবং চিরবিদিত তিনিও এক সময় 'গ্রামীণ নৃত্য ও নট' গ্রন্থে বলে বসলেন থিয়েটারের কথা। তিনি শান্তিদেব ঘোষ। বললেন—আগের দিনে থিয়েটারে যে বৈচিত্র্য দেখা যেতো কমপোজিশন-এ যাত্রাওয়ালারা ততটা পাবেনি কোনোদিনই। আসরের চারদিকের দর্শকদের জন্যে অনেকটা সহজ করে নিয়েছে তারা।

অহীন্দ্র চৌধুরী:

> শিল্পীকে হতে হবে অকপট মৌলিক সত্তার অধিকারী ও বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাকে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে হবে এইজন্যে যে

সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশের অনুশীলন এবং প্রকাশ করার অভ্যাস ছাড়া সে কিছুতেই তাঁর আত্মিক শক্তিকে শিল্পে প্রতিফলিত করতে পারবে না।

মন্মথ রায় :

জাতীয় সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। তাই আজ প্রার্থনা একটি সুনির্দিষ্ট সুপরিকল্পিত পথে শুরু হোক আমাদের নাটকে ও নাট্যশালার দুর্নীতি, ভণ্ডামী, ভেজাল, চোরাবাজার, কালোবাজার এবং মিথ্যার প্রবঞ্চনা ও অনাচারের বিরুদ্ধে অভিযান।

জাতীয় সংস্কৃতি বিপন্ন। কেন? কিভাবে এই বিপন্ন অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে? মানবমুক্তি? শুধু চোরাকারবার আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলে? কিন্তু তার আগে গোটা বিষয়টার ওপর একটি সুদৃঢ় ধারণা আনার জন্য সমাজশিক্ষা বা সমাজ বিশ্লেষণের জন্যে কি উপযুক্ত শিক্ষার কথা মানবো না! সমস্ত বিষয়টা উপলব্ধি করার জন্যেও তো অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। শ্রদ্ধেয় মন্মথ-বাবু যা বললেন অর্থাৎ সেই 'সুপরিকল্পিত পথ'—তা কি অবৈজ্ঞানিক শুধু প্রতিভাশ্রিত কোনো বস্তু?

এরপর যে উক্তিগুলি আমি পর পর তুলে ধরছি তা সুভাষিত হিসেবে গণ্য করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু ভাবনার অবকাশ গ্রহণ করুন অন্ততঃ এই ভেবে—নাটক, অভিনয় পরিচালনা ইত্যাদি নিয়ে কেবলমাত্র আপনি যে ভেবে চলেছেন তা নয়—আপনার আগে এবং বর্তমানে এদেশের নাট্য-উন্নয়নের জন্যে অনেকে ভাবছেন। ভবিষ্যতেও অনেকে ভাববেন। কিন্তু ভবিষ্যতে যাঁরা ভাববেন তাঁদের ভাবনার পথকে আরো জিজ্ঞাসার সূত্রে বেঁধে দিলে—হাজার লক্ষ প্রতিভাবানদের মধ্যে যদি একজনও এই সব উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আরো ভাবনার পথ বেয়ে বাস্তব পটভূমিতে নেমে আসেন তবেই তো হবে মস্ত বড় কাজ। এটাতো ঠিক সামান্য কাজে অসামান্য প্রশংসা পাওয়ার চেয়ে—অসামান্য কাজে কম প্রশংসা পাওয়াটাও একরকমের অসামান্য প্রাপ্তি।

ঋত্বিক ঘটক :

আজও অন্ততঃ আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই। আজও মনে করি

আমরা ঠিকই পথ চিনে নিয়েছিলুম। তীব্রভাবে সামাজিক ক্লেদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন এবং বাস্তবের শ্রেয় অংশের প্রতি আকুলভাবে ভালোবাসা দেখানো—সব যুগের সব শিল্পীর এ হচ্ছে পবিত্র দায়িত্ব।

শিশির কুমার :

প্রত্যেক সু অভিনেতা, প্রত্যেক আর্টিস্ট নিজের মস্তিষ্কের মধ্যে দুইটি মানুষকে বহন করেন—একজন যিনি সৃষ্টি করেন, আব একজন যিনি সৃষ্ট হন। একজন বিচাবক। অন্যজন কর্মী। এই দুইয়েব সুষ্ঠু সমন্বয়ে সত্যকারের আর্টিস্টের জন্ম।

তুলসী লাহিড়ী :

সমাজের এই অবস্থায় তার জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে বাস্তবধর্মী নাটকেব প্রয়োজন খুব বেশী। দিশেহারা মানুষকে আশাব আলো দেখান, তার ক্রটী সহানুভূতির সঙ্গে দেখিয়ে তার সংশোধনেব উপায় দেখান। তার পশুত্বেব খেয়োখেয়িতে অবসন্ন মনে মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করে সব দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করার মত সংকল্প এনে দেওয়া আজ অত্যন্ত প্রয়োজন।

কেয়া চক্রবর্তী :

শুধু রবীন্দ্র সংগীতে যত কথা বলা যায় থিয়েটারে তার থেকে অনেক বেশী কথা বলা যায় ··ধরুন রবীন্দ্রনাথের 'রক্ত করবী'তে যত কথা বলা আছে তাঁর গানে কি তা বলা আছে? সাধারণের পক্ষে সহজ বোধগম্য হবে এমনভাবে বোঝার বা বোঝানোর দিক থেকে নাটকের দারুণ সুবিধে, সেটা চোখে দেখা যায়—শুধু শোনা নয়।

বিজন ভট্টাচার্য :

দূর গ্রামে, সহরের সমস্ত কোলাহলের বাইরে, অনেকখানি জায়গা নিয়ে প্রতিষ্ঠা হবে এক বিরাট বাড়ী, যেখানে সমস্ত অভিনেতারা থাকবে দল বেঁধে—এক হাঁড়িতে সকালে বিকেলে দুবার শুধু খিচুড়ী

রান্না হবে। তাই খাবে তারা ভাগাভাগি করে, আর বাকী সময় সেই উষাকাল থেকে শুরু হবে বিভিন্ন ব্যায়াম, যোগাসন, কণ্ঠ সাধনা, স্বরশিক্ষা—সারাদিন, দিনের পর দিন। তারপর যখন এক এক গাছা তেল খাওয়ানো পাকা লাঠির মত এই সব অভিনেতারা মঞ্চে আসবে, তখন হৈ হৈ পড়ে যাবে চারদিকে। সত্যকারের শিল্পীর জন্ম হবে এইভাবেই

গঙ্গাপদ বসু :

পৃথিবীতে বৃহৎ না হলে কোন জিনিস মহৎ হয় না, এ ধারণা এযুগে আর নেই। ছোটর মধ্যে বড়কে আবিষ্কার করা, সীমার মধ্যে অসীমকে খুঁজে পাওয়া, প্রতিদিনের খুঁটিনাটির মধ্যে সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করা, এই তো যুগের ধর্ম। নানা সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের জীবন আজ বিপর্যস্ত হয়ে গেছে—আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, আমাদের দশটা-পাঁচটার জীবনে নিত্য প্রাণধারণের গ্লানির মধ্যে বুঝি নাটক নেই। আমাদের নাটক করবারও অবসর নেই, দেখবারও না। কিন্তু কথাটা সত্য নয়। আমাদের প্রতিদিনের জীবনেই অহোরহ নাটক সৃষ্টি হচ্ছে, আমরা খালি লক্ষ্য করে দেখি না, তাই দেখতেও পাই না।

শেখর চট্টোপাধ্যায় :

(বার্লিনের অনসর্ব—ব্রেশ্‌ট-এর থিয়েটারে 'আর তুরো উই' দেখতে গিয়ে। উই অর্থাৎ হিটলারের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন তাঁর সঙ্গে এক সাক্ষাতকারের সময়)

একাধারে হিটলার একটি ক্লাউন এবং শয়তান এটাই দেখাতে চান। অভিনয় এবং ফিজিক্যাল ফিটনেশ দেখে মনে হয় কি অসাধ্য অনুশীলন, কি গভীর নিষ্ঠা হলে এ অভিনয় সম্ভব। ফাঁকা ষ্টেজ—শুধু একটি কোচ সম্বল। বাকীটা সব অভিনয়।······কিছু বলবার নেই, বুঝলাম বার্লিনের অনসর্ব কেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ থিয়েটার। এখানকার প্রতিটি শিল্পীই সমাজজীবনের একটি অংশ—তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—আমাদের দেশের মতো আলাদা জীব নয়।

রাধামোহন ভট্টাচার্য :

১৯২৫ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত নাটক দেখে যোগেশ চৌধুরী

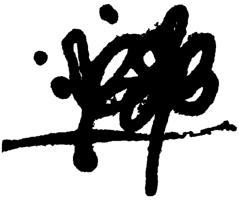
আর প্রভার অভিনয় আমার ভালো লেগেছে—ভালো লেগেছে তার কারণ—এঁদের অভিনয়ে অন্তর্মুখীন উপলব্ধির সার্থক আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল—আর যাঁরা দিকপাল অভিনয়-শিল্পী বলে স্বীকৃত—সেই সব শিল্পীদের গ্যালারীএকটিং সম্পর্কে কিছুই বলতে চাই না। কারণ, এই বয়সে আমি কারোর কোটেশন হয়ে বেঁচে থাকতে চাই না।

পূর্বে উল্লিখিত বিভিন্ন স্থানে নিবদ্ধিকৃত প্রক্ষিপ্ত উক্তিগুলি ছাড়া রাধামোহন ভট্টাচার্য মশাই যা বললেন তা এই গ্রন্থ রচনার কদিন আগে ব্যক্তিগত এক সাক্ষাতকারে। তিনি প্রসংগত অনেক কথাই বললেন। কিন্তু সবিনয়ে জানালেন আমি যেন তাঁর অন্য কথা গ্রন্থে উল্লেখ না করি—শুধু উল্লিখিত অভিমত ছাড়া।

আরো অনেকের অনেক কথা বলা যায়। কিন্তু না! কথাকে বড় করে কাজের গুরুত্বকে ছোট করার কোনো বাসনা নেই। সুতরাং কাজ শুরু হোক এই অধ্যায় এবং প্রথম অধ্যায়কে মনে রেখে। এরই মধ্যে আপনারা কাজ নিয়ে—আমার চেয়ে অনেক নোতুন ভাবনা সঙ্গে নিয়ে পাদ-প্রদীপের আলোকে এসে দাঁড়াবেন। আর আপনারা দর্শকদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবেন। ক্রমে যবনিকা সরবে—অতএব আমি এখন নেপথ্যে যাই। আপনারা আলোতে আসুন।

ফিন





এই গ্রন্থ রচনার উৎস *

(ক) অভিনয় নাট্যকলা সংক্রান্ত ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত অসংখ্য পুস্তক।

(খ) বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অধিকাংশ নাট্য-সমালোচনা ও নাট্য-শিল্প বিষয়ে পুস্তক।

(গ) ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অপর্যাপ্ত পরিমাণ সাময়িকপত্র ও পত্রিকা।

(ঘ) রবীন্দ্রভারতী, ইন্‌সটিটিউট অব ইন্‌ডিয়ান থিয়েটার আর্টস এবং বিদেশে বিভিন্ন নাট্য-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রী-বৃন্দ।

(ঙ) এদেশে শহর থেকে দূরে ছড়িয়ে থাকা শিশিক্ষু নাট্য প্রেমিকেরা।

(চ) পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের অফুরন্ত তাগাদা।

(ছ) নিজস্ব মানসিকতা।